।। শ্রীহরি ।।

1478 ▲

মানব কল্যাণের শাশ্বত পথ

मानवमात्रके कल्याणके लिये (बंगला)

স্বামী রামসুখদাস

1478

॥শ্রীহরিঃ॥

মানব কল্যাণের শাশ্বত-পথ

मानवमात्रके कल्याणके लिये (बँगला)

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব॥

স্বামী রামসুখদাস

1478 Manav matra ke Kalyan (Bangla)_Section_1_Front

॥ শ্রীহরিঃ ॥

নম্র নিবেদন

অশেষ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমৎ রামসুখদাসজী কৃত রচনা সমূহের একটি বৃহৎ সংগ্রহ **'সাধন-সুধা-সিন্ধু'** নামে গীতাপ্রেস থেকে পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থটির পরও শ্রীমন্মহারাজ রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধসমষ্টি কয়েকটি গ্রন্থরূপে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলিতে এমন কয়েকটি রচনা আছে যা প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই অতীব কল্যাণপ্রদ। এইরকমই ২০টি প্রবন্ধকে সংকলিত করে **'মানব কল্যাণের শাশ্বত-পথ'** নামক এই গ্রন্থটি সম্পাদিত হয়েছে। বস্তুত রচনাগুলি বিশ্বের সকল ধর্ম ও দর্শানানুগামী সকলের পক্ষেই অনুধ্যান যোগ্য। কারণ শ্রীমন্মহারাজের রচনায় কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ের সীমানা যেমন বাধা হয়নি তেমনই কোনোও পথ বা মত এককভাবে এখানে প্রাধান্য পায়নি। সনাতন অধ্যাত্মবোধের সত্যালোকে তিনি উচ্চতম তত্ত্বকে শ্রেয়স্কর ভাবে বিভিন্ন মাত্রায় পরিবেশিত করে প্রকৃত কল্যাণ ও উত্তরণের শাশ্বত পন্থাটি তুলে ধরেছেন উজ্জ্বলভাবে।

মূল গ্রন্থটি হিন্দীতে রচিত হলেও বাংলাভাষী যোগাগ্রহীগণের জন্য এটিকে যথাযথভাবে অনুদিত করে প্রকাশিত করা হলো। **শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অজয় ভট্টাচার্য** ও **শ্রীমতী গায়ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়** অনুবাদ কার্য সম্পাদন করেছেন। তাঁদের প্রতি জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা। এই বৃহৎকর্মে যদি সামান্যতম ভাবেও কোনো ত্রুটি হয়ে থাকে তার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। সর্বজনের শ্রেয়োলাভের সহায়ক এই **'মানব কল্যাণের শাশ্বত-পথ'** সকলের জন্য উন্মুক্ত হোক, জীবনকে সার্থক করে তুলুক, এই আমাদের প্রার্থনা।

অক্ষয় তৃতীয়া ১৪১০ —**প্রকাশক**

॥ শ্রীহরিঃ ॥

প্রস্তাবনা

মানুষের প্রকৃত কল্যাণ ঐহিক জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির উপকরণের দ্বারা লাভ করা যায় না। তা এক ঐশ্বরীয় দান। তা অর্জন করে নিতে হয় এবং অর্জন করার যোগ্য হতে হয়। পৃথিবীর অন্য সকল প্রাণীর সঙ্গে মানুষের প্রভেদ এইখানে। মনুষ্যতর প্রাণীরা তাদের সুখের জন্য প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি-নির্ভর। কিন্তু মানুষ তা নয়। মানুষ প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির ঊর্ধ্বে উঠতে পারে, তাকে অতিক্রম করতে পারে। এই কাজে মানুষের বড় বাধা হলো তার অহং বোধ। মানুষ যখন তার নশ্বর দেহকে আমি সর্বস্ব জ্ঞান করে, 'আমি' এবং 'আমার'-কে নিয়ে জড়িত হয়ে পড়ে তখন সত্য পথ থেকে সে বিচ্যুত হয়ে যায়। তাই সাধন পথের প্রথম এবং প্রধান কথা হলো তত্ত্বগত-রূপে এবং অনুভূতির মধ্যে অহং বোধ থেকে মুক্ত হওয়া। প্রকৃতপক্ষে অহং বোধ থেকে মুক্ত হওয়াই হলো সকল সাধনার সার কথা, এইটিই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করার পথ এবং এইটিই প্রকৃত কল্যাণের শাশ্বত-পথ।

এই সাধনা কীকরে করা হবে তার কথা নানা জনে নানাভাবে বলেছেন। তার জন্য নানা পথ বা মার্গও বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। তার কোনোটিরই প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করে এবং প্রত্যেকের তার বিশ্বাস মতো এগিয়ে যাওয়ার অধিকার স্বীকার করে নিয়েও পূজ্যপাদ স্বামী রামসুখদাস মহারাজ মানুষমাত্রেরই কল্যাণের সহজতম পথের নির্দেশ করেছেন তাঁর বহু রচনায়। তাঁর মূল কথা হলো শরীরকে প্রাধান্য না দেওয়া, এমন কি শরীরটাই যে আমি এমন কথা না ভাবা। শরীর পৃথিবীর সকল বস্তুর মতই নশ্বর। আমি নশ্বর নয়, আমি অবিনশ্বর। 'আমি শরীরের অতিরিক্ত অন্য কিছু'—এই বোধকে জাগ্রত

করাই হলো পরমাত্মা-প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ পন্থা আর তাতেই মানব-কল্যাণ।

স্বামীজী বলেছেন কীভাবে সকল মানুষ এই কল্যাণ অর্জনে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে। তা পারে নিরন্তর এই চিন্তাকে সক্রিয় রেখে এবং এই বোধকে উপলব্ধি করে। সেই চিন্তা ও বোধ হলো—

(১) **কিছুই আমার নয়।**

(২) **আমার কিছুই চাই না।**

(৩) **কারো সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই।**

(৪) **কেবল ভগবানই হলেন আমার।**

এই যে একনিষ্ঠা এটাই হলো অধ্যাত্ম সাধনার শীর্ষে ওঠার সোপান। তারপরেই মুক্তি। বস্তুত, এইটিই মানুষমাত্রেরই কল্যাণের পথ এবং এইটিই হলো বর্তমান গ্রন্থটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

স্বামী রামসুখদাস মহারাজের নাম সমগ্র ভারতে সুপরিচিত। দীর্ঘ জীবন ধরে অধ্যাত্ম সাধনায় তিনি আত্মমগ্ন। তবে তাতেই তিনি নিজেকে তৃপ্ত রাখতে চাননি। তিনি তাঁর লব্ধ জ্ঞানকে এবং উপলব্ধ অভিজ্ঞতাকে মুক্তি পিপাসু মানুষদের কাছে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। তারই ফলশ্রুতি হলো তাঁর গ্রন্থসমূহ।

বর্তমান গ্রন্থটি তাঁর লিখিত কুড়িটি নিবন্ধের সংকলন। এই নিবন্ধগুলিতে স্বামীজী গীতার আলোকে জীবনদর্শনের কথাই বলেছেন। বস্তুত স্বামীজীর জীবন গীতাময়। তাঁর সমস্ত চিন্তাই গীতার তাত্ত্বিক রসে সিঞ্চিত। এই গ্রন্থের সংকলিত নিবন্ধসমূহে সাধক এবং অবশ্যই সাধারণ পাঠকও সেই রসাস্বাদ করে প্রকৃত কল্যাণের পথে একটি সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত পাবেন।

অনুবাদক

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অজয় ভট্টাচার্য গায়ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ শ্রীহরিঃ ॥

সূচীপত্র

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

সর্বসাধনার সারকথা

জীবমাত্রেরই স্বরূপ হলো শুদ্ধ চিন্ময় সত্তা। এই সত্তা সৎ-স্বরূপ, চিৎ-স্বরূপ তথা আনন্দ-স্বরূপ। সর্বাবস্থাতেই এই নিত্য সত্তা নির্বিকার, অসঙ্গ। মানুষ যখন তার স্বরূপকে অর্থাৎ নিজেই নিজেকে ভুলে থাকে, তখনই তার চেতনায় দেহাভিমান সৃষ্টি হয় এবং সে আপনবোধে শরীরকেই আত্মা বলে মনে করে। শরীরকেন্দ্রিক এই আত্মভাবনা তিন প্রকারে ঘটে। প্রথম হলো **'আমি শরীর'**, দ্বিতীয়টি **'আমার শরীর'** এবং তৃতীয়টি হলো **'আমার জন্য শরীর'**।

জগতে আমাদের গোচরে প্রধানত দুটি বিষয়ের প্রকাশ ঘটে,—নশ্বর (জড়) আর অবিনশ্বর (চিৎ)। এই ভাগ দুটি পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর। এই বিভাজনই গীতায় উক্ত হয়েছে শরীর ও শরীরী, ক্ষর ও অক্ষর, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ আদি নামের মাধ্যমে। এই বিভাজনকেই সাধুসন্তগণ 'নাস্তিত্ব' ও 'অস্তিত্ব' বাচক নামে পরিচয় দিয়েছেন। আমার স্বরূপই হলো 'শরীরী' যা চিৎ, অবিনাশী, অক্ষর এবং ক্ষেত্রজ্ঞ ও প্রকৃত অস্তিত্ব। যা আমার স্বরূপ নয়, সেই বিভাগের অন্তর্গত হলো 'শরীর' তথা যা কিছু জড়, বিনাশী, ক্ষর ও ক্ষেত্র অর্থাৎ নাস্তিত্ববাচক সব কিছু। যা 'অস্তি' রূপে আছে তা নিত্য বিদ্যমান, অপর পক্ষে যা 'নাস্তি' রূপে প্রকাশিত তা একদিকে যেমন প্রাপ্ত হয়, অন্য দিকে তেমন হারাতেও হয়।

একটি প্রণিধানযোগ্য কথা হলো এই যে, **'নিত্য' অস্তিত্বকে আপাতভাবে শুদ্ধ অস্তিত্ব বলে চেনা যায় না, কিন্তু অনিত্যকে অনিত্যরূপে ঠিক ঠিক বুঝলে নিত্য অস্তিত্বকে বুঝতে পারা যায়।** এই ভ্রান্তির কারণ হলো, আমি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা আছি—এইভাবে অস্তিত্ব নিয়ে বিচার করতে হলে আমি যদি মন-বুদ্ধিকে ব্যবহার করি, চিত্তবৃত্তিকে ব্যবহার করি তাহলে তো 'নিত্য অস্তিত্বের' বোধের সাথে অনিত্যও (মন-বুদ্ধি, বৃত্তি, অহং-ভাব) মিশে থাকবে। কিন্তু 'আমি শরীর নয়', 'শরীর আমার নয়' এবং 'শরীর আমার জন্য নয়'—এই রকমভাবে যা নেই তাকে নেতিবাচক বিচার করলে ওই চিত্তবৃত্তিও নাস্তিত্ব-বাচক হয়ে যাবে এবং শুদ্ধ অস্তিত্বমাত্রই শেষ পর্যন্ত রয়ে যাবে। উদাহরণরূপে বলা যায়, ঝাড়ু দিয়ে গৃহের ধুলো-ময়লা দূর করার পর ঝাড়ুটিও পরিত্যক্ত হয়ে যায়, কিন্তু পরিচ্ছন্ন গৃহটি শেষ অবধিই থেকে যায়। অর্থাৎ **'আমি আত্মা'**, এই কথা মনের দ্বারা, চিন্তা ও বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয় করার পরও চিত্তবৃত্তির সঙ্গে আমার সম্বন্ধ থেকেই যাবে, কিন্তু **'আমি শরীর নয়'**—এইভাবে বিচার করলে শরীর ও চিত্তবৃত্তির মধ্যে সম্বন্ধের ভাব ছিন্ন হয়ে যাবে এবং চিন্ময় সত্তারূপে শুদ্ধ স্বরূপ স্বতঃপ্রকাশিত হয়ে পড়বে। **এইজন্যই তত্ত্ব উপলব্ধির লক্ষ্যে নিষেধাত্মক বা নেতিবাচক বিচারের সাধনই মুখ্য।** এই প্রকার সাধনায় সাধকের পক্ষে তিনটি কথা স্বীকার করে নেওয়া অতি আবশ্যক। সেগুলি হলো, 'আমি শরীর নয়', 'শরীর আমার নয়' এবং 'শরীর আমার জন্য নয়'। **যতকাল সাধকের এই ভাব থাকবে যে, 'আমি শরীর', 'আমার শরীর' তথা 'আমার জন্য শরীর' ততকাল সে যতই শাস্ত্রকথা ও উপদেশ নিয়ে পড়াশুনা করুক বা অন্যকে শোনাক, তার 'শান্তি'বোধ হবে না এবং 'কল্যাণ'প্রাপ্তিও ঘটবে না।** এইজন্যই গীতার শুরুতেই ভগবান সাধকের প্রয়োজনে এই কথায় বিশেষ জোর দিয়েছেন যে, 'যা পরিবর্তনশীল, যার জন্ম-মৃত্যু আছে, সেই শরীরটি আসলে তুমি নও।'

আমি শরীর নই

সর্বপ্রথম সাধককে এই কথা বিশেষভাবে বুঝে নিতে হবে যে, **'আমি' স্বরূপত চিন্ময় সত্তা, 'আমি' শরীর নয়।** আমরা বলি যে, ছোটবেলায় যে আমি ছিলাম, আজও সেই আছি। শরীরগতভাবে শৈশব থেকে এখন পর্যন্ত আমার শরীরে এতই পরিবর্তন হয়েছে যে তা এখন চেনা পর্যন্ত সম্ভব হয় না, অথচ আমরা 'সেই একই আছি' বলে নিজেদের অনুভব করে থাকি। শৈশবে আমি খেলাধুলো করতাম, তার পরের পর্যায়ে শুরু হল আমার পড়াশুনা, আজ আমি জীবিকার্জনের জন্য চেষ্টিত। সব বদলে গেছে, কিন্তু আমি সেই একই আছি। অথচ এই শরীর ক্ষণকালের জন্যও একরকম থাকে না, নিরন্তর তার মধ্যে পরিবর্তন হয়ে চলেছে। এর তাৎপর্য হলো এই যে, যা পরিবর্তনশীল তা কখনো আমার স্বরূপ হতে পারে না। **যা নিত্য অপরিবর্তনীয়, তাই হলো আমার স্বরূপ**।

আমি এখন পর্যন্ত অসংখ্য শরীর ধারণ করেছি, কিন্তু সব শরীর ত্যাগ হয়ে গেলেও, আমি একই থেকে গেছি। মৃত্যুর সময় তো এখানেই শরীর থেকে যাবে, কিন্তু আমি অন্য গর্ভে প্রবিষ্ট হব, স্বর্গ-নরকাদি লোকে আমি যাব, আমার একসময় মুক্তিও হবে, আমি ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করব। অর্থাৎ আমার স্ব-অস্তিত্ব শরীরের অধীনে নয়। শরীরের হ্রাস-বৃদ্ধিতে, দুর্বলতা বা সবলতায়, বাল্যে বা বৃদ্ধাবস্থায়, কিংবা থাকা না থাকায় আমার সত্তার কিছু যায়-আসে না। যেমন, আমি কোন গৃহে বাস করা মানে তো আমি সেই গৃহ হয়ে যাই না। গৃহ আলাদা, আমি আলাদা, গৃহ যেখানে ছিল সেখানেই থাকে, আমি সেটি ছেড়ে চলে যাই। তেমনই দেহ বা শরীর এখানেই থেকে যায়, আমরা দেহত্যাগ করে চলে যাই। শরীর তো মাটির সঙ্গে মিশে যায়, কিন্তু আমি তা হই না। আমাদের স্বরূপ সম্পর্কে গীতায় বলা হয়েছে—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥

(গীতা ২।২৩-২৪)

'অস্ত্র এই শরীরীকে কাটতে পারে না, অগ্নি একে জ্বালাতে পারে না, জল একে আর্দ্র করতে পারে না এবং বায়ু একে শুকিয়ে দিতে পারে না। এই শরীরীকে (সত্তাকে) কাটা যায় না, জ্বালানো যায় না, আর্দ্র করা যায় না, শুকনোও করা যায় না। কারণ এটি নিত্য-অস্তিত্ব, সর্বত্র পরিপূর্ণ, অচল, স্থির স্বভাবসম্পন্ন তথা অনাদি।'

অর্থাৎ শরীরের ক্ষেত্রটাই পৃথক কিন্তু অপরিবর্তনীয় শরীরী অর্থাৎ স্বরূপের ক্ষেত্রটা একেবারে অন্য। আমাদের স্বরূপ কোনভাবেই শরীরের সঙ্গে লিপ্ত নয়। এইজন্য ভগবান গীতায় স্বরূপকে সর্বব্যাপী বলে অভিহিত করেছেন—**'যেন সর্বমিদং ততম্'** (২।১৭), **'সর্বগতঃ'** (২।২৪) অর্থাৎ **স্বরূপ জীবের শরীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, প্রকৃতপক্ষে তা সর্বব্যাপী।**

শরীর সৃষ্টি হয় পৃথিবীতেই (মাতৃগর্ভে), এইখানেই তা চলাফেরা করে এবং মৃত্যুর পর এই পৃথিবীতেই তার লয় হয়ে যায়। এই শরীরের তিনটি অন্তিমদশা দেখা যায়—হয় এটি চিতায় ভস্মীভূত হবে, কিংবা এটিকে মাটির তলায় কবর দেওয়া হবে, অথবা জন্তু-জানোয়ারের খাদ্যরূপে পরিশেষে তা বিষ্ঠায় পরিণত হবে। তাই শরীরকে মুখ্য বলে ধরা যায় না, বস্তুত আমাদের স্বরূপই হলো মুখ্য সত্তা।

যদিও প্রকৃত অস্তিত্ব আত্মসত্তারই, শরীরের নয় ; তথাপি সাধকের এই ভুলটা হয়ে থাকে যে, সে আগে শরীরকে দেখে তবে আত্মার অবস্থিতি বোঝে, আগে আকৃতিকে দেখে তারপর ভাবকে বুঝতে পারে। চাকচিক্যের জন্য কোন জিনিসের ওপরে যে পালিস করা হয় তা

কতটুকু সময়ের জন্য স্থায়ী হয় ? সাধকের বিচার করা উচিত, আত্মা না দেহ, কোন্‌টি আগের প্রকাশ। বিচারের দ্বারা এইটাই প্রমাণিত হয় যে, **আত্মাই আগের, শরীর পরে সৃষ্টি হয়েছে**। ভাব আগে, আকৃতি পরে। এইজন্য আমাদের দৃষ্টি আগে ভাবরূপ আত্মস্বরূপের প্রতি চালিত হওয়া উচিত, শরীরের প্রতি নয়।

ভোজনালয় যেমন ভোজন করার স্থান, তেমনই এই শরীর হলো সুখ-দুঃখ ভোগ করার স্থান (ভোগায়তন)। আসলে শরীর সুখ-দুঃখ ভোগ করে না, শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধীভূত 'আমি'ই হলো ভোক্তা। ভোগ করার স্থান আর ভোগকারী বা ভোক্তা একেবারেই পৃথক। বস্তুত শরীর তো ওপরের খোলসমাত্র। আমি যে রকম বস্ত্রই পরি না কেন, সেটি পৃথকই থাকে, আমি পৃথক নই। যেমন অনেকবার বস্ত্র পরিবর্তন করলেও আমি একই থাকি, অনেক হয়ে যাই না, তেমনই অনেক প্রজাতিতে জন্মান্তরে অনেক শরীর ধারণ করলেও আমি স্বয়ং স্বরূপত একই (পূর্ববৎ) থেকে যাই। যেমন পুরোনো বস্ত্র পরিত্যাগ করলেও আমি মরি না, আর নতুন বস্ত্র পরিধান করলে আমি নবজন্ম লাভ করি না, তেমনই পুরোনো শরীর ত্যাগ করলে আমি মরি না এবং নতুন শরীর ধারণ করায় আমি জন্মাই না[১]। অর্থাৎ শরীরেরই জন্ম হয়, মৃত্যু হয়, আমার জন্ম-মৃত্যু নেই। আমিই যদি মরে যাই তো আমার কর্মফলের পাপ-পুণ্য কে ভোগ করবে ? অন্য প্রজাতিতে তথা স্বর্গ-নরকে কে যাবে ? কার বন্ধন হবে ? মুক্তই বা কে হবে ? **আমার জীবন এই শরীরের অধীনে নয়। আমার আয়ুর দৈর্ঘের শেষ নেই,** তা **অনাদি অনন্ত**। মহাসর্গ তথা মহাপ্রলয় হলেও আমার জন্ম-মৃত্যু হয় না, বাস্তবিকই আমি অপরিবর্তনীয় স্বরূপ, যেমন তেমনই বর্তমান থাকি—

---

[১]বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥
(গীতা ২।২২)

'সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ' (গীতা ১৪।২)।

আমার এবং এই শরীরের স্বভাব সম্পূর্ণ পৃথক। আমি শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট আছি মাত্র, কিন্তু শরীরের সঙ্গে মিলে যাইনি। শরীরও আমার সঙ্গে এক হয়ে নেই। শরীর যেমন সংসারে থাকে, আমি কিন্তু শরীরে তেমনভাবে নেই। **শরীরের সঙ্গে আমার কখনো মিলনই হয়নি, হয় না, হবে না, হতেও পারে না।** বস্তুত আমার জন্য শরীরের কোন প্রয়োজনই নেই। শরীর ব্যতিরেকেই আমি স্বয়ং আনন্দে থাকি। অর্থাৎ **শরীর না থাকলেও আমার কিছুই ক্ষতি হয় না।** এখন পর্যন্ত আমি অসংখ্য শরীর ধারণ ও ত্যাগ করে এসেছি, কিন্তু তার ফলে আমার স্বরূপ-সত্তায় তফাতটা কী হয়েছে ? আমার কী লোকসান হয়েছে ? আমি তো যেমন ছিলাম তেমনই রয়ে গেছি—**'ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে'** (গীতা ৮।১৯)।

শরীর, ইন্দ্রিয়গুলি, মন, বুদ্ধি ও অহংকার কেন্দ্রিক অভাবের অনুভব তো সকল জীবই করে থাকে, কিন্তু নিজের সত্তার অভাবের অনুভব কারও কখনো হয় না। উদাহরণরূপে বলা যায়, সুষুপ্তি (গাঢ়নিদ্রা) কালে আমরা শরীরের 'অভাব' বোধে থাকি। কেউ কিন্তু এই কথা বলে না যে, সুষুপ্তির সময় আমি ছিলাম না, আমার তখন মৃত্যু হয়েছিল। কারণ শরীরাদির অভাববোধ থাকা সত্ত্বেও আমার অনুভবে কিন্তু 'আমি'বোধের অভাব ছিল না। সেইজন্যই ওই নিদ্রাভঙ্গের পর আমি বলি, এমন মহাসুখে আমি শুয়েছিলাম যে অন্য কোন কিছু অনুভবই করিনি। সুষুপ্তিতেও আমার আত্মসত্তা কিন্তু সেই অবিকারী এক ভাবেই বর্তমান ছিল। **এর দ্বারা এটি সিদ্ধ হয় যে, আমার অস্তিত্ব শরীর, ইন্দ্রিয়সমূহ, মন, বুদ্ধি ও অহংকারের অধীনে থাকে না।** স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর ও কারণশরীর এই সবেরই অভাববোধ আমার সম্ভব হতে পারে কিন্তু আমার আত্মচৈতন্যের অভাব কখনোই সম্ভব নয়।

আমার স্বরূপ স্বতই স্বাভাবিকভাবে অসঙ্গ—**'অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ'** (বৃহদারণ্যক ৪।৩।১৫), **'দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ'** (গীতা ১৩।২২)। এইজন্য শরীরের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ মেনে নিলেও বস্তুত আমি শরীরে লিপ্ত হই না। শরীরের সঙ্গ করলেও প্রকৃতপক্ষে আমি (স্বরূপত) অসঙ্গই থাকি। সেইজন্যই ভগবান বলেছেন—**'শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে'** (গীতা ১৩।৩১)। অর্থাৎ **বদ্ধাবস্থায়ও স্বরূপ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুক্তই থাকে। বদ্ধতাকে আমরা মেনে নিলেও আমাদের স্বরূপ স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই মুক্ত থাকে।** যেমন অন্ধকার আর আলোর প্রকাশে কোন আপস-মিলন সম্ভব নয়, তেমনই শরীর (বিনাশী, জড়) আর স্বরূপ (অবিনাশী, চিৎ) কখনোই মিলতে পারে না। কারণ এই শরীর জগৎ-সংসারের অংশ, আর আমি স্বয়ং পরমাত্মার অংশ।

একই দোষ বা গুণ স্থানভেদে অনেকভাবে প্রকট হয়। **শরীরকে স্বরূপের অর্থাৎ নিজ-স্বয়ং-এর থেকেও বেশি মর্যাদা দেওয়া অর্থাৎ প্রকারান্তরে শরীরকেই আত্মস্বরূপ বলে মনে করাই হলো আমাদের মূল ত্রুটি, যা থেকে বাকি সকল দোষ বা ভ্রান্তির উৎপত্তি সম্ভব হয়। নিজের স্বরূপ, যা চিন্ময় সত্তামাত্র, তাকে শরীরের থেকে অধিক গুরুত্ব দেওয়াই হলো মূল গুণ, যার থেকে সকল সদ্‌গুণের উৎপত্তি ঘটে।**

গীতার প্রারম্ভেই অর্জুন ভগবানকে নিজের কল্যাণের উপায় কী তা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, **'যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে'** (২।৭)। এর উত্তরে ভগবান প্রথমে শরীর ও শরীরী-র (স্বরূপ) বর্ণনা করেছিলেন। এর দ্বারা বোঝা যায়, **যে মানুষ নিজের প্রকৃত কল্যাণ চায় তার প্রথমেই জানা আবশ্যক যে, 'আমি শরীর নই'**। যতকাল তার 'আমি শরীর', এই ভাব থাকবে ততকাল সে যতই উপদেশ শুনুক অথবা শোনাক আর সাধনার অভ্যাস করুক, তার প্রকৃত কল্যাণ হবে না।

মানবদেহে বিবেক-বোধের প্রাধান্য রয়েছে। তাই 'আমি শরীর

নই'—এই বিবেকবোধ একমাত্র মানব শরীরেই প্রকাশিত হতে পারে। **শরীরকেই 'আমি' বলে মনে করা কিন্তু প্রকৃত মনুষ্যত্বের লক্ষণ নয়, বস্তুত তা পশুত্বের পর্যায়ে পড়ে।** এইজন্য শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলেছিলেন—

ত্বং তু রাজন্ মরিষ্যেতি পশুবুদ্ধিমিমাং জহি।
ন জাতঃ প্রাগভূতোঽদ্য দেহবত্ত্বং ন নঙ্ক্ষ্যসি॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১২।৫।২)

'হে রাজন্! এখন তুমি, 'আমি মরে যাব' ভাবনারূপ পশুত্ববোধ ছেড়ে দাও। শরীর যেমন আদিতে ছিল না, পরে তার জন্ম হয়েছে এবং তার মৃত্যুও হবে, তেমনই তুমি যে আগে ছিলে না, পরে জন্মেছ এবং মরে যাবে— এমন কোন কথা নেই।'

শরীর কখনোই একরূপে থাকে না আর আমাদের স্বরূপ কখনোই বিভিন্ন রূপ পেতে পারে না। জন্মের আগেও শরীর ছিল না, মৃত্যুর পরেও তা থাকবে না, আবার বর্তমানেও প্রতিক্ষণে তা মরছে। বস্তুত গর্ভে আসার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের মরণের ক্রমও শুরু হয়ে যায়। বাল্যাবস্থার দশাগত মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যুবাবস্থার প্রকাশ ঘটে। যুবাবস্থার বিলয়ের মাধ্যমে আসে বৃদ্ধাবস্থা। আবার এই বৃদ্ধাবস্থার মৃত্যু হলে দেহান্তর দশা অর্থাৎ নতুন শরীরের প্রাপ্তি ঘটে—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥

(গীতা ২।১৩)

বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য—এই তিন দশা স্থূলশরীরেই হয়, আর দেহান্তর প্রাপ্তি হয় সূক্ষ্ম ও কারণশরীরের। দেহান্তর প্রাপ্তি (মৃত্যু) হলে স্থূলশরীর ত্যাগ হয়ে গেলেও সূক্ষ্ম ও কারণশরীরের ত্যাগ হয় না। যতকাল মুক্তি না হয়, সূক্ষ্ম ও কারণশরীরের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধও ততকাল থেকে যায়। অর্থাৎ, আমাদের প্রকৃত স্বরূপ হলো স্থূল, সূক্ষ্ম ও

কারণ—এই তিন শরীর তথা এগুলির দশার অতীত সত্তা। শরীর ও তার দশার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু আত্মস্বরূপ নিত্য একরূপ। **জন্ম ও মৃত্যু আত্মার (সত্তার) ধর্ম নয়, তা শরীরেরই ধর্ম। আমাদের আয়ু অনাদি-অনন্ত, যার অন্তর্বর্তীকালে অসংখ্য শরীরের জন্ম ও মৃত্যু হয়ে চলেছে।** আমাদের স্বাতন্ত্র্য ও অসঙ্গত্ব স্বতঃসিদ্ধ। অসঙ্গ (নির্লিপ্ত) হওয়ার ফলে আমি অনেক শরীর ধারণ করলেও স্বরূপত একই রকম থাকি, যদিও শরীরের সঙ্গকে দেহাত্মবোধে ধারণা করায় আমাকে একের পর এক বহু সংখ্যক শরীর ধারণ করতে হচ্ছে। মেনে নেওয়া কোনও সঙ্গই স্থায়ী নয়, তবুও আমরা নতুন নতুন সঙ্গ অর্থাৎ বস্তু-ব্যক্তি-পদার্থ প্রভৃতিকে নিজস্ব বলে মেনে নেই। যদি নতুন সঙ্গ না করি তাহলে স্বতঃসিদ্ধভাবেই মুক্তি ঘটবে।

বালির মৃত্যুর পর তার স্ত্রী তারাকে শ্রীরাম বলেছিলেন—

তারা বিকল দেখি রঘুরায়া। দীন্‌হ গ্যান হরি লীন্‌হী মায়া॥
ছিতি জল পাবক গগন সমীরা। পঞ্চ রচিত অতি অধম সরীরা॥
প্রগট সো তনু তব আঁগে সোবা। জীব নিত্য কেহি লগি তুম্‌হ রোবা॥
উপজা গ্যান চরন তব লাগী। লীন্‌হেসি পরম ভগতি বর মাগী॥

(শ্রীরামচরিতমানস, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ১১।২-৩)

স্থান বদলায়, কাল বদলায়, বস্তুসমূহ বদলে যায়, ব্যক্তি বদলে যায়, অবস্থা বদলে যায়, পরিস্থিতি বদলে যায়, ঘটনাসমূহ বদলে যায়, কিন্তু প্রকৃত 'আমি' বা আত্মস্বরূপ বদলায় না। আমি নিরন্তর একই থাকি। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—তিন দশাই পাল্টে যায়, কিন্তু তিন অবস্থার মাঝে আমি একই থাকি। সেইজন্যই এই তিন অবস্থা ও তাদের পরিবর্তনকে (শুরু ও শেষ) বোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়। স্থূলদৃষ্টিতে বিচার করলে মনে হবে ব্যাপারটা যেন আমার হরিদ্বার থেকে রায়বালায় যাওয়া আবার রায়বালা থেকে হৃষীকেশ আসা। যদি হরিদ্বার বা রায়বালায় কিংবা হৃষীকেশে আমি স্থায়ী বাসিন্দাই হই তবে হরিদ্বার থেকে

হৃষীকেশে কী করে আসবো ? সুতরাং আমি হরিদ্বারের বাসিন্দা যেমন নয়, রায়বালা বা হৃষীকেশেরও নয়, অর্থাৎ এই তিন স্থান থেকেই পৃথক সত্তা। হরিদ্বার, রায়বালা ও হৃষীকেশ তো পৃথক পৃথক স্থান, কিন্তু আমি এই তিন স্থানকেই জানতে পারা একক সত্তা। এইরকমই আমি সর্বাবস্থাতেই একই থাকি। এই কারণে আমার পরিবর্তনশীলের দিকে নজর না করে স্থায়ী সত্তার (স্বরূপ) দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত—

রহতা রূপ সহী কর রাখো বহতা সঙ্গ ন বহীজে।

স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই তিন শরীর যেমন আমার নিজের নয়, ঠিক তেমনই **স্থূলশরীর মাধ্যমে হওয়া ক্রিয়া, সূক্ষ্মশরীর মাধ্যমে হওয়া চিন্তন এবং কারণশরীর মাধ্যমে হওয়া স্থিরতা তথা সমাধি পর্যন্ত আমার নয়।** কারণ এর প্রত্যেকটি ব্যাপারেরই শুরু ও শেষ আছে। প্রতিটি চিন্তা যেমন আসে তেমন চলেও যায়। স্থিরতার পর আবার চাঞ্চল্য আসে, সমাধির পর আসে ব্যুত্থান। ক্রিয়া, চিন্তন, স্থিরতা ও সমাধি—কোনটির দশাই স্থায়ী হয় না। এইগুলির আসা-যাওয়ার অনুভব তো সবারই হয়, কিন্তু নিজের আত্ম-অস্তিত্বের আসা-যাওয়া বা কোন পরিবর্তনের অনুভব কখনোই কারোর হতে পারে না। বস্তুত আত্ম-অস্তিত্বের বোধ চিরস্থায়ী।

আমাদের এটা বিবেচ্য যে, চুরাশি লক্ষ প্রজাতিতে একের পর এক শরীরে আমি জন্মানো সত্ত্বেও কোন শরীরই আমার সঙ্গে থাকেনি, তাহলে এই শরীরটা আমার সঙ্গে কী করে থাকবে ? **যখন চুরাশি লক্ষ শরীর আমি বা আমার নয় তাহলে আমার বর্তমান শরীরই বা আমার হবে কী করে, তা হতে পারে না।**

শরীর আমার নয়

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বস্তুও আছে অনন্ত, কিন্তু তার কিঞ্চিন্মাত্রও যখন আমার নয়, তাহলে শরীরটাকে আমি নিজের বলে দাবি করি কী করে ? **যে বস্তু পাওয়া গেলেও আবার তাকে হারাতেও হয় তা বস্তুত আমার**

নয়, এটি একটি সিদ্ধান্ত। আমি যে শরীরপ্রাপ্ত হই, একসময় তো তার ত্যাগও হয়ে যায়, সুতরাং সেটি অবশ্যই আমার নয়। **প্রকৃতই নিজের হতে পারে তা-ই যা সর্বদা আমার সঙ্গে যেমন থাকবে, তেমন আমিও তার সঙ্গে সব সময় থাকব।** যদি শরীরটা আমারই নিজের হত তাহলে তো সেটি সর্বদাই আমার সঙ্গে একভাবে থাকত এবং আমিও তার সঙ্গে থাকতাম। কিন্তু এই শরীর এক ক্ষণের জন্যও আমার সঙ্গে থাকে না আর আমিও তার সঙ্গে থাকি না।

কোন বস্তু সত্যিই নিজের হয় আর কোন বস্তুকে নিজের বলে মেনে নেওয়া হয়। ভগবান আমার আপন, কারণ আমি তাঁরই অংশ—**'মমৈবাংশো জীবলোকে'** (গীতা ১৫।৭)। তিনি কখনোই আমাকে ছেড়ে যান না। কিন্তু শরীরটা আমার নয়, তাকে আমার বলে মনে করি মাত্র। যেমন কোন নাটকে কেউ রাজা সাজে, কেউ সাজে রানি, কেউবা সিপাই সাজে, কিন্তু সবাইকেই নাটকটির প্রয়োজনে সাজানো, আসলে কেউই ওই পরিচয়ের নয়। ঠিক সেইরকমই এই শরীর সংসারের ব্যবহারের (কর্তব্যপালন) জন্য নিজের বলে মনে করা। প্রকৃতপক্ষে তা নিজের নয়। যা **বস্তুতই আমার আপন, সেই পরমাত্মাকেই আমি ভুলে আছি, আর যা আমার আপন নয়, সেই শরীরকে আমি নিজের বলে মেনে নিয়েছি—এ আমার মস্ত বড় এক ভ্রান্তি।** শরীর স্থূল বা সূক্ষ্ম কিংবা কারণ এর যেটাই হোক না কেন—এ সবই প্রকৃতিজাত। এগুলিকে নিজের বলে মনে করার ফলেই তো আমরা সংসারের বন্ধনে আটকে আছি।

পরমাত্মার অংশ হওয়ায় আমরা পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন। প্রকৃতির অংশ হওয়ায় শরীরও প্রকৃতির সাথে অভিন্ন। যা আমার সঙ্গে অভিন্ন তাকে আমার থেকে পৃথক মনে করা আর যা আমার থেকে পৃথক তাকে আপন মনে করাই হলো সকল দোষের মূল। যা নিজের নয় তাকে আপন বলে মনে করার ফলেই যা বাস্তবিকই আপন, তাকে আপন বলে বুঝতে

পারা সম্ভব হয় না।

এটা আমাদের সকলেরই অনুভবে ধরা পড়ে যে, প্রকৃতপক্ষে শরীরের ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ (অধিকার) নেই। আমরা আমাদের ইচ্ছামতো শরীরকে বদলাতে পারি না, বৃদ্ধাবস্থা থেকে যুবাবস্থায় ফিরতে পারি না, রোগ হলেই নীরোগ হয়ে যেতে পারি না, দুর্বল দশাকে খুশিমতো সবল বানাতে পারি না, কুরূপকে সুরূপ করে দিতে পারি না, মৃত্যুকে প্রত্যাখ্যান করে অমর হতে পারি না। যতই যত্ন করি না কেন, অবাঞ্ছিত হলেও আমাদের শরীরে রোগ আসেই, তা দুর্বল হয়ে যায়, জরাগ্রস্ত হয় এবং এক সময় মৃতও হয়। তাহলে যেটার ওপর আমার কোন বশই (জোর) নেই সেটাকে নিজের বলে মনে করা তো মূর্খতা।

শরীর আমার জন্য নয়

শরীর বিনাশশীল, কিন্তু আমাদের স্বরূপ অবিনশ্বর। অবিনাশী তত্ত্বের নিজের বস্তুও তো অবিনাশীই হবে। কোন বিনাশশীল বস্তু অবিনাশীর আপন কী করে হবে ? তা অবিনাশীর কী কাজেই-বা লাগবে ? অমাবস্যার রাত্রি সূর্যের কোন্ কাজে আসবে ? জাগতিক শরীরাদি বস্তুর দ্বারা সংসারের প্রয়োজনই মিটতে পারে, আমার স্বরূপের কিঞ্চিন্মাত্র প্রয়োজনও তার দ্বারা সাধিত হতে পারে না। এইজন্যই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন বস্তু হতেই পারে না যা আমার বা আমার জন্য। তাই **'শরীর আমার' বা 'শরীরের দ্বারা আমার কোন লাভ হবে'—এই ধারণা একেবারেই মিথ্যা।**

কর্ম-সাধনের জন্যই শরীর এবং কর্ম তো সম্পাদিত হয় কেবল সংসারের প্রয়োজনেই। যেমন কোন লেখক যখন লিখতে বসেন, তখন তিনি হাতে লেখনী গ্রহণ করেন, লেখা শেষ হলেই তিনি লেখনীও হাত থেকে রেখে দেন। সেইরকমই আমাদের কর্ম সম্পাদনের জন্যই শরীরের প্রয়োজন, কর্ম শেষ হলে শরীর হতে নির্লিপ্ত হওয়া কর্তব্য। আমাকে যদি আর কোন কর্ম না করতে হয় তাহলে আর আমার শরীরের কী

প্রয়োজন ? যদি আমি কিছুই না করি তো শরীরের উপযোগিতাই আর থাকে না। আসলে **পরিবার, সংসার তথা সমাজের সেবার জন্যই তো শরীরের প্রয়োজন, তাতো কখনোই নিজের জন্য নয়।** স্থূলশরীরের দ্বারা যে ক্রিয়া, সূক্ষ্মশরীরের মাধ্যমে যে চিন্তা-ভাবনা এবং কারণশরীরে সম্ভাব্য যে স্থিরতা ও সমাধি—এগুলিও আমার জন্য নয়। আমার কাছে, ক্রিয়া বা চিন্তন কিংবা স্থিরতা অথবা সমাধির কোন ব্যাপারই নেই। এই সবই প্রাকৃত ব্যাপার যা সংসারের কাজেই প্রযোজ্য। আমার স্বরূপ এই সমস্ত কিছু থেকেই নির্লিপ্ত।

শরীরটা যদি আমার জন্যই হত তবে তো সেটি লাভ হলে আমি পূর্ণতৃপ্ত হয়ে যেতাম, আর কিছু প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছাই থাকতো না এবং কখনো আমি শরীর থেকে বিযুক্ত হতাম না, এটি সর্বদাই আমার সঙ্গে থাকতো। কিন্তু আমরা সবাই বুঝতে পারি যে, শরীর ধারণ করলেই তৃপ্তি হয় না, সব ইচ্ছাও পূরণ হয় না, পূর্ণতার অনুভব তো হয়ই না এবং এই শরীরও চিরদিন আমার সঙ্গে থাকে না, তা অবশ্যম্ভাবীভাবে ত্যাগ হয়েই যায়। অতএব শরীর আমার জন্য নয়।

এখানে একটা সংশয় আসতে পারে যে, শরীর যদি আমাদের না-ই হয়, তাহলে শাস্ত্রগুলিতে মনুষ্যদেহের এতো মহিমা কেন প্রচারিত হয়েছে। এর মীমাংসারূপে বক্তব্য যে, বস্তুত **এই মহিমা শরীরের (আকৃতির) জন্য নয়, তা হলো বিবেকের জন্য।** আকৃতির নাম 'মানুষ' নয়, প্রকৃতপক্ষে তা বিবেকশক্তিরই নামান্তর। মানবশরীরে মস্তিষ্কটি এমন বিশেষত্ব সহকারে সৃষ্ট যে, তার মাধ্যমে সৎ ও অসৎ এবং কর্তব্য ও অকর্তব্যবোধ বিশেষরূপে প্রকাশিত হতে পারে। এই রকম মস্তিষ্ক অন্য কোন প্রজাতির শরীরে নেই। অন্যান্য (পশু আদি) শরীরে ক্রিয়াশীল বিবেচনা বোধ শুধুমাত্র তাদের জীবনধারণের প্রয়োজনেই সীমাবদ্ধ। এইজন্যই বিবেক-বিরোধী সম্বন্ধগুলিকে ত্যাগ অর্থাৎ 'আমি শরীর নই, শরীর আমার নয়, তথা শরীর আমার জন্য নয়' এই বোধ মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

উপসংহার

এই শরীরকে 'আমি', 'আমার' বা 'আমার জন্য' মনে করা হলো বিবেকবিরোধী সম্বন্ধ। **এইরকম সম্বন্ধ বজায় রেখে কোন সাধকের পক্ষেই সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়।** দেহাত্মবোধে লিপ্ত থেকে কেউ যতই 'তপস্যা' করুক, 'সমাধি' অভ্যাস করুক, লোক-লোকান্তর পরিভ্রমণ করুক কিংবা যজ্ঞ, দানাদি বড় বড় পুণ্যকর্ম করুক, তার বদ্ধতার বন্ধন কোনভাবেই ছিন্ন হয় না। কিন্তু **দেহাত্মবোধ ত্যাগ হলেই বদ্ধতা কেটে যায় এবং তার বোধে সত্যতত্ত্বের উপলব্ধি ঘটে।** এইজন্যই বিবেকবিরোধী সম্বন্ধগুলিকে ত্যাগ না করা পর্যন্ত সাধকের নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। যদি দেহকেন্দ্রিক সম্বন্ধগুলিকে আমি ত্যাগ না করি তাহলেও এই দেহকে আমি ধরে রাখতে পারব না, দেহই আমাকে ত্যাগ করবে। যা আমাকে ত্যাগ করবেই, তাকে আগে থেকেই আমার ত্যাগ করা (অর্থাৎ তার সম্বন্ধে নিরাসক্ত হওয়া) এমন কী কঠিন কাজ ? **যে কোন সাধন মার্গেরই সাধক হোক না কেন এই সত্য স্বীকার করতেই হবে যে, আমি শরীর নয়, শরীর আমার নয়, তথা শরীর আমার জন্য নয়।** কারণ এই শরীরের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ মেনে নেওয়াই (অর্থাৎ দেহাত্মবোধই) হলো জীবের মূল বন্ধন অথবা ভ্রান্তিরূপ দোষ, যা থেকে সমস্ত দোষের উৎপত্তি হয়।

শরীর হলো সংসারের বস্তু। সাংসারিক কোন বস্তুকে 'আমি' 'আমার' বা 'আমার জন্য' বলে মনে করাটা তো একরকম মিথ্যাচার, আর এই মিথ্যাচারের শাস্তি হলো বারংবার জন্ম-মৃত্যু-রূপ অতীব দুঃখজনক অভিজ্ঞতার মধ্যে বদ্ধ থাকা। সেইজন্য সাধকের কর্তব্য হলো অকপট নিষ্ঠা সহকারে সংসারের বস্তুকে সংসারেরই মনে করে শরীরকে সংসারের সেবাতেই ব্যাপৃত রাখা আর ভগবানের বস্তুকে অর্থাৎ নিজের আমিত্বকে ভগবানেরই বস্তু রূপে মেনে নিয়ে তাঁরই পাদপদ্মে সমর্পিত করে রাখা। এই শরণাগতির মধ্য দিয়েই সাধিত হয় মনুষ্যজন্মের পূর্ণ সার্থকতা।

~~~০~~~
~~~

সত্যের স্বীকৃতিতে কল্যাণ

মানুষ দুটি জিনিস দেখে—একটি অবিনাশী এবং অন্যটি নশ্বর। স্বরূপ হলো অবিনাশী এবং শরীর-সংসার হলো নশ্বর। স্বরূপ সম্পর্কে গীতায় এবং রামায়ণে (শ্রীরামচরিতমানসে) বলা হয়েছে—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। (গীতা ১৫।৭)

'এই সংসারে আত্মার প্রকাশরূপে যে জীব তা আমারই সনাতন অংশ।'

ঈশ্বর অংস জীব অবিনাসী। চেতন অমল সহজ সুখ রাসী।।

(শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ১১৭।১)

তাৎপর্য হলো এই যে, আমাদের সম্বন্ধ শরীর--সংসারের সঙ্গে নেই। বস্তুত ভগবানের অংশ হওয়ায় আমাদের সম্বন্ধ ভগবানেরই সঙ্গে। আমাদের যে প্রধান ভুলটি হয় তা হলো এই যে, আমরা নিজেদের সংসারের এবং সংসারকে নিজেদের বলে মেনে নিয়েছি অর্থাৎ শরীর-সংসারের সঙ্গে নিজেদের সম্বন্ধ জুড়ে নিয়েছি।

পরমাত্মার অংশ হওয়ার কারণে আমরা পরমাত্মা থেকে দূরে থাকতে পারি না এবং সংসারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেতেও পারি না—এটি পুরোপুরি পাকা কথা, সিদ্ধান্তের কথা। পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কখনই ভেঙে যেতে পারে না এবং জড় শরীরের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ যুক্ত হতেই পারে না। কিন্তু যাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আছে তাকে তো ভুলে গিয়েছি আর যার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ নেই তাকে আপন বলে মেনে নিয়েছি। এটি আমাদের বড় ভুল। যদি আমরা মেনে নিই যে আমরা ভগবানের এবং ভগবান আমাদের তাহলে 'সংসার আপন নয়' এটি নিজে থেকেই সিদ্ধ হয়ে যায়। যদি আমরা এটি মেনে নিই যে আমরা সংসারের নই এবং সংসার আমাদের নয় তাহলে 'ভগবান আমাদের'

এটি নিজে থেকেই সিদ্ধ হয়ে যাবে। দুটির মধ্যে একটিকে স্থির করে নিন।

ভেবে দেখুন, জড় তথা পরিবর্তনশীল সংসারের সঙ্গে আমাদের কী ঐক্য হতে পারে ? যদি তা হতে না পারে তাহলে এই কথাটি মানতে শুরু করুন যে সংসারের সঙ্গে আমাদের ঐক্য নেই ; তার সঙ্গে ঐক্য আছে একথা মানা ভুল। এই ভুলটিকে যদি অন্তত আমরা অন্তর থেকে বুঝতে পারি তাহলে কোন না কোন সময়ে কাজ হাসিল হয়ে যাবে। যদি সংসারের সঙ্গে নিজেদের ঐক্য মেনে নেন তাহলে তাতে কেবল লোকসানই হবে, কোন লাভ হবে না। আর যদি ঐক্য আছে বলে না মানেন তাহলে কেবল লাভই হবে, কোন লোকসান হবে না।

অত্যন্ত সত্য কথা হলো যে শরীর নিজেদের সঙ্গে থাকবে না। যা নিজস্ব নয় তা নিজের সঙ্গে কী করে থাকবে ? ভগবান হলেন আমাদের, তিনি আমাদের কাছ থেকে দূরের হয়ে যাবেন কী করে ? আমরা ভগবান থেকে দূরে হতে পারি না এবং ভগবানও আমাদের থেকে দূরে থাকতে পারেন না। শরীর, বস্তু, অর্থ, জমি, বাড়ি সবই নশ্বর। এগুলি আমাদের সঙ্গে থাকতে পারে না এবং আমরাও ওইগুলির সঙ্গে থাকতে পারি না। কিন্তু ভগবানকে আমরা জানি বা নাই জানি তাঁর সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ কখনো হতে পারে না। এটি পাকা কথা। শরীর স্থূল হোক, সূক্ষ্ম হোক অথবা কারণ-শরীর হোক, তা সর্বতোভাবে প্রকৃতির এবং আমরা ভালমন্দ যাই হই ; সর্বতোভাবে ভগবানের। যদি এই কথা বোধগম্য হয় তাহলে আজই আমরা জীবন্মুক্ত হয়ে যাব। কেননা নশ্বর বস্তুগুলিকে নিজেদের বলে মনে করেই আমরা বাঁধা পড়ে গেছি। যেগুলিকে নিজের বলে মনে করেছি সেগুলিতেই বাঁধা পড়ে গেছি। যেগুলিকে নিজের বলে মানি না, সেগুলির দ্বারা আমরা আবদ্ধও হই না।

প্রশ্ন—কথা তো বুঝতে পারছি কিন্তু ভিতর থেকে সাড়া পাচ্ছি না। কী করব ?

উত্তর—ভেবে দেখুন যে আপনি এটি মেনে নেওয়াকে ঠিক বলে মনে করেন, না কি মেনে না-নেওয়াকে ঠিক বলে মনে করেন ? যদি মেনে নেওয়াকেই ঠিক বলে মনে করেন তাহলে কে বারণ করছে ? যদি লাভজনক মনে হয় তাহলে তাকে জোর করে মেনে নেওয়া উচিত। মেনে নিলে তা খুব সহজ হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবে আপনি আন্তরিকভাবে এটা মান্য করতে চান না। আমার মনে হয় এর মূল কারণ হলো—সুখের আসক্তি। **সুখ-লোলুপতার কারণেই সত্য কথনটি স্বীকৃতি লাভ করছে না।**

আপনি চোখ বন্ধ করে, দাঁতে দাঁত চেপে, বুক শক্ত করে এই কথাটি মেনে নিন যে আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার। শরীর নিজের নয়, কখনই নয়। যখন শরীরই নিজস্ব নয়, তাহলে সংসারের কোন্ বস্তু নিজের ?

প্রশ্ন—সামনে কোন জিনিস দেখলে তার প্রভাব পড়ে। এই অবস্থায় কী করব ?

উত্তর—প্রভাবকে ততটা বড় মনে করবেন না। কোন জিনিসকে দেখলে যদি সেটা আমাদের ভাল লাগে, প্রিয় মনে হয়, তাকে পেতে ইচ্ছা করে—এই রকম প্রভাব যদি পড়ে তাহলে অন্তর থেকে এই ভাবনা ওঠা উচিত যে এই জিনিসটি আমার নয়। বস্তুর যে প্রভাব তাকে বড় করে না দেখে প্রকৃত সত্যকে বড় করে দেখুন। প্রভাবকে বড় করে দেখে আপনি আসল জিনিসটিকে হারাচ্ছেন। আজই হৃদয়ে দৃঢ়চিত্ত হয়ে যান যে আপনি প্রভাবকে আর বড় করে দেখবেন না, সত্যকেই মেনে নেবেন। প্রভাব কখনো কখনো পড়ে, সবসময় পড়ে না। কিন্তু আপনারা একে স্থায়ী বলে মেনে নেন। এটি ভুল। বাস্তবে আপনি শরীর নন। বাল্যাবস্থায় আপনার দেহ যেমন ছিল আজ সেরকম নেই, কিন্তু আপনি যেমনকার তেমনই আছেন। এজন্য আপনি দয়া করে প্রভাবকে গুরুত্ব দেবেন না। **প্রকৃত কথার প্রভাব পড়া উচিত। মিথ্যা কথার প্রভাব যদি**

পড়ে তবে তাকে বড় করে দেখবেন না। যেটি সত্য কথা সেটি হলো আমরা শরীর নই, শরীর আমাদের নয়।

মুক্তি লাভ করতে, ভগবানের দিকে অগ্রসর হতে স্থূল, সূক্ষ্ম অথবা কারণ—কোন শরীরই কাজে আসে না। শরীর আত্মীয়-স্বজন, সমাজ এবং জগতের জন্য কাজে আসে। নিজেদের জন্য কাজে আসে না। এজন্য শরীরকে আত্মীয়-স্বজন, সমাজ এবং বিশ্বের সেবায় নিযুক্ত করুন। এই কথাটি খুবই মূল্যবান। এটি মেনে নিলে আপনারা চিরকালের জন্য সুখী হয়ে যাবেন। **শরীরের দ্বারা আমাদের লাভ হবে—এটি একেবারেই ভুল।**

স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ—কোন শরীরই আমাদের কাজে আসে না এই কথাটি বুঝে নিলে খুবই লাভ হয়। স্থূল শরীরের দ্বারা ক্রিয়া হয়, সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা চিন্তন হয় এবং কারণ শরীরের দ্বারা স্থিরতা এবং সমাধি হয়ে থাকে। ক্রিয়া, চিন্তন, স্থিরতা এবং সমাধি আপনাদের জন্য নয়। এগুলির ভরসায় থাকবেন না। সম্পূর্ণরূপে চিন্তাশূন্য হওয়া অর্থাৎ নিশ্চুপ অবস্থা দ্বারাই আমাদের মঙ্গল সাধিত হবে। গ্রন্থে সমাধির অনেক মহিমা কীর্তিত হয়েছে। কিন্তু সেটিও আপনাদের কাজে আসবে না। **ক্রিয়া, চিন্তন, স্থিরতা বা সমাধি কোনটিই আপনাদের কাজে আসবে না। এইভাবে প্রাণায়াম, কুণ্ডলিনী-জাগরণ, একাগ্রতা প্রভৃতি কোন কিছুই কাজের নয়।** এ সমস্তই প্রাকৃতিক জিনিস, অথচ আপনারা হলেন পরমাত্মার অংশ। এইগুলি আপনাদের স্ব-জাতির বস্তু নয়। আপনারা এই সবগুলি থেকে ভিন্ন। আপনাদের ঐক্য পরমাত্মার সঙ্গে। আপনারা অদ্বৈত, দ্বৈত, জ্ঞান, ভক্তি যাই মানুন না কেন, অন্তত এইটুকু তো মানুন যে শরীর আমাদের কাজের নয়, এগুলির সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই।

যদি সংসারের প্রভাব পড়েও যায় তার পরোয়া করবেন না, তাকে স্বীকার করবেন না। তাহলেই তা দূর হয়ে যাবে। প্রভাবকে গুরুত্ব দিয়ে

আপনারা বড় লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সেজন্য প্রভাব যদি পড়ে তো পড়তে দিন, কিন্তু মনে মনে বুঝুন যে সেটি সত্য নয়। মিথ্যা জিনিসের প্রভাব মিথ্যাই হবে, সত্য কী করে হবে? যে আপনাদের টাকা-পয়সা ঠকায়, তার কথা আপনাদের ভাল লেগেছিল, আপনারা তাতে মোহিত হয়ে ছিলেন—সেইজন্যই তো আপনারা প্রবঞ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে সংসারের প্রভাব পড়াও সম্পূর্ণ প্রবঞ্চনা, মূর্খতা।

একটি মহত্ত্বপূর্ণ কথা হলো যে প্রভাব শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির উপর পড়ে, আপনাদের উপর পড়ে না। বস্তু যে জাতির, প্রভাবও সেই জাতির উপরেই পড়ে, আপনাদের উপর পড়ে না, কেননা আপনাদের জাতি হলো আলাদা। শরীর-সংসার হলো জড়, আপনারা হলেন চেতন। জড়ের প্রভাব চেতনের উপর কেমন করে পড়বে ? জড়ের প্রভাব তো জড়ের (শরীরের) উপরেই পড়বে। এটি খাঁটি কথা। এটিকে যদি এখন মেনে নেন তাহলে কাজ এখনই হয়ে যাবে। চোখের জন্য দৃষ্টির উপর প্রভাব পড়ে। কানের জন্য শ্রবণের উপর প্রভাব পড়ে। তাৎপর্য হলো প্রভাব স্বজাতীয় জিনিসের উপর পড়ে। অতএব যত প্রভাবই পড়ুক না কেন তাকে আপনারা সত্য বলে মানবেন না। আপনাদের স্বরূপের উপর প্রভাব পড়ে না। স্বরূপ একেবারেই নির্লিপ্ত—**'অসঙ্গো হ্যায়ং পুরুষঃ'** (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৩।১৫)। মন-বুদ্ধির উপর প্রভাব যদি পড়ে তো পড়তে থাকুক। মন-বুদ্ধি আমাদের নয়। এগুলি সেই ধাতুর দ্বারাই সৃষ্ট এবং সমজাতীয় বস্তুর প্রভাবই এগুলির উপরে পড়ে।

প্রশ্ন—তাহলে স্বয়ং কেন সুখী ও দুঃখী হয় ?

উত্তর—মন-বুদ্ধিকে নিজের মনে করলেই স্বয়ং সুখী এবং দুঃখী হয়। মন-বুদ্ধি নিজস্ব নয়, সেগুলি হলো প্রকৃতির অংশ। আপনারা হলেন পরমাত্মার অংশ। মন ও বুদ্ধির উপর প্রভাব পড়লে আপনারা যদি সুখী বা দুঃখী হন তাহলে তা হলো ভুল। বাস্তবে আপনারা সুখী বা দুঃখী হন না, আপনারা যেমনকার তেমনই থাকেন। ভেবে দেখুন, যদি

আপনাদের উপর সুখ-দুঃখের প্রভাব পড়েই তাহলে আপনারা অপরিবর্তনশীল এবং একরূপ থাকবেন না। আসলে আপনাদের উপর প্রভাব পড়ে না কিন্তু আপনারা নিজেরাই সেটি নিজের উপর মেনে নেন। কেননা আপনারা মন ও বুদ্ধিকে নিজেদের বলে মেনে নিয়েছেন। এটি কখনই আপনাদের নয়। মন ও বুদ্ধি প্রকৃতির আর প্রকৃতির প্রভাব প্রকৃতির উপরেই পড়বে।

প্রশ্ন—প্রভাব পড়লে কর্মও যদি সেই রকম হয়ে যায় ?

উত্তর—কর্ম যদি হয়েই যায় তাতে আপনাদের মধ্যে কী পার্থক্য হলো ? আপনারা বিচার করে দেখলে দেখবেন যে আপনাদের উপর প্রভাব পড়েনি। কিন্তু মুশকিল হলো এই যে, আপনারা তার সঙ্গে মিশে যান। আপনারা মন ও বুদ্ধিকে নিজেদের স্বরূপ মনে করে বলেন যে আপনাদের উপর প্রভাব পড়েছে। মন এবং বুদ্ধি আপনাদের নয়, সেগুলি প্রকৃতির—**'মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানী কর্ষতি'** (গীতা ১৫।৭) এবং আপনারাও মন ও বুদ্ধির নন, আপনারা হলেন পরমাত্মার—**'মমৈবাংশো জীবলোকে'**(গীতা ১৫।৭)। এজন্য প্রভাব মন-বুদ্ধির উপর পড়ে, আপনাদের উপর পড়ে না। আপনারা তো যেমনকার তেমনই থেকে যান—**'সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ'** (গীতা ১৪।২৪)। প্রকৃতিতে স্থিত পুরুষই সুখ-দুঃখের ভোক্তা হয়ে থাকে—**'পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্'** (গীতা ১৩।২১)। মন-বুদ্ধির উপর প্রভাব যদি পড়ে তো পড়ুক, তাতে আপনার কী ? প্রভাবকে গুরুত্ব দেবেন না। তাকে নিজেদের বলে মানবেন না। আপনারা 'স্ব'-তে স্থিত—**'স্বস্থঃ'**। প্রভাব **'স্ব'**-তে পৌঁছায় না। অসৎ বস্তু সৎ-এ কী করে পৌঁছাবে? এবং সৎ বস্তু অসতে কী করে পৌঁছাবে ? সৎ তো নির্লিপ্ত থাকে।

মন-বুদ্ধি আপনাদেরই হোক আর কুকুরেরই হোক তার সঙ্গে আপনাদের কোন সম্পর্ক নেই। কুকুরের মন-বুদ্ধির উপর প্রভাব পড়ে

তাতে কি আপনারা সুখী বা দুঃখী হন ? কুকুরের মন-বুদ্ধি যেমন আপনাদের নয় তেমনই আপনাদের মন-বুদ্ধিও বাস্তবে আপনাদের নয়। মন-বুদ্ধিকে নিজেদের মনে করাই প্রধান ভুল। মন-বুদ্ধিকে নিজেদের মনে করে আপনারা মিছামিছি দুঃখ পান।

একটি মহত্ত্বপূর্ণ কথা হলো, আমাদের আর পরমাত্মার মাঝখানে জড়তার (শরীর-সংসারের) পর্দা নেই, বরং জড়তার সম্বন্ধের পর্দা আছে। এই কথা পাঠ্যপুস্তকে, বেদান্তের পুস্তকে আমি পাইনি। কেবল একস্থানে সাধুদের কাছ থেকে পেয়েছি। এজন্য শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির সঙ্গে আমাদের একেবারেই সম্বন্ধ নেই—একথা যদি মেনে নেন তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবেন।

প্রশ্ন—জড়তার সম্বন্ধ দূর করতে হলে কী অভ্যাস করতে হবে ?

উত্তর—জড়তার সম্বন্ধ কোন অভ্যাসের দ্বারা দূর করা যায় না, বিবেক-বিচারের ফলে তা দূর হয়। এটি অভ্যাসের দ্বারা হওয়ার জিনিস নয়। যদি বিবেককে সম্মান করেন তাহলে এই সম্বন্ধ আজই দূর হয়ে যেতে পারে। আপনারা দুটি কথা স্বীকার করে নিন— জানা এবং মানা। জড়ের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ নেই এটি হলো 'জানা' আর আমাদের সম্বন্ধ ভগবানের সঙ্গে এটি হলো 'মানা'। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সামান্যতম বস্তুও আমাদের নয়—এটি জেনে নিলে জড়তার প্রভাব পড়বে না। এতে কোন প্রয়াস কাজ করে না, কিন্তু বিবেকের দ্বারা তৎক্ষণাৎ কাজ হয়ে যায়। আপনাদের উপর প্রভাব পড়ে না—আপনারা যেমনকার তেমনই থেকে যান। বাস্তবে মুক্তি স্বত স্বাভাবিক। **বস্তুত মুক্তি হয় না, মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ**। যা হয় তা চলে যায় আর যা আছে তা কখনো চলে যায় না—

'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'। (গীতা ২।১৬)

'অসত্যের সত্তা বিদ্যমান নয় এবং সতের অবিদ্যমানতা বিদ্যমান নয়।'

আপনারা প্রভাবকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন, কিন্তু সেটি অ-সৎ এবং মিথ্যা। মন-বুদ্ধির সঙ্গে আপনাদের সম্বন্ধই নেই। শ্রীশরণানন্দজী মহারাজকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে কুণ্ডলিনী কী ? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে **'কুণ্ডলিনী যে কী তা তো আমি জানি না। তবে এটি অবশ্যই জানি যে কুণ্ডলিনীর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই।** কুণ্ডলিনী ঘুমিয়েই থাকুক আর জেগেই থাকুক তাতে আমার কী ?' তেমনই শরীর সংসারের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ-ই নেই। অতএব তার প্রভাবকে গুরুত্ব দিও না। এটি অভ্যাস করলে হবে না। অভ্যাস একটি নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। যেমন, দড়ির ওপর যদি চলতে চাও তাহলে তার জন্য অভ্যাস করতে হবে। অভ্যাসের দ্বারা কোন লাভ হবে না। **অভ্যাসের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান কখনো হয়নি, হবে না, হতে পারে না।** বিবেককে যদি শ্রদ্ধা করেন তাহলে এখনই সন্তোষ লাভ হবে।

কেবল এইটুকু কথা মনে রাখবেন যে জড় বস্তুর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই। কেননা সেটি হলো প্রকৃতির অংশ এবং আমরা হলাম পরমাত্মার অংশ। **যে বস্তু উৎপন্ন এবং বিনষ্ট হয় তার প্রভাব আমাদের উপর কেমন করে পড়তে পারে ? সেই প্রভাব আপনাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছায় না।** স্থিরতা এবং সমাধিও আপনাদের নয়, তা হলো কারণ-শরীরের। আপনারা কারণ-শরীর থেকেও পৃথক। সমাধিতে দুটি অবস্থা হয়ে থাকে—সমাধি এবং ব্যুত্থান। আপনাদের মধ্যে দুটি অবস্থা হয় না। আপনাদের সহজাবস্থা আছে—এটি স্বতঃস্বাভাবিক। আপনাদের স্বরূপ সত্তামাত্র।

সার কথা হলো এই যে জড় এবং চেতন কখনো মিলিত হয় না, মিলিত হতে পারে না। জড়-চেতনের সম্বন্ধ হলো মিথ্যা। যেমন অমাবস্যার রাত্রির সঙ্গে সূর্যের পরিণয় হতে পারে না, তেমনই জড়ের চেতনের সঙ্গে সম্বন্ধ হতে পারে না।

প্রশ্ন—জড়-চেতনের সম্বন্ধ যদি মিথ্যা হয় তাহলে তাকে ছাড়তে কষ্ট কেন ?

উত্তর—জড়-চেতনের সম্বন্ধ মিথ্যা হলেও তাকে ছাড়তে কষ্ট এইজন্যই হয় যে আপনারা জড়-চেতনের সম্বন্ধকে গুরুত্ব দিয়ে রেখেছেন। **অতএব আজই আপনারা নিজেদের বিবেককে গুরুত্ব দিয়ে অন্তরের সঙ্গে এটি স্বীকার করে নিন যে জড় (**শরীর-সংসার**)** এর সঙ্গে **আপনাদের কোন সম্বন্ধ নেই। আপনাদের সম্বন্ধ হলো** পরমাত্মার সঙ্গে।

শরীরকে নিয়ে মানুষের (ভোগের) কামনার ইচ্ছা হয়। স্বরূপকে নিয়ে তত্ত্বের ইচ্ছা (জিজ্ঞাসা) হয় এবং পরমাত্মাকে নিয়ে প্রেমের ইচ্ছা (অভিলাষ) হয়। শরীর নিজেদের নয়, সেজন্য ভোগের ইচ্ছাও নিজস্ব নয়। তা ভুল থেকে উৎপন্ন হয়। কিন্তু তত্ত্বের এবং প্রেমের ইচ্ছা নিজস্ব। তা ভুল থেকে উৎপন্ন নয়। এজন্য শরীরকে নিষ্কামভাবে অপরের সেবায় নিয়োজিত করলে অথবা তত্ত্বের জিজ্ঞাসা প্রবল হলে ভুল দূর হয়ে যায়। ভুল দূর হলে ভোগের কামনাও দূর হয়ে যায় এবং তত্ত্বের জিজ্ঞাসা পূর্ণ হয়ে যায়। অর্থাৎ মানুষের তত্ত্বজ্ঞান হয়ে যায়, জীবন্মুক্তি হয়ে যায়। তখন স্বরূপ যার অংশ সেই পরমাত্মার প্রেমের অভিলাষ জাগ্রত হয়। সকল জীব পরমাত্মার অংশ। এজন্য **প্রেমের অভিলাষ হলো সকল জীবের অন্তিম তথা সার্বভৌম ইচ্ছা**। মুক্তি তো সাধন, কিন্তু প্রেম হলো সাধ্য। যেমন সূর্য-কিরণের দ্বারা সমুদ্র থেকে জল উত্থিত হলেও ততক্ষণ পর্যন্ত তার যাত্রা পূর্ণ হয় না যতক্ষণ না সে সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হচ্ছে। তেমনই **পরমাত্মার অংশ জীবাত্মার যতক্ষণ না পরম প্রেম প্রাপ্ত হচ্ছে ততক্ষণ তার যাত্রা পূর্ণ হয় না**। পরম প্রেম উদিত হলে মনুষ্য-জীবন পূর্ণ হয়ে যায়। তখন আর কিছু বাকি থাকে না।

~~O~~

কল্যাণের তিনটি সহজ পন্থা

ভগবান বলেছেন—

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২০।৬)

'যারা নিজ কল্যাণ চায় সেইসব মানুষদের জন্য আমি তিনটি যোগের কথা বলেছি—জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগ। এই তিনটি ছাড়া কল্যাণের আর কোন পথ নেই।'

প্রত্যেক ব্যক্তিই হলো আসলে সাধক। কারণ চুরাশি লক্ষ প্রজাতিতে পরিভ্রমণ করে জীব কেবলমাত্র নিজের কল্যাণের জন্যই এই মনুষ্যদেহ লাভ করেছে। **কোন বিশেষ আকৃতির নাম মানুষ নয়, বরং মানুষ তাকেই বলা হয়, যার মধ্যে সৎ-অসৎ এবং কর্তব্য-অকর্তব্যের বিবেকবোধ থাকে।** এই বিবেক অনাদি এবং ঈশ্বরপ্রদত্ত। এই বিবেককে গুরুত্ব দিয়েই মানুষ জ্ঞানযোগী, কর্মযোগী অথবা ভক্তিযোগী হয়ে উঠতে পারে এবং সহজেই নিজের কল্যাণ করতে পারে। যা প্রাপ্ত হয় এবং পরিত্যক্ত হয় সেই শরীরের নাম মানুষ নয়। **শরীর তো শুধুমাত্র একটি কর্মোপকরণ, যার একমাত্র কার্যকারিতা হলো অপরের সেবা করা।** কিন্তু মানুষ যেগুলি পেয়েছে এবং যা তাকে ছেড়ে চলে যাবে সেগুলিকে (অর্থাৎ শরীর, বস্তু, যোগ্যতা, সামর্থ্য ইত্যাদিকে) সে যখন নিজের এবং নিজের জন্য বলে মনে করে, তখন সে আর কোনপ্রকার যোগী থাকে না, তখন সে ভোগী হয়ে যায়। ভোগী ব্যক্তি নিজেও দুঃখ পায় এবং অপরকেও দুঃখ দেয়, কারণ **দুঃখী ব্যক্তিই অপরকে দুঃখ দেয়—এ হলো সিদ্ধান্ত।**

নিজের কল্যাণের জন্যই মনুষ্যশরীর লাভ হয়েছে, তাই কোন

ব্যক্তিরই নিজ কল্যাণ সম্বন্ধে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। **প্রত্যেক মানুষেরই ঈশ্বর-লাভ করা হলো জন্মসিদ্ধ অধিকার।** সাধক হওয়ার ফলে মানুষ-মাত্রেই স্বীয় সাধ্যকে প্রাপ্ত করতে স্বাধীন এবং সমর্থ। মানুষের প্রথমেই প্রয়োজন হলো নিজের উদ্দেশ্য জেনে নিয়ে স্বীকার করা যে আমি সংসারী নই, প্রকৃতপক্ষে আমি একজন সাধক। আমি নারী, আমি পুরুষ, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি বৈশ্য, আমি শূদ্র, আমি অন্ত্যজ, আমি ব্রহ্মচারী, আমি গৃহস্থ, আমি বানপ্রস্থী, আমি সন্ন্যাসী ইত্যাদির মান্যতা সাংসারিক ব্যবহার বা মর্যাদার পক্ষে সঠিক হলেও পরমাত্মাপ্রাপ্তির পথে বাধাস্বরূপ। **এই মেনে নেওয়ার ব্যাপার শরীরকেন্দ্রিক। কিন্তু পরমাত্মাপ্রাপ্তি শরীরের হয় না, তা হয় সাধকের। সাধক শরীরকেন্দ্রিক নন, তিনি অশরীরী।** মানুষ যখন নিজেকে সাধক বলে স্বীকার করে নেয়, তখন তার অসাধন স্বতঃই পরিত্যক্ত হতে থাকে। এই নশ্বর শরীর, বস্তু, যোগ্যতা, সামর্থ্য ইত্যাদিকে নিজের এবং নিজের জন্য বলে মনে করাই হলো অসাধন। প্রত্যেক সাধকেরই উচিত এই অসাধন দূর করা।

জগৎ, জীব এবং পরমাত্মা—এই তিনটি ছাড়া আর কিছুই নেই। গীতায় এই তিনটিকে বিভিন্ন নামে বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন— পরা, অপরা এবং ভগবান; ক্ষর, অক্ষর এবং পুরুষোত্তম প্রভৃতি। এই তিনটির মধ্যে জগৎ এবং জীব—এই দুটি চিন্তা-ভাবনার বিষয় হওয়ায় হলো 'লৌকিক'[১]। কিন্তু পরমাত্মা চিন্তা-ভাবনার বিষয় না হওয়ায় হলো অলৌকিক[২]। এই তিনটির মধ্যে জীবকে নিয়ে জ্ঞানযোগ, জগৎকে নিয়ে কর্মযোগ এবং পরমাত্মাকে নিয়ে ভক্তিযোগ হয়ে থাকে।

---

[১]দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ (গীতা ১৫।১৬)

[২]উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ (গীতা ১৫।১৭)

এইজন্য জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ—এই দুটি হলো 'লৌকিক সাধন'[১] আর ভক্তিযোগ হলো 'অলৌকিক সাধন'। লৌকিক সাধনের সাহায্যে মুক্তিলাভ হয় এবং অলৌকিক সাধনের দ্বারা পরমপ্রেম প্রাপ্তি হয়।

মনুষ্যমাত্রেরই অন্তরে বীজরূপে প্রথমত মুক্তির (অখণ্ড আনন্দের) আকাঙ্ক্ষা, দ্বিতীয়ত দুঃখ নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা এবং তৃতীয়ত পরমপ্রেমের আকাঙ্ক্ষা থাকে। **মুক্তির আকাঙ্ক্ষা (স্ব-স্বরূপকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা) জ্ঞানযোগের দ্বারা, দুঃখ নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা কর্মযোগের দ্বারা এবং পরমপ্রেমের আকাঙ্ক্ষা ভক্তিযোগের সাহায্যে পূর্ণ হয়।** সাধকের মধ্যে নিজ সাধনের আগ্রহ, পক্ষপাতিত্ব না থাকলে এক আকাঙ্ক্ষার পূর্তিতেই তিনটি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়ে যায়।

জ্ঞানযোগের পথ

প্রত্যেক মানুষই 'আমি আছি'—এইভাবে নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করে থাকে। এই অস্তিত্বে অহং ('আমি') মিশে থাকার জন্যই 'আছি' রূপে নিজের ব্যষ্টি-সত্তা অনুভূত হয়। অহং যদি না থাকে তাহলে 'আছে' রূপে সমষ্টি-সত্তা অনুভূত হবে। এই সমষ্টি-সত্তাই হলো মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। **সেই সমষ্টি-সত্তায় অহং (জড়ত্ব) থাকে না।** অহংকে স্বীকার করলেই মানুষ আবদ্ধ হয় আর যখন সমষ্টি-সত্তাকে ('আছে' বলে) স্বীকার করে নেয়, তখন সে মুক্ত হয়ে যায়।

জগৎ সংসারের স্বরূপ হলো ক্রিয়া ও পদার্থ। ক্রিয়া এবং পদার্থ—এই দুই-ই হলো আদি-অন্তসম্পন্ন (অনিত্য)। প্রতিটি ক্রিয়ার আদি ও অন্ত থাকে। প্রতিটি পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়। জড়বস্তুমাত্রই প্রাপ্ত ও পরিত্যক্ত হয়ে থাকে। যা প্রাপ্ত হয় এবং পরিত্যক্ত হয়ে যায়, তাকে শুধুমাত্র জগৎ-সংসারের কাজেই ব্যবহার করা যেতে পারে। নিজের

---

[১]লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্॥ (গীতা ৩।৩)

জন্য তার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা এই **প্রাপ্ত ও পরিত্যক্ত হতে থাকা বস্তু কখনো নিজের হয় না—এই হলো সিদ্ধান্ত**। যে বস্তু নিজের নয়, তা নিজের জন্যও হতে পারে না। নিজের বস্তু সেটিই হতে পারে, যার ওপর আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার থাকে এবং সেই বস্তুই নিজের জন্য হতে পারে যেটিকে পেলে আর কিছু পাওয়ার বাকি না থাকে । কিন্তু আমরা সকলেই অনুভব করতে পারি যে শরীরাদি প্রাপ্ত বস্তুর ওপর আমাদের নিজস্ব কোন অধিকার খাটে না। আমরা নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী তা প্রাপ্ত করতে সক্ষম নই, রাখতে সক্ষম নই, তাকে সৃষ্টি করতেও পারি না, পরিবর্তন করতেও পারি না। এটি প্রাপ্ত করার পর আরও পাবার কামনা থেকে যায় অর্থাৎ অভাব বিদ্যমান থাকে। এই অভাবের কখনো পূরণ হয় না। তাই সাধকের উচিত এই সত্যকে মেনে নেওয়া যে— প্রাপ্ত এবং পরিত্যক্ত হয়ে যায় যেসব বস্তু, সেগুলি আমার এবং আমার জন্য নয়।

যা প্রাপ্ত হয় এবং পরিত্যাগ করে যায় সেই বস্তুসমূহকে নিজের এবং নিজের বলে না মানলে মানুষ নির্মম (নিরাসক্ত) হয়ে যায়। অনাসক্ত হলেই তার দ্বারা অতি সহজেই প্রাপ্তবস্তু সমূহের সদ্ব্যবহার হয়। কারণ মমত্ব-বোধ ত্যাগ না করলে প্রাপ্ত বস্তুসমূহের সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। মমত্ব-বোধসম্পন্ন মানুষ প্রাপ্ত বস্তুসমূহের সঠিক ব্যবহার করে না। **ভোগ এবং সংগ্রহ করাই হলো প্রাপ্ত বস্তুসমূহের অপব্যবহার। সেইসব প্রাপ্তবস্তু অন্যের জন্য ব্যবহার করাই হলো সঠিক বা সদ্ব্যবহার**। প্রাপ্ত বস্তুর দুরুপযোগের ফলেই সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং সদুপযোগের ফলে সমাজে শান্তি স্থাপিত হয়।

প্রাপ্ত ও পরিত্যক্ত হতে থাকা বস্তুসমূহকে নিজের এবং নিজের বলে মনে করাই হলো মানুষের ভুল। স্ব-স্বরূপ চেতন ও অবিনাশী, অতএব জড় ও বিনাশশীল বস্তু নিজের ও নিজের জন্য কেমন করে হয় ? এই ভুল স্বত এবং স্বাভাবিক নয়, এটি মানুষের দ্বারাই সৃষ্ট (কৃত্রিম)। নিজের

বিবেককে গুরুত্ব না দিলেই এই ভুল উৎপন্ন হয়। এই একটি ভুল থেকেই নানাপ্রকার ভুল উৎপন্ন হয়। তাই মূল ভুলটি দূর করা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং তা দূর করার দায়িত্ব মানুষেরই। এটি দূর করার জন্য ভগবান মানুষকে বিচার-বিবেচনা করার ক্ষমতা দিয়েছেন। মানুষ যখন নিজের বিবেককে গুরুত্ব দিয়ে এই ভুল দূর করে, তখন সে মমত্ব পরিত্যাগ করে।

প্রত্যেক সাধকেরই মমত্ব দূর করা অত্যন্ত প্রয়োজন ; কেননা মমত্ব ত্যাগ না করলে তিনি সাধনপথে অগ্রসর হতে পারেন না। শুধু তাই নয়, **যার ওপর মমতা থাকে তাও অশুদ্ধ হয়ে যায় এবং সেটি তার উন্নতির পথেও বাধা সৃষ্টি করে**। মমতার জন্য মানুষের মধ্যে নানাপ্রকার দোষ জন্মায়।

কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে মমতা না থাকলে আমাদের জীবন নির্বাহ হবে কীভাবে ? আমরা পরিবার-পরিজন বা সমাজের সেবা করব কীভাবে ? আসলে **মমতা থাকলেই শরীর, সমাজ, পরিবার-পরিজন ইত্যাদির সেবাতে প্রতিবন্ধকতা আসে**। মমত্ব-রহিত ব্যক্তিরই শরীর-নির্বাহ অত্যন্ত সুচারুভাবে হয়। মমত্বহীন ব্যক্তিই পরিবার-পরিজন ও সমাজ ইত্যাদির সেবা ভালোভাবে করতে পারেন। যে নিজের শরীরের প্রতি মমতা সম্পন্ন হয়, সে কখনো অন্যের সেবা করতে পারে না। যার নিজ সমাজের ওপর মমতা থাকে, সে দেশের সেবা করতে সক্ষম হয় না। যার নিজের দেশের ওপর মমতা থাকে, সে বিশ্বের সেবা করতে অপারগ। অর্থাৎ মমতা থাকলে মানুষের ভাব সংকুচিত এবং পরিচ্ছিন্ন হয়ে ওঠে। সে ক্রমশ সেবা পরাঙ্মুখ হয়ে স্বার্থপর হয়ে ওঠে। তাই প্রত্যেক সাধকেরই মমত্ব-বোধ ত্যাগ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। সাধকের যখন মমত্ব-ত্যাগের তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয়, তখনই মমত্ব-ত্যাগ করা সহজ হয়। কেননা সাধক যখন অন্তর থেকে জগৎ-সংসারে বিমুখ হয়ে পরমাত্মার শরণ গ্রহণ করেন, তখন সমস্ত জগৎ এবং স্বয়ং পরমাত্মাও তাঁকে সাহায্য করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। তাই সাধকের কখনো নিজ উদ্দেশ্য

পূরণের জন্য হতাশ হওয়া উচিত নয়। তিনি অতি কম সময়ে এবং স্বল্প **সামর্থ্যের দ্বারাও নিজ উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া সক্ষম**। কারণ ভগবান এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই তাঁর অহৈতুকী কৃপায় এই মানবশরীর দিয়েছেন—

কবহুঁক করি করুনা নর দেহী।
দেত ঈস বিনু হেতু সনেহী॥

(শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৪৪।৩)

মমত্বের জন্যই কামনার উৎপত্তি হয়। যেমন শরীরের প্রতি মমত্ব-বোধ জন্মালে শরীরের প্রয়োজনীয়তা আমাদের নিজের প্রয়োজনীয়তা হয়ে উঠবে অর্থাৎ অন্ন, জল, খাদ্য, গৃহ ইত্যাদির নানাপ্রকার কামনা উৎপন্ন হবে। মমত্ব-বোধ পরিত্যাগ করলেই সাধকের মধ্যে কামনা-ত্যাগের ক্ষমতা আসে। কারণ শরীর ও জগৎ একই ধাতু থেকে উৎপন্ন। শরীরকে জগৎ থেকে আলাদা করা যায় না। সুতরাং শরীরের মমত্ব-বোধ দূর হলেই জাগতিক কামনাগুলিরও নাশ হয়।

যা প্রাপ্ত হয়েছে এবং ছেড়ে চলে যাবে এমন বস্তুগুলিতে 'আমি' এবং 'আমার'-ভাব থাকার জন্যই কামনার উৎপত্তি হয়। আজ পর্যন্ত কারোরই সমস্ত কামনা পূরণ হয়নি, হবে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়। যেসব কামনার পূরণ হয়, সেগুলিও পরিণামে দুঃখই প্রদান করে। কেননা একটি কামনা পূরণ হতে না হতেই অন্য নানা কামনা উৎপন্ন হয়, যার ফলে কামনা পূরণ না হওয়ার দুঃখ যেমন তেমনই থেকে যায়। মানুষ মনে করে যে কামনা পূরণ হলে সে স্বাধীন হয়ে যাবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সেই কাম্য পদার্থের অধীন হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রমাদবশত সে সেই পরাধীনতাতেই সুখ অনুভব করে। মানুষকে এই পরাধীন অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্যই ভগবানের মঙ্গলময় বিধানে দুঃখ এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু মানুষ সেই দুঃখে দুঃখিত হয়ে ভগবানের মঙ্গলময় বিধানকেও অবহেলা করে। যদি সে সেই দুঃখে দুঃখিত না হয়ে দুঃখের কারণ

অনুসন্ধান করে এবং সকল দুঃখের কারণ যে কামনা তাকে দূর করে, তাহলে সে চিরকালের মতো সুখী হতে পারে।

প্রত্যেক সাধকেরই নিষ্কাম হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন ; কারণ নিষ্কাম না হলে সাধক তাঁর কর্তব্য ঠিকমতো পালন করতে পারেন না। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর কামনার জন্য সাধ্যরূপ ভগবানকেও কামনাপূরণের মাধ্যম করে তোলেন। অর্থাৎ কেউ যদি কামনা নিয়ে ভগবানের সাধন ভজন করেন তাহলে তাঁর সাধ্য হয় তাঁর কাম্য পদার্থ আর তাঁর প্রাপ্তির মাধ্যম হয়ে ওঠেন ভগবান। যতক্ষণ কামনা থাকে, ততক্ষণ মানুষ পরাধীন থাকে। পরাধীন ব্যক্তি ত্যাগ করতে পারে না, সেবা করতে পারে না এবং প্রেমও করতে পারে না। সে জ্ঞানযোগী, কর্মযোগী বা ভক্তিযোগী—কোনটিই হতে সক্ষম হয় না। সুতরাং এই **পরাধীনতা দূর করার জন্য নিষ্কাম হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন**।

সব মানুষই কামনা পূর্তিতে পরাধীন, কিন্তু সকল ব্যক্তিই কামনা পরিত্যাগ করতে সক্ষম ও স্বাধীন। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাধীনভাবে স্বাধীনতা (মুক্তি) লাভ করতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ তার মধ্যে কামনা থাকে, ততক্ষণ সে স্বাধীন হতে পারে না। যদি মানুষ নিষ্কাম হতে পারে তাহলে পরাধীনতা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়। **নিষ্কাম হলে সাধক জগতের উপর বিজয়-লাভ করতে সক্ষম হন**। কেননা কামনাগ্রস্ত মানুষকে বহুজনের অধীন হতে হয়, কিন্তু যার কোন কামনা নেই, তাকে কারো অধীনতা স্বীকার করতে হয় না। জগতের চেয়েও তাঁর মূল্য বেশি হয়ে থাকে। তিনি তিন যোগেরই অধিকারী হয়ে ওঠেন। শুধু তাই নয়, তিনি ভগবৎপ্রেমের পাত্র হয়ে ওঠেন ; কেননা কামনাগ্রস্ত ব্যক্তি কাউকেই ভালোবাসতে পারেন না।

কর্তা যখন নিষ্কাম হন, তখন তাঁর দ্বারা কর্তব্য-কর্ম স্বতঃই পালন হতে থাকে। **কর্তা নিষ্কাম না হলে কর্তব্যকর্ম ঠিকভাবে পালিত হয় না এবং কর্তব্যকর্ম ঠিকভাবে পালিত না হলে প্রাপ্ত পরিস্থিতির সুব্যবহার**

হয় না। কামনাযুক্ত ব্যক্তি প্রায়শঃ প্রাপ্ত পরিস্থিতির অধীন হয় এবং অপ্রাপ্ত পরিস্থিতির কথা চিন্তা করতে থাকে। কিন্তু মানুষ নিষ্কাম হলেই প্রাপ্ত পরিস্থিতির অধীনতা এবং অপ্রাপ্ত পরিস্থিতির চিন্তা থেকে মুক্তি পেয়ে পরিস্থিতির অতীত তত্ত্ব লাভ করে।

জপ, তপ, ব্রত, তীর্থ, স্বাধ্যায় ইত্যাদি ক্রিয়াসাধ্য সাধনার দ্বারা কামনা নাশ হয় না। কারণ যে কোন ক্রিয়ার (অভ্যাসের) জন্যই শরীরের সহায়তা প্রয়োজন এবং শরীরের সম্বন্ধ থেকেই কামনাগুলির উৎপত্তি হয়। সুতরাং **কোন ক্রিয়ার সাহায্যে কামনার বিনাশ হয় না বরং সর্বতোভাবে ক্রিয়ারহিত হলে এবং বিচার-বিবেচনাকে গুরুত্ব দিলেই তা সম্ভব**। ক্রিয়ারহিত হলেই শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ-ছেদ হয়ে স্বতঃই স্বরূপে স্থিতিলাভ হয়। স্বরূপে মমত্বরহিতভাব এবং নিষ্কামভাব স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং শরীর ও জগৎ-সংসারের সম্পর্ক থেকে উৎপন্ন মমতা, কামনা ইত্যাদি দোষগুলিকে বিনাশ করার জন্য ক্রিয়া এবং পদার্থ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা অতি প্রয়োজন।

সাধক যখন মমত্বহীন এবং নিষ্কাম হয়ে ওঠেন তখন তাঁর অহং-ভাব দূর হয়। অহং ভাব দূর হলে তাঁর আর কিছু করা বাকী থাকে না— **'নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি'** (গীতা ২।৭১)। সাধক যতক্ষণ নিজের জন্য কিছু করেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর ক্রিয়া ও পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকে। ক্রিয়া ও পদার্থের সঙ্গে যতক্ষণ সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ পরাধীনতাও থাকে। জগৎ-সংসারের সেবার জন্য ক্রিয়া ও পদার্থের প্রয়োজন থাকলেও এগুলির ত্যাগই তাঁর পক্ষে উপযোগী হয়ে থাকে। **সেবা এবং ত্যাগ কৃত্রিম নয়, তা স্বত এবং স্বাভাবিক**। তাই আমি সেবা করছি অথবা আমি ত্যাগ করছি, এরূপ অহংকার করা ভুল। জগতের কোন বস্তুই যখন আমার নয় তখন ত্যাগ কীসের ? আর যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিলে সেবা করা হয় কী করে ? সিদ্ধান্ত হলো যে, যা কখনো-না-কখনো পরিত্যক্ত হয়, তা

এখনই পরিত্যক্ত, আর যা কখনো পাবার সম্ভাবনা থাকে, তা এখনই প্রাপ্ত করা হয়েছে। তাই **নিত্য-নিবৃত্ত বস্তুরই নিবৃত্তি হয় এবং নিত্যপ্রাপ্তেরই প্রাপ্তি ঘটে**—সাধকের এই সত্য স্বীকার করা প্রয়োজন।

সাধকের যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের জন্য কিছু করার আগ্রহ থাকে, ততক্ষণ তার কর্ম-সামগ্রী অর্থাৎ দেহ-মন-ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকে। যতক্ষণ শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে ততক্ষণ মানুষের মধ্যে নিঃস্বার্থভাবও আসে না এবং স্বাধীনতাও আসে না অর্থাৎ সে কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ—কোনটিরই অধিকারী হতে পারে না। যে ব্যক্তি স্বার্থপরতা ও পরাধীনতা থেকে মুক্ত নয়, সে কী করে ভগবদ্‌প্রেমী হবে ? তাই **ক্রিয়ার আশ্রয় ছেড়ে 'কিছু না করা'কে গ্রহণ করা এবং পদার্থের আশ্রয় ছেড়ে স্বাশ্রয় অথবা ভগবদ্ আশ্রয়কে গ্রহণ করা প্রত্যেক সাধকের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন**।

কোন ক্রিয়ার দ্বারা বিচার-বিবেচনার জাগৃতি হয় না, ক্রিয়ারহিত হলেই তা সম্ভব। বিচার-বুদ্ধিকে গুরুত্ব দিলে এই বিবেকই তত্ত্বজ্ঞানে পরিণত হয় ; অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান কোন ক্রিয়া বা পদার্থের দ্বারা হয় না, তা সম্ভব হয় নিজের দ্বারাই। **যা নিজের দ্বারা লাভ হয়, তার জন্য কোন অভ্যাসের প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতপক্ষে অভ্যাসে সেটিতে ব্যবধান সৃষ্টি করা হয়**। মানুষ যে সব উপাদানের (মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির) সাহায্যে জগৎ-সংসার দেখে, তার দ্বারা নিজেকে (উপাদান রহিত অস্তিত্বে, স্বস্বরূপকে) দেখা সম্ভব নয়। নিজেকে নিজের দ্বারাই দেখা সম্ভব—**'যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি'** (গীতা ৬।২০)। অর্থাৎ নিজেকে কোন উপাদানের সাহায্যে দেখা সম্ভব নয়, বরং উপাদানগুলির আশ্রয় ত্যাগ করলেই দেখা সম্ভব।

কর্মযোগের পথ

সাধক যখন নিজ জীবন হতে মন্দ ব্যাপারগুলি পরিত্যাগ করেন, তখন কর্মযোগে সিদ্ধিলাভ হয়। তিন ভাবে মন্দ ব্যাপার ত্যাগ হয়—

(১) কারো ক্ষতি না করা, (২) কাউকে খারাপ বলে মনে না করা এবং (৩) কারো ক্ষতি হোক তা না চাওয়া। মন্দ-ভাব ত্যাগ না করলে কর্তব্য-পরায়ণ হওয়া সম্ভব নয়।

মানুষ তখনই অন্যের ক্ষতি করে যখন সে স্বার্থপরবশ হয়ে নিজে খারাপ হয়। **নিজে খারাপ না হলে মানুষ কারো ক্ষতি করতে সক্ষম হয় না**। কারণ কর্তা যেমন, তার কর্মও তেমনই হয়ে থাকে, এই হলো সিদ্ধান্ত। কর্ম কর্তার অধীন। তাই মানুষের সব থেকে আগে প্রয়োজন নিজেকে সাধক বলে স্বীকার করা। যখন সাধক কর্তা হয় তখন তাঁর দ্বারা আর কোন বিপরীত কর্ম হওয়া সম্ভব নয়। শুধু তাই নয় তাঁর যে ক্ষতি করে, সাধক তার কোন ক্ষতি তো করেনই না বরং তিনি তাকে মার্জনা করেন। খারাপ ব্যবহারের পরিবর্তে খারাপ কাজ করলে তা বৃদ্ধি পায়, তার নিবৃত্তি হবে কেমন করে ? খারাপ কাজের পরিবর্তে ভালো ব্যবহার করলেই খারাপ কাজের নিবৃত্তি হতে পারে।

কোন ব্যক্তিই সম্পূর্ণভাবে মন্দ হতে পারে না এবং সকলের কাছেই সে খারাপ হতে পারে না। **মানুষ সম্পূর্ণ ভালো হতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ খারাপ কখনো হয় না**। কেননা খারাপ ব্যাপার হলো কৃত্রিম, আগন্তুক ও অস্বাভাবিক। খারাপের পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই। সেজন্য খারাপের পুনরাবৃত্তি না হলে তা সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হয়ে যায়। সাধকের প্রধান কাজ হলো মন্দ ব্যাপার পুনরায় না করা। মানুষ যদি মন্দ কাজ দ্বিতীয়বার না করে তাহলে সে ভালো হয়ে যায়।

কাউকে খারাপ ভাবার কোনও অধিকার মানুষের নেই। অপরের খারাপ ব্যবহার যা দেখা যায়, সেগুলি স্বরূপত তার নয়, সেগুলি আগন্তুক। মানুষের স্বভাব হলো সে নিজের দোষ ক্ষমা করে কিন্তু অন্যের দোষ দেখলে তার ন্যায়-অন্যায়বোধ জেগে ওঠে। **সাধকের কর্তব্য হলো তিনি যেন নিজের ব্যাপারে ন্যায়-নীতি মেনে চলেন আর অন্যকে ক্ষমা করে দেন**। ভগবানের অংশ হওয়ায় মানুষ মাত্রেই স্বরূপত নির্দোষ—

'ঈশ্বর অংস জীব অবিনাসী। চেতন অমল সহজ সুখরাসী॥'

(শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ১১৭।২)

তাই কোন ব্যক্তির উপরই মন্দভাব পোষণ করা উচিত নয়। আগত মন্দের জন্য কাউকে মন্দ মনে করা অনুচিত কাজ। অপর ব্যক্তি খারাপ হোক বা না হোক তাকে খারাপ ভাবলে নিজের মধ্যেই খারাপভাব এসে পড়ে। অপরকে খারাপ বলে মনে হলে নিজের মধ্যেও খারাপ ভাবের উদয় হয়, ক্রোধের উদয় হয়, শত্রুতার উন্মেষ ঘটে, বৈষম্য জন্মায়, পক্ষপাত দেখা দেয়। এগুলির উদয় হলে কর্ম অশুদ্ধ হয়ে যায়। তাই মন্দের স্থাপনা নিজের মধ্যেও করতে নেই এবং অন্যের ওপরও করতে নেই। এতে নিজেরও হিত হয় না, অপরেরও হয় না। **কাউকে মন্দ বলে মনে করা অথবা কারো ক্ষতি করতে চাওয়া, প্রকৃতপক্ষে ক্ষতি করার থেকেও দূষণীয়।**

মানুষ কারো ক্ষতি করতে চাইলে তার ক্ষতি হয় না, কিন্তু যে ক্ষতি করে তার অবশ্যই ক্ষতি হয়। যারা অন্যের ক্ষতি চায় তাদের নিজেদের ক্ষতিই সবথেকে বেশি হয়; কেননা ক্ষতি করার মনোবৃত্তি থেকে তাদের মধ্যে মন্দ ভাব আসে। কর্মের থেকে ভাব সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক। তাই অন্যের ক্ষতি করতে চাওয়ার মধ্যে তার নিজের ক্ষতিই নিহিত থাকে। **নিয়ম হলো আমরা অন্যের প্রতি যা করি, পরিণামে তাই আমাদের জন্য হয়।** তাই সাধকের কারোর ক্ষতি চাওয়া, খারাপ ভাবা বা ক্ষতি করার কোন অধিকার নেই। তাঁর সমভাবে সকলের প্রতি হিতের ভাব রেখে সকলের সেবা করার অধিকারই শুধু আছে। সেবা করার ফলেই তিনি কর্মযোগের অধিকারী হন। অপরের ক্ষতি যিনি করেন, খারাপ বলে যিনি মনে করেন অথবা ক্ষতি করতে যিনি চান, তিনি অন্যকে শাসন করতে সক্ষম হলেও সেবা করতে পারেন না। শাসক কখনো সেবক হন না, সেবক কখনো শাসক হতে পারেন না। **সেবকের দ্বারাই সমাজের উন্নতি হয়, শাসকের দ্বারা নয়।**

ভালো কাজ করা পরিশ্রম-সাধ্য, কিন্তু মন্দ কাজ না করলে কোন পরিশ্রমও হয় না, কোন খরচও হয় না। তাই মন্দ কাজ পরিত্যাগ করতে সকলেই স্বাধীন ও সক্ষম। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন অন্য ব্যক্তি আমাদের ক্ষতি করে তখন আমরা কেন তাকে খারাপ বলে মনে করব না, কেন তার ক্ষতি চাইব না ? তার উত্তর হলো যে, যে আমাদের ক্ষতি করছে, তা তার স্বাভাবিক অবস্থা নয়, এই মন্দভাব তার মধ্যে উদিত হয়েছে, এটি আগন্তুক। স্বরূপত সে সর্বদাই কু-ভাব বর্জিত। দ্বিতীয়ত, আমাদের ক্ষতি হলে তার দ্বারা আমাদের পুরানো পাপ নাশ হয় এবং আমরা শুদ্ধ হয়ে উঠি। তৃতীয়ত, গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে অপরে আমাদের ক্ষতি করতে তখনই সক্ষম হয়, যখন আমরা বলহীন হই। আমরা তখনই বলহীন হই যখন প্রাণের মোহে আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই আর সেজন্যই আমরা এই ক্ষতিগুলোকে সহ্য করি। যদি আমাদের প্রাণের মোহ না থাকে এবং বাঁচার আকাঙ্ক্ষা ও মৃত্যুভয় না থাকে তাহলে কোন বলশালী ব্যক্তিই আমাদের ওপর অত্যাচার করতে পারে না। **সিদ্ধান্ত হলো এই যে, জাগতিক শক্তি কখনই আধ্যাত্মিক শক্তিকে পরাভূত করতে পারে না।** বিনাশশীল বস্তু অবিনাশীর ওপর কী করে বিজয়ী হবে ? অন্ধকার কী আলোকে রোধ করতে পারে ? **যার এই প্রাপ্ত ও পরিত্যক্তশীল শরীরে 'আমি' ও 'আমার' ভাব নেই, তাকে কেউ কখনো নিজের অধীন করতে পারে না। তাকে কেউ জয় করতে পারে না।** চিন্তা করে দেখা উচিত যখন শরীর নাশ হলেও আমাদের অস্তিত্ব (সত্তা) নাশ হয় না[১] তখন শরীর রাখার ইচ্ছা ও মৃত্যুভয় করে কি লাভ ? তাই সাধকের তাঁর নিজ কর্তব্য যত প্রিয় হয়, তাঁর প্রাণও

---

[১]ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
(গীতা ২।২০)

তাঁর কাছে তত প্রিয় নয়। নিজ কর্তব্য রক্ষার জন্য তিনি তাঁর প্রাণও বিসর্জন দিয়ে থাকেন। এরূপ সাধককে অতি বলবান ব্যক্তিও নিজের অধীন করে কর্তব্যচ্যুত করতে সক্ষম হন না।

কর্মযোগী নিজ কর্তব্য পালনের দ্বারা অপরের অধিকারও রক্ষা করেন। **অপরের যা অধিকার, তাই আমাদের কর্তব্য**। যেমন মাতা-পিতাকে সেবা করা পুত্রের কর্তব্য এবং তা হলো মাতা-পিতার অধিকার। যেসব ব্যক্তি নিজের অধিকার চায় তারা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করতে সক্ষম হয় না। তাই কর্মযোগের সাধক নিজ অধিকার পরিত্যাগ করেন। অধিকার পরিত্যাগ করলে নতুন করে আকাঙ্ক্ষা জন্মায় না এবং অপরের অধিকার রক্ষা করায় পুরানো কামনা-বাসনা নাশ হয় এবং সাধক অতি সহজেই কামনা-রহিত হয়ে যান।

মানুষ নিজের অধিকার ত্যাগ করতে এবং অপরের অধিকার রক্ষা করতে সমর্থ হলেও অধিকার প্রাপ্ত হতে সক্ষম নয়। অধিকার পাবার বাসনা মানুষকে কর্তব্যচ্যুত করে তাকে কাম-ক্রোধ-লোভ ইত্যাদি দোষ-যুক্ত করে তোলে, যার ফলে তার পতন হয়। তাই কর্মযোগের সাধক অন্যের অধিকার রক্ষা করে থাকেন।

নিজের শরীরের ওপরই যখন আমাদের কোন অধিকার থাকে না তখন শরীর যে জগৎ-সংসারের অংশ, তার ওপর আমাদের অধিকার থাকবে কেমন করে ? অপরপক্ষে, শরীর ও জগৎ-সংসারের অবশ্যই আমাদের উপর অধিকার আছে। শরীরের অধিকার হলো এই যে আমরা যেন একে অলস, অকর্মণ্য, বিলাসী, অসংযমী করে না তুলি এবং সংসারের অধিকার হলো যে আমরা যেন শরীরের দ্বারা জগৎ-সংসারের সেবা করি, কারো অপকার না করি এবং সকলকে সুখ প্রদান করি।

সমাজে যখনই অধিকার পাবার কামনা জন্মায়, তখনই মানুষ নিজ কর্তব্য থেকে দূরে সরে যায়। ফলে সমাজে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি

হয়। অধিকার পাবার ইচ্ছা থেকে দাসত্ব এসে যায়। তাই নিজ অধিকার পরিত্যাগ করাই হলো প্রত্যেক সাধকের কর্তব্য। নিজ অধিকার পরিত্যাগ করলে উদারতা ও অসঙ্গতা—দুইই আসে। উদারতা এলে কর্মযোগের এবং অসঙ্গতা এলে জ্ঞানযোগের সিদ্ধিলাভ হয়।

অধিকার প্রকৃতপক্ষে দেবার বস্তু, নেবার নয়। কেউ জোর করে অধিকার নিতে চাইলেও নিতে পারে না। অতি বলবান ব্যক্তিও অপরকে বিনাশ তো করতে পারে কিন্তু অপরের থেকে সম্মান, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস আদায় করতে পারে না। যদিও মানুষের দাম জগতের থেকে বেশি, কিন্তু অধিকার পাবার আকাঙ্ক্ষায় মানুষ তার দাম কমিয়ে ফেলে। অধিকার পাবার লালসার মূলে থাকে বিনাশশীল থেকে সুখ পাবার আকাঙ্ক্ষা। সাধক যখন সুখের আসক্তি দূর করেন, তখন অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষাও দূর হয় এবং সাধকের কর্মযোগ সিদ্ধ হয়।

ভক্তিযোগের পথ

প্রত্যেক সৃষ্টির পিছনেই যে একজন সৃষ্টিকর্তা থাকবেন—এই হলো নিয়ম। **প্রতিটি উৎপত্তির মূলেই থাকে কোন এক অনুৎপন্ন তত্ত্ব**। মানুষ যদি জগৎকে স্বীকার করে আর জগতের সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার না করে—তবে সেটি তার মস্ত বড় ভুল। যিনি পরা (জীব) এবং অপরা (জগৎ)—উভয়ের আশ্রয় ও প্রকাশক, সেই পরমাত্মাকে দৃঢ় বিশ্বাস করে তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা করা অথবা তাঁর শরণাগত হওয়া সাধকের অত্যন্ত প্রয়োজন। **পরমাত্মা কেমন এবং কী প্রকার—সাধকের তা জানার কোন প্রয়োজন নেই। সাধকের শুধু এটুকুই মেনে নেওয়া দরকার যে পরমাত্মা আছেন এবং তিনি আমার**। তাঁকে ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির সাহায্যে জানা যায় না, তাঁকে শুধু মেনে নিতে হয়। সৃষ্টি তাঁর সৃষ্টিকর্তাকে জানবেন কীভাবে ? অংশ তার অংশীকে কী করে জানতে পারে ?

পরমাত্মা (মন্দ-বুদ্ধিপূর্বক) বিচারের বিষয় নয়, তিনি হলেন শ্রদ্ধা ও

বিশ্বাসের বিষয়। তাঁকে মানা বা না মানার ব্যাপারে মানুষ সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। জীব ও জগৎ হলো বিচারের বিষয়। যে বিষয়ে আমরা কিছু জানি আর কিছুটা জানি না, তা নিয়ে বিচার করা যেতে পারে। কিন্তু যে বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না, যাঁকে আমরা কখনো দেখিনি, তাঁকে শুধু শ্রদ্ধা-বিশ্বাসই করা সম্ভব। আমার শ্রদ্ধা-বিশ্বাস অন্য কেউই দূর করতে সক্ষম নয়।

ঈশ্বরকে আমরা জানতে সক্ষম নই এবং তাঁকে না মেনেও থাকা সম্ভব নয়। যেমন, মাতা-পিতাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে জানতে পারি না, কিন্তু তাঁদের মেনে নেওয়া সম্ভব ; কারণ ওই সময় আমাদের (শরীরের) অস্তিত্ব ছিল না। আমাদের শরীরের অস্তিত্ব মেনে নিলে মাতা-পিতার অস্তিত্বও মেনে নিতে হবে। আমরা থাকলে মাতা-পিতাও বিরাজমান থাকেন। কার্য থাকলে তার কারণও থাকে। তেমনই আমাদের অস্তিত্ব থাকলে ঈশ্বরও আছেন। **আমাদের সত্তা ঈশ্বরের সত্তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ**। আমি নেই—এইভাবে নিজের অস্তিত্বকে কেউ না বলতে পারে না। যখন নিজের অস্তিত্বকে না বলা যায় না, তখন ঈশ্বরের অস্তিত্বকেও না বলা সম্ভব নয়।

মাতাকে জানার চেয়ে পিতাকে জানা একেবারেই অসম্ভব; কারণ মাতৃগর্ভ থেকে প্রসবকালে তো আমাদের দেহ সম্পূর্ণরূপে গঠিত থাকে, কিন্তু পিতার দ্বারা গর্ভ স্থাপনের সময় তো আমাদের দেহেরও কোন অস্তিত্ব ছিল না। ভগবান সমস্ত জগতের পিতা—**'অহং বীজপ্রদঃ পিতা'** (গীতা ১৪।৪), **'পিতাহমস্য জগতঃ'** (গীতা ৯।১৭), **'পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য'** (গীতা ১১।৪৩)। তাই ভগবানকে জানা একেবারেই অসম্ভব। তাঁকে শুধু মেনে নেওয়াই সম্ভব। মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। **জানার থেকে মেনে নেওয়া কোন অংশেই কম নয়**। ভগবানকে দৃঢ়তা সহকারে মেনে নিলে তাঁর সঙ্গে

আত্মীয়তাবোধ জন্মায় এবং আত্মীয়তাবোধ জন্মালে তাঁর প্রতি অনুরাগ হয়।

যা আগে ছিল না, পরেও থাকবে না এবং বর্তমান সময়েও প্রতিমুহূর্তে বিনাশের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, সেই শরীর এবং জগৎ-সংসার বিশ্বাসের যোগ্য নয়। যা এক মুহূর্তও আমাদের সঙ্গে থাকে না, প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হয়, তাকে কীভাবে বিশ্বাস করা সম্ভব ? তাকে সেবা করা গেলেও বিশ্বাস করা যায় না। বিশ্বাস তাকেই করা সম্ভব, যে সর্বদা আমাদের সঙ্গে থাকে, কখনো আমাদের থেকে সরে যায় না। ভগবান সর্বদাই আমাদের সঙ্গে থাকেন—**'সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ'** (গীতা ১৫।১৫)। আমরা পশু-পক্ষী ইত্যাদি যে-কোনভাবে জন্ম নিই অথবা স্বর্গ-নরক যে কোন লোকে গমন করি না কেন ভগবান কখনো আমাদের পরিত্যাগ করেন না।

মানুষ যখন তার আকাঙ্ক্ষা নিজে পূরণ করতে সক্ষম হয় না এবং জগতের কারো দ্বারাই তা পূর্ণ হয় না, তখন সে স্বভাবতই ভগবানের ওপর নির্ভর করে, যাঁকে সে কখনো দেখেনি, শুধু তাঁর কথাই শুনেছে। মানুষের যখন কোন বিপদ আসে এবং তার থেকে রক্ষা পাবার কোন উপায় সে খুঁজে পায় না এবং সমস্ত প্রচেষ্টাই যখন ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন সে ভগবানে বিশ্বাস করে তাঁকে ডাকতে থাকে।

যে ব্যক্তি ভগবানে বিশ্বাস না করে শরীর ও জগতের ওপর নির্ভর করে থাকে, সে জন্ম-মৃত্যুচক্রে আবদ্ধ হয়ে নানারূপ দুঃখভোগ করতে থাকে। শরীর ইত্যাদির ওপর বিশ্বাস করলে অহংবোধ, মমত্ববোধ, কামনা-বাসনা, লোভ ইত্যাদি নানাপ্রকার বিকার উৎপন্ন হয়। শরীর ইত্যাদি তো থাকে না, কিন্তু পরিণামে তার সম্বন্ধ থেকে যাওয়ায় নানা জন্ম পরিভ্রমণ করতে হয় **'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু'** (গীতা ১৩।২১)।

যিনি ভগবানেও বিশ্বাস রাখেন না এবং শরীর ও জগৎ সংসারকে বিশ্বাস করেন না, শুধু নিজেকেই বিশ্বাস করেন, তিনি হলেন জ্ঞানযোগের সাধক। এরূপ সাধক 'আমি কে'—তার অনুসন্ধান করেন। **'আমি'র অনুসন্ধান করতে করতে আমিত্ব দূর হয়ে শুধু 'আছে' থেকে যায়।** সাধক 'আছে' বলে (পরমাত্মতত্ত্বকে) স্বীকার করুন বা না করুন, অন্তকালে তিনি পরমাত্মলাভ করেন। যেমন, কোন ব্যক্তি যতই আকাশে-বাতাসে নৃত্য করুক, শেষকালে তার মাটিতেই স্থান হয়।

একমাত্র স্ব-স্বরূপই বিরাজমান—এইভাবে দৃঢ়তা সহকারে পরমাত্মতত্ত্বে বিশ্বাস জন্মালে শরীর এবং জগৎ-সংসারের ওপর বিশ্বাস নির্জীব এবং আলগা হয়ে যায়। কেননা পরস্পরবিরুদ্ধ দুটি বিশ্বাস একসঙ্গে থাকতে পারে না। সাধক যখন স্বীকার করেন যে পরমাত্মা **অদ্বিতীয়, সর্বদা বিরাজমান, সর্বসমর্থ, সর্বজ্ঞ, সর্বসুহৃদ, পরম দয়ালু, সকলের জন্য, সর্বত্র আছেন,** তখন তাঁর পরমাত্মার ওপর স্বতঃই শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়। পরমাত্মার ওপর শ্রদ্ধা-বিশ্বাস হলে সাধক এক পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোন অস্তিত্বকে স্বীকার করেন না। এরূপ অবস্থায় নিদ্রাভঙ্গ হলে যেমন স্বপ্নের বিস্মৃতি হয় এবং জাগ্রতের স্মৃতি জেগে ওঠে, তেমনই সাধকের মধ্যে স্বতঃই পরমাত্মার (আছেন) নিত্য সম্পর্কের স্মৃতি জাগ্রত হয়ে জগতের (অস্তিত্ব নেই) সর্বতোভাবে বিস্মৃতি ঘটে—**'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'** (গীতা ২।১৬)। পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য সম্পর্কের স্মৃতি জাগ্রত হলেই সাধকের প্রতিমুহূর্তে বর্ধমান প্রেমের প্রাপ্তি হয়, যা মানবজীবনের চরম লক্ষ্য।

প্রশ্ন হতে পারে যে, পরমাত্মা যখন সর্বময়, সর্বত্র বিরাজমান তখন সাধকের কাছে তিনি দূরবর্তী বলে প্রতীয়মান হন কেন ? গভীরভাবে বিচার-বিবেচনা করলে জানা যায় যে, সাধক যখন এই বিনাশশীল

শরীর-ইন্দ্রিয়াদি-মন-বুদ্ধির সাহায্যে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হতে চান, তখন তাঁর কাছে পরমাত্মা দূরবর্তী বলে মনে হয়। কেননা **পরমাত্মাপ্রাপ্তি ক্রিয়া ও পদার্থের সাহায্যে হয় না, তাঁকে পাওয়া যায় ক্রিয়া ও পদার্থের আশ্রয় ত্যাগ করলে**। তাই সাধকের উচিত তাঁর শরীর ইত্যাদিকে জগতের সেবায় সমর্পণ করা এবং নিজেকে (অস্তিত্বমাত্র স্বরূপকে) ভগবানে সমর্পণ করা। সাধক যখন সর্বদিকে বিমুখ হয়ে ভগবানের শরণাগত হন, তখন ভগবান কৃপা করে তাঁকে আপন করে নেন, নিজের সঙ্গে অভিন্ন করে নেন।

বিচার করলে দেখা যায় যে যিনি সর্ব দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, অবস্থা, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ হয়ে আছেন, তাঁর থেকে দূরে থাকা সম্ভব হয় কী করে ? **সিদ্ধান্ত হলো যে যিনি দূরে নেই, তাঁকে কোন ক্রিয়ার সাহায্যে পাওয়া যায় না, তাঁকে চাইলেই পাওয়া যায়**। যদি সাধক এইসব বিনাশশীল প্রাণী এবং পদার্থসমূহকে নিজের এবং নিজস্ব বলে মনে না করেন এবং ভগবানের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করেন, তাহলে তিনি আর ভগবানের থেকে দূরে থাকেন না। কেননা তিনি তো প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই অংশ—'**মমৈবাংশো জীবলোকে**' (গীতা ১৫।৭)। মানুষ সাধারণত এই ভুলই করে যে, সে প্রাপ্ত বস্তু, যোগ্যতা, সামর্থ্য ইত্যাদিকে নিজের বলে মনে করে, কিন্তু যিনি তাকে এই সব দিয়েছেন, সেই ভগবানকে নিজের বলে মনে করে না। বস্তুগুলি আসলে নিজের নয়, কিন্তু যিনি দেন তিনি আমাদের আপন। যে মুহূর্তে সাধক ভগবানকে আপন ভেবে তাঁর শরণাগত হন, সেই মুহূর্তেই ভগবান তাঁকে আপন করে নেন। কেননা ভগবান সাধকের অতীতের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে তাঁর বর্তমানই দেখে থাকেন, তাঁর আচরণের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে তাঁর ভাবগুলি দেখেন—

রহতি ন প্রভু চিত চূক কিএ কী। করত সুরতি সয় বার হিএ কী॥

(শ্রীরামচরিতমানস, বালকাণ্ড ২৯।৩)

তিনি তাঁর শরণাগত ভক্তকে নির্ভয়, শোকহীন, নিশ্চিন্ত এবং নিঃশঙ্ক করেন। কিন্তু এর সঙ্গে অন্য কারো শরণ (আশ্রয়) নেওয়া উচিত নয়। অন্যের শরণ, অন্যকে বিশ্বাস এবং অন্যের সম্পর্ক থাকলে ভগবানের আশ্রয় দৃঢ় হয় না। যে ব্যক্তির ভগবান ব্যতীত আর কেউ আপন নয় এবং যে নিজের মধ্যে কোন বিশেষত্ব দেখে না, সে-ই অতি সহজে ভগবানের আশ্রিত হয়ে যায়। ভগবানের আশ্রিত হলে তার আর নিজের জন্য কোন কিছু করা বাকি থাকে না। তার করা প্রতিটি কর্মই তখন ভগবানের পূজা হয়ে ওঠে।

শুধু প্রেম-প্রাপ্তির জন্যই ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকা উচিত। **প্রেম লাভ করার একমাত্র উপায় হলো—ভগবানের সঙ্গে আত্মীয়তা।** ভগবানকেই একমাত্র আপন বলে মনে করলে প্রেম জাগরূক হয়। প্রেম জাগরূক হলে অহং সর্বতোভাবে নাশ হয়। অহং সর্বতোভাবে নাশ হলে ভগবানের সঙ্গে দূরত্ব, পার্থক্য ও ভিন্নতা—তিনটিই সর্বতোভাবে দূর হয়ে যায়।

প্রেম জাগ্রত না হলে অহং সর্বতোভাবে নাশ হয় না—

'প্রেম ভগতি জল বিনু রঘুরাঈ। অভিঅন্তর মল কবহুঁ ন জাঈ॥'

(শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৪৯।৩)

মুক্ত মহাপুরুষদের মধ্যেও প্রেমের আকাঙ্ক্ষা থাকে। তাই যিনি মুক্তি লাভেও সন্তুষ্ট হন না, ভগবান তাঁকে প্রেম দান করেন। এইভাবে দেখলে মুক্তি সাধন আর প্রেম হলো সাধ্য। **প্রেম প্রাপ্তি না হলে সাধন পূর্ণতা লাভ করে না।** ভগবান জ্ঞানস্বরূপ হয়েও প্রেমপিয়াসী। জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগের পথে মোক্ষলাভ হলেও এক সূক্ষ্ম অহং থেকে যায়, যার ফলে ভগবানের সঙ্গে দূরত্ব ও পার্থক্য চলে গেলেও, তাঁর সঙ্গে অভিন্নতা হয় না। এই সূক্ষ্ম অহংবশতই মুক্ত মহাপুরুষদের এবং তাঁদের মেনে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ মতামত দেখা যায়। কিন্তু

প্রেম প্রাপ্তি হলে যখন এই সূক্ষ্ম অহং সর্বতোভাবে দূর হয় তখন এইসকল মতভেদ সম্পূর্ণভাবে দূর হয় এবং তাঁরা ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যান। অভিন্নতা হলে তখন একমাত্র ভগবান ব্যতীত আর কোন অস্তিত্ব থাকে না—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (গীতা ৭।১৯)।

উপসংহার

উপনিষদে বলা হয়েছে যে ভগবানের একলা ভালো লাগছিল না **'একাকী ন রমতে'** (বৃহদারণ্যক ১।৪।৩)। তাই খেলার (প্রেম-লীলার) জন্য ভগবান এক থেকে বহুরূপ ধারণ করেন—**'সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি'** (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ২।৬)। সেই বহুরূপের মধ্যে শ্রীরাধা ভগবানের আশ্রিত হয়ে রইলেন, আর জীব খেলনাগুলিতেই (শরীর ও জগৎ সংসারেই) মগ্ন হয়ে রইল ! শ্রীরাধা খেলায় মগ্ন না হওয়ায় তিনি প্রতিক্ষণ বর্ধমান প্রেম প্রাপ্ত হলেন আর জীব খেলায় মগ্ন থাকায় তাদের জন্ম-মৃত্যুরূপ জগৎ প্রাপ্তি হলো। এই খেলার বস্তুগুলি নিজের বা নিজের জন্য নয়। এ শুধু অপরকে সুখী করারই জন্য। এগুলিকে নিজের এবং নিজের বলে মনে করা মস্ত বড় ভুল, এই ভুল দূর করাই হলো মানুষের কর্তব্য। এই এক ভুলই স্থানভেদে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-ঈর্ষা-দ্বেষ-দম্ভ-পাষণ্ডতা ইত্যাদি নানা বিকার রূপে দেখা দেয়। এই ভুল ক্রমশ বাড়তেই থাকে, তার আর কোন শেষ থাকে না।

নিজেকে ভুলে গেলে দেহাভিমান উৎপন্ন হয়। কর্তব্য ভুলে গেলে অকর্তব্য দেখা দেয়। ভগবানকে ভুলে গেলে বিনাশশীলের সঙ্গে সম্পর্ক হয়। এই সব ভুল দূর করার জন্য তিনটি যোগ আছে—জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ। বিচার-বিবেচনার সাহায্যে জগতের বস্তুসমূহ থেকে নিজেকে পৃথক করে রাখাকে বলা হয়—জ্ঞানযোগ। ওই সব

বস্তুকে জগৎ-সংসারের সেবায় নিয়োগ করাকে বলা হয়—কর্মযোগ। মানুষ স্বয়ং যাঁর অংশ, সেই ভগবানে মন নিবিষ্ট করলে তাকে বলা হয়—ভক্তিযোগ। কিন্তু যারা জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ বা ভক্তিযোগে মন না দিয়ে জগৎ সংসারে অর্থাৎ ভোগ ও সম্পদ সংগ্রহে ব্যাপৃত হয়, তারা জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়। তাদের জন্মালে মরতে হয় আবার মৃত্যুর পর পুনরায় জন্ম নিতে হয়—এইভাবে তারা জন্ম-মৃত্যু চক্রে পরিভ্রমণ করতে থাকে—**'পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননীজঠরে শয়নম্'**।

মানুষ তিনটি শক্তি প্রাপ্ত হয়েছে—জানার শক্তি, করার শক্তি এবং মানার শক্তি। জানার শক্তি জ্ঞানযোগের জন্য, করার শক্তি কর্মযোগের জন্য এবং মানার শক্তি ভক্তিযোগের জন্য। **জানার শক্তির সুব্যবহার হলো—নিজেকে জানা। করার শক্তির সুব্যবহার হলো—সেবা করা এবং মানার শক্তির সুব্যবহার হলো—ভগবানকে মানা।**

বস্তু, শরীর, যোগ্যতা এবং সামর্থ্য—এই চারটি বস্তুই জড়-বিভাগের। এই সব বস্তু চেতন-বিভাগ (স্বরূপ) পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। তাই বস্তু, শরীর, যোগ্যতা এবং সামর্থ্য—সবই জগৎ সংসারের এবং জগতের কাজেই লাগে, নিজের কাজে এগুলি বিন্দুমাত্র লাগে না। জড়-বিভাগ অর্থাৎ **শরীর-জগৎ-সংসার থেকে আমাদের কোন প্রাপ্তি হয় না, আমাদের কোনোপ্রকার উন্নতি বা হিতসাধন হয় না**। এগুলির থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলেই আমাদের মঙ্গল, আমাদের পক্ষে হিতকারী। তাই শরীর ও জগৎ-সংসারের সাহায্যে কোন ব্যক্তিই বন্ধনমুক্ত হতে পারেন না। শরীরের দ্বারা যেসব ক্রিয়াদি হয়, সেগুলি জগৎ-সংসারেরই কাজে আসে। সেগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হলে তবেই তা (ত্যাগ) স্ব-স্বরূপের কাজে আসে।

কিছু করলে আমাদের লাভ হবে—এরকম চিন্তা করা ভুল। কারণ

ক্রিয়ামাত্রই জড় এবং বিনাশশীল আর স্ব-স্বরূপ চেতন এবং অবিনাশী। জড় বস্তুর সাহায্যে চেতন কী লাভ করতে পারে ? বিনাশশীল বস্তুর সাহায্যে অবিনাশীর কী লাভ পারে ? জড় এবং বিনাশশীল ক্রিয়ার দ্বারা আমাদের মঙ্গল হওয়ার নয়। তাই আমাদের কর্ম করারও কোন স্বার্থ থাকা উচিত নয় এবং কর্ম না করারও কোন স্বার্থ থাকা উচিত নয়— **'নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন'** (গীতা ৩।১৮)। 'করা' ও 'না করা'—উভয়ই প্রকৃতির (জড়-বিভাগের) এবং অভাবরূপ। স্ব-স্বরূপের (চেতন বিভাগের) 'করা' ও 'না করা'—এই দুটিই নেই। প্রকৃতপক্ষে তিনি এই দুইয়েরই প্রকাশকারী ভাবরূপ নিরপেক্ষ তত্ত্ব। যেমন 'করলে' শরীরের পরিশ্রম হয়, তেমনই 'না করলে' অর্থাৎ সুষুপ্তির সময় শরীরের বিশ্রাম লাভ হয়, স্ব-স্বরূপের নয়। **স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ—এই তিন শরীরের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলেই স্ব-স্বরূপের চির-বিশ্রাম লাভ হয়।**

সাধককে গভীরভাবে ভেবে দেখতে হয় যে আমি স্থূল শরীর নই, সূক্ষ্ম শরীর নই এবং কারণ শরীরও নই। বস্তু, যোগ্যতা, বল ইত্যাদি কোন কিছুই আমার নয়। এগুলি সবই পরিবর্তনশীল। আমার স্বরূপ এক অপরিবর্তনশীল অস্তিত্বমাত্র। তার যাতায়াত নেই, উৎপত্তি-বিনাশ নেই। তা একইভাবে বিরাজমান। এটি জেনে সাধক যেন তাঁর অস্তিত্বমাত্র স্বরূপে স্থিত হয়ে স্থির (নিশ্চুপ) হয়ে থাকেন।

অস্তিত্বে অর্থাৎ আমাদের সত্তায় 'আমি' ভাব নেই। ভুলক্রমে এই 'আমি'ভাব মেনে নেওয়া হয়। 'আমি আছি'—এতে 'আমি' নেই, কিন্তু 'আছি' থাকে। আমাদের অস্তিত্ব হলো 'আমি'কে ছাড়াই। পরমাত্মাই সর্বত্র 'আছে' রূপে পরিপূর্ণ। সেই 'আছে'র অংশই হলো 'আছি'। আমি আছি, তুমি আছ, এ আছে, সে আছে —এই চারটির মধ্যে শুধু 'আমার' সঙ্গেই 'আছি' যোগ হয়। 'আমি' না থাকলে

'আছি' থাকে না, শুধু 'আছে'ই থেকে যায়। **তাৎপর্য হলো যে 'আছি'ও আসলে 'আছে'ই হয়।** সাধক যদি এই প্রকৃত তত্ত্বটি উপলব্ধি করতে পারেন তাহলে অধ্যাত্ম-পথে তাঁর খুবই উন্নতি হয়।

'আমি'-র কারণেই জগতের অস্তিত্ব রয়েছে। 'আমি' থেকেই জগৎ উৎপন্ন হয়। জীবের মধ্যে যে অহংবোধ থাকে, তার দ্বারাই এই জগৎ প্রতীত হয়—**'যয়েদং ধার্যতে জগৎ'** (গীতা ৭।৫)। তাই **পরমাত্মার দৃষ্টিতেও জগৎ বিরাজমান নয়, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের দৃষ্টিতেও বিরাজমান নয়, এ শুধু জীবের দৃষ্টিতেই বিরাজ করে।** আমাদের যে অস্তিত্ব, তাতে 'আমি' ভাব নেই। আমি বোধ জড় বিভাগে থাকে। আমাদের সম্পর্ক যতক্ষণ জড়ত্বের সঙ্গে থাকে, ততক্ষণ জন্ম-মৃত্যুও হয়ে থাকে। জড়ত্ব থেকে সম্পর্ক ছেদ করে শুধুমাত্র অস্তিত্বে থাকাকেই মুক্তি বলা হয়।

এটি মানুষ, এটি পশু, এ পক্ষী; এরা জলচর, ওরা স্থলচর-নভচর; এ হলো ইঁট, ওটি চুন, অন্যটি পাথর—এসবের মধ্যে 'আছে' ভাব থাকে। কিন্তু সঙ্গে 'আমি' ভাব থাকলেই বন্ধন হয়। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ 'আছে'-তে স্থিতিলাভ করেন। সকলের স্থিতি যদিও 'আছে'-তেই বিদ্যমান, তবু জড়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় 'আমি আছি' হয়েছে। জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে 'আমি আছি' থাকবে না, তা তখন 'আমি আছে' হয়ে যাবে। এই স্থিতিকেই বলা হয় জীবন্মুক্তি।

পশু, পক্ষী, দেবতা, রাক্ষস প্রভৃতি সকলের মধ্যে সমনিয়মে যে এক অস্তিত্ব পরিপূর্ণ থাকে, তা হলো পরমাত্মারই স্বরূপ। **সেই অস্তিত্বকে 'আমার' সঙ্গে মিশিয়ে ফেললে অর্থাৎ জাগতিক বস্তু প্রভৃতির (জড়ত্ব) সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলে জীব হয়ে ওঠে, 'আমি' থেকে সেগুলিকে পৃথক করলেই মুক্ত হয়ে যায় এবং ভগবানের সঙ্গে যুক্ত করলে ভক্ত হয়ে ওঠে।**

মানুষের প্রধান কাজ হলো—জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা; কেননা জড়ত্বকে নিজের এবং নিজের বলে মনে করলেই যত অনর্থ হয়। জড়ত্বকে নিজের এবং নিজের জন্য মনে করলে জড়ত্বই থেকে যায়, চিন্ময়তা আসে না। তাই শরীরকে জগৎ-সংসারের সেবায় লাগানো উচিত। মনুষ্যজন্ম শুধুমাত্র সেবা করার জন্যই। অন্য কেউই সেবা করতে সক্ষম নয়। অন্যান্য যোনির প্রাণীদের (পশু আদি) দ্বারা সেবা নিতে পারলেও তারা সেবা করতে সক্ষম নয়। গাছপালাকে আমরা আমাদের কাজে ব্যবহার করলেও তারা নিজেদের ইচ্ছায় আমাদের উপকার করতে সক্ষম হয় না। যারা সেবা করে না, তারা মনুষ্যত্ব থেকে চ্যুত হয়ে পশুত্বে গমন করে। তাই মানুষের উচিত জগৎ থেকে আহৃত বস্তুসমূহ জগৎ-সংসারের সেবাতেই ব্যয় করা এবং তার পরিবর্তে কিছু আশা না করা। জগতের বস্তুগুলি জগতের জন্যই ব্যয় করা হলে আর কীসের আশা ? জগতের জিনিসসব জগতের সেবায় ব্যয় করলে তাকে বলা হয় কর্মযোগ। স্বয়ং জগৎ-সংসার থেকে আলাদা হয়ে চিন্ময়তত্ত্বে স্থিত হওয়াকে বলা হয় জ্ঞানযোগ। স্বয়ং ভগবানে লেগে থাকাকে বলা হয় ভক্তিযোগ।

শরণাগতিতে কোন সাংসারিক দৈন্যও থাকে না, পরাধীনতাও নয়। কেননা ভগবান ‘পর’ নয়, তিনি ‘স্বকীয়’। প্রকৃতি এবং তার কার্য হলো ‘পর’। সুতরাং প্রকৃতি এবং তার কার্যের (ক্রিয়া এবং পদার্থের) অধীনে থাকাকেই বলা হয় পরাধীনতা। ভগবানের অধীনতা হলো পরম স্বাধীনতা। যেমন, মাতা-পিতার অনুগত পুত্রের মাতা-পিতার অধীন হতে হয় না, বরং তা হয় কর্তব্য পালন; কেননা মাতা-পিতা ‘পর’ নন, তাঁরা নিজেরই। জাগতিক দীনতায় কিছু নেওয়ার ভাব থাকে কিন্তু শরণাগতিতে কিছু নেওয়ার নেই, শুধু নিজেকে সমর্পণ করা। ভগবানের অংশ হওয়ায় জীব সর্বদাই ভগবানের। **ভগবানের সঙ্গে এই নিত্য**

সম্পর্কের স্মৃতিই হলো শরণাগতি।

ভগবান নিজেকে ভক্তদের অধীন বলেছেন—**'অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ'** (শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৪।৬৩)। এই হলো প্রেমের বৈশিষ্ট্য। ভগবান প্রেমের কাঙাল। ভগবান প্রকৃতপক্ষে কারো অধীন নন, তিনি শুধু পরাধীনের মতো (**ইব**)। পরাধীনতা সেখানে থাকে, যেখানে ভিন্নতা থাকে। ভক্তিতে ভেদভাব দূর হয়ে ভগবান ও ভক্তের মধ্যে অভিন্নতা হয়। যখন 'পরের' (ক্রিয়া ও পদার্থের) সম্পর্ক সর্বতোভাবে দূর হয়, তখন ভগবানে প্রতিমুহূর্তে বর্ধমান প্রেম জাগ্রত হয়। প্রেমে কেউ দ্বিতীয় নয়, কেউ পর নয়। তাই প্রেমে পরাধীনতার লেশমাত্র থাকে না।

ভক্তিযোগ সাধ্য। জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ সাধন। জগতের বন্ধন (জন্ম-মৃত্যু) থেকে রক্ষা পাওয়াকেই বলা হয় মুক্তি[১]। **ভক্তিযোগে মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রেমও প্রাপ্ত হয়। তাই ভক্তিযোগ হলো বিশিষ্ট।**

---

[১]ভগবান জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগকে সমকক্ষ বলে জানিয়েছেন—

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্‌॥
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

(গীতা ৫।৪-৫)

'অবোধ ব্যক্তিগণ সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগকে পৃথক পৃথক ফলসম্পন্ন বলে জানালেও পণ্ডিতগণ এরূপ বলেন না। কারণ এই দুইয়ের মধ্যে একটি সাধনেই স্থিত ব্যক্তি উভয়ের ফলরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়ে থাকে।'

'সাংখ্যযোগিগণ যে তত্ত্ব প্রাপ্ত হন, কর্মযোগিগণও সেই তত্ত্ব প্রাপ্ত হন। সুতরাং যে ব্যক্তি সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগকে ফলরূপে একই দেখে থাকেন, তিনিই সঠিক দেখেন।'

জ্ঞানযোগ	কর্মযোগ	ভক্তিযোগ
১. আধ্যাত্মিক সাধনা	ভৌতিক সাধনা	আস্তিক সাধনা
২. জানার শক্তি	করার শক্তি	মানার শক্তি
৩. বিবেক-বিচারের প্রাধান্য	ক্রিয়ার প্রাধান্য	ভাবের (শ্রদ্ধা বিশ্বাসের) প্রাধান্য
৪. স্ব-স্বরূপকে জানা	সেবা করা	ভগবানকে মানা
৫. স্বরূপ পরায়ণতা	কর্তব্য পরায়ণতা	ভগবদ্ পরায়ণতা
৬. স্বাশ্রয়	ধর্মের (কর্তব্যের) আশ্রয়	ভগবদাশ্রয়
৭. অহং-অভিমান ত্যাগ	কামনা ত্যাগ	মমত্ব-বোধ ত্যাগ
৮. অহং-বোধ দূর করা	অহং-বোধ শুদ্ধ করা	অহং-বোধ পরিবর্তন করা
৯. নিজের জন্য উপযোগী	সংসারের জন্য উপযোগী	ভগবানের জন্য উপযোগী
১০. 'অক্ষর'-এর প্রাধান্য	'ক্ষর'-এর প্রাধান্য	'পুরুষোত্তম'-এর প্রাধান্য
১১. জ্ঞাত জ্ঞাতব্যতা	কৃত কৃত্যতা	প্রাপ্ত প্রাপ্তব্যতা
১২. অখণ্ডরস	শান্তরস	অনন্তরস
১৩. তাত্ত্বিক-সম্বন্ধ	নিত্য-সম্বন্ধ	আত্মীয়-সম্বন্ধ
১৪. পরমাত্মার সঙ্গে ঐক্য	পরমাত্মার সঙ্গে সামীপ্য	পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্নতা
১৫. বোধ প্রাপ্তি	যোগ প্রাপ্তি	প্রেম প্রাপ্তি
১৬. স্বাধীনতা	উদারতা	আত্মীয়তা
১৭. স্বরূপে স্থিতি লাভ	জড়ের আকর্ষণ দূর হয়	ভগবানে আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়
১৮. কর্তৃত্ব ত্যাগ	ভোক্তৃত্ব ত্যাগ	মমত্ববোধ ত্যাগ

	জ্ঞানযোগ	কর্মযোগ	ভক্তিযোগ
১৯.	আত্মসুখে সুখী হওয়া	সংসারের সুখে সুখী হওয়া	ভগবানের সুখে সুখী হওয়া
২০.	কোন কিছু না করা	সংসারের জন্য কিছু করা	ভগবানের জন্য করা
২১.	প্রকৃতিকে অর্পণ করা	সংসারকে অর্পণ করা	ভগবানকে অর্পণ করা
২২.	বিরক্তি (বৈরাগ্য)	অনাসক্তি	অনুরক্তি
২৩.	দেহাভিমান প্রতিবন্ধক	কামনা প্রতিবন্ধক	ভগবদ্‌বিমুখতা প্রতিবন্ধক
২৪.	বিচার-বুদ্ধির প্রাধান্য	উদ্যোগের প্রাধান্য	বিশ্বাসের প্রাধান্য
২৫.	কর্ম ভস্মীভূত হয়ে যায়	কর্ম অকর্ম হয়ে যায়	কর্ম দিব্য হয়ে ওঠে
২৬.	কোন আকাঙ্ক্ষা না করা	অপরের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা	ভগবানের ইচ্ছায় নিজ ইচ্ছা যোগ করা
২৭.	কাউকে আপন বলে না মানা	সকলকেই (সেবার জন্য) আপন বলে ভাবা	একমাত্র ভগবানকেই আপন মনে করা

~~○~~

জাগতিক প্রভাব নিরসনের উপায় কী ?

প্রায়শই সাধকগণের একটি অভিযোগ শোনা যায় যে, জাগতিক কোন কিছুই নিজের নয় বলে জানা থাকা সত্ত্বেও, বস্তু -সান্নিধ্য ঘটলেই চিত্তে তার প্রভাব কিন্তু পড়েই। এই ব্যাপারে দুটি কথা বিবেচনার যোগ্য। প্রথমটি হলো বস্তুর **প্রভাব পড়লেও তাকে গ্রাহ্য না করা অর্থাৎ তাকে উপেক্ষা করা**। অর্থাৎ তাকে ভালো বা মন্দ কোন ভাবেই দেখতে নেই। ওটি ধরে রাখার চেষ্টাও না করা, দূর করার চেষ্টাও না করা, ওটিতে উদাসীন হয়ে যাওয়া। দ্বিতীয় কথা হলো, বাস্তবে **প্রভাব পড়ে মন-বুদ্ধির ওপর, নিজের স্বরূপের ওপর নয়**। সুতরাং তাকে নিজের মধ্যের ব্যাপার বলে মনে করবে না।

কোন বস্তুতে অনুরক্ত হলেও সম্বন্ধ হয়ে যায়, আবার বিরক্ত (দ্বেষযুক্ত) হলেও সম্বন্ধ গঠিত হয়। ভগবান শ্রীরাম বনবাসে গমন করলে তাঁর প্রতি যে সকল মুনি-ঋষি অনুরক্ত হয়েছিলেন তাঁরা ত্রাণ পেয়েছিলেন, আবার যে সব রাক্ষস তাঁর প্রতি বিদ্বেষ করেছিল তারাও ত্রাণ পেয়েছিল ; কিন্তু যারা অনুরাগ বা বিদ্বেষ কোনটাই করেনি তাদের ত্রাণ সম্ভব হয়নি। এইরকমই **জগতের প্রভাব যদি চিত্তে পড়ে তাহলে ওগুলির প্রতি অনুরাগ বা বিদ্বেষের কোন সম্বন্ধই স্থাপন করা উচিত নয়**। উচিত হলো ভগবানের সাধন-ভজনে রত হওয়া। যদি জাগতিক প্রভাব হতেই থাকে তবে তা হোক, ওদিকে নিজের কোন লক্ষ্য রাখার প্রয়োজনই নেই—এইভাবে তাকে উপেক্ষা করতে হবে।

মানুষ যেমন কুকুরের মনের সাথে নিজের কোন সম্বন্ধ স্বীকার করে না, তেমনই নিজের মনের সাথেও নিজের কোন সম্বন্ধ স্বীকার করতে নেই। কুকুরের মন আর মানুষের মন একই জাতীয়। কুকুরের মনটি যখন মানুষটার নয়, নিজের মনটিও প্রকৃতপক্ষে নিজের নয়। মন হলো জড়

প্রকৃতির কার্য, আর আপনি হলেন চেতন পরমাত্মার অংশ। কুকুরের মনে জগতের প্রভাব পড়লে যেমন মানুষের কিছু যায় আসে না, সেই রকমই এই মনে যাই জাগতিক প্রভাব পড়ুক না কেন সে ব্যাপার নিয়েও মানুষের কিছু লাভ-লোকসান নেই।

মনের সম্বন্ধ হলো প্রকৃতির সঙ্গে আর আত্ম-স্বরূপের সম্বন্ধ পরমাত্মার সঙ্গে। নিজের মনের সঙ্গে নিজের (স্বরূপের) সম্বন্ধ মেনে নিলে দুঃখ পেতেই হবে। তখন মানুষ মন দ্বারা, শরীর দ্বারা যে কার্যই করুক তার পাপ-পুণ্য তাকেই বহন করতে হবে। কুকুরের মনে যাই হোক তাতে আমার কী যায় আসে ? সেই রকমই আমার মনেও যাই হোক না কেন তাতেই বা আমার কী যায় আসে ? শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির সাথে আমার সম্বন্ধ নেই ; বস্তুত সম্বন্ধ আছে পরমাত্মার সাথে—এই কথা বোঝাতে গিয়ে গীতায় ভগবান বলেছেন, '**মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ**' (১৫।৭) 'এই জগতে জীব রূপধারী আত্মা আমারই সনাতন অংশ' এই কথাটি বুঝতে পারলেই নিজের চিন্তাধারা আর সাধনায় অগ্রগতির প্রভাব পড়বেই।

মানুষ নিজেকে জানে 'আমি আছি' বোধে। এর মধ্যে 'আমি' তো জড় আর 'আছি' হলো চেতন। 'আমি'র কারণেই 'আছি' আছে। যদি 'আমি' (অহং) না থাকে তাহলে 'আছি'ও থাকবে না, বস্তুত থেকে যাবে শুধু 'আছে' (চিৎ অস্তিত্বমাত্র)। এই প্রসঙ্গেই গীতায় ভগবান বলেছেন যে, যখন সাধক মমত্বরহিত নিরহংকার হয়ে যায়, তখন তার স্থিতি হয়ে যায় ব্রহ্মে—'**এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ**' (গীতা ২।৭২)।

অহংকার জীবের স্বরূপ নয়। অহংকার হলো অপরা প্রকৃতি আর জীব পরা প্রকৃতি। জীব আর অহংকার ভিন্ন। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন দশায় অহংকার জেগে থাকে, কিন্তু সুষুপ্তিতে অহংকার জেগে থাকে না, অবিদ্যায় তা লীন হয়ে যায়। সুষুপ্তিতে অহংকার না থাকলেও জীবের আত্মস্বরূপ কিন্তু থাকে। জীবের স্বরূপ অশরীরী। ভগবান যেমন

অব্যক্ত [১], তেমনই তাঁর অংশ হওয়ায় জীবও স্বরূপগতভাবে অব্যক্ত (নিরাকার)। অব্যক্তমূর্তির অংশও অব্যক্তমূর্তিই হয়। এই শরীর তো ভোগায়তন (ভোগের ক্ষেত্র)। মানুষ যেমন রান্না ঘরে বসে ভোজন করে, সেই রকমই দেহে অবস্থিত থেকে সে কর্মফল ভোগ করে। এইজন্য সাধকের এই কথাটি খুব ভালো করে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন যে, তার **আত্ম-স্বরূপ অব্যক্ত নিরাকার-রূপী, মনুষ্যরূপী নয়। সাধনাকারী যিনি, তিনি দেহ নন**। এইজন্যই মানুষ বলে যে, 'আমি বাল্যকালে যে ছিলাম, আজও সেই আছি। বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত আমার শরীরে এত রূপান্তর হয়েছে, কিন্তু আমি সে-ই একই আছি। বাল্যকালে যে আমি খেলাধুলো করতাম, তারপরে লেখাপড়া করতাম—সেই আমি আজও আছি।' শরীর কিন্তু একরকম থাকেনি। শরীরও কোনক্ষণেই এক থাকে না, সর্বদাই তা পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। সাধক হলো পরিবর্তনহীন সত্তা, পরিবর্তনশীল শরীর সাধক নয়।

সাধক যদি যোগভ্রষ্ট হয়ে যান তাহলে তিনি পরের জন্মে কোন সদাচারসম্পন্ন ধনী পরিবারে কিংবা যোগীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। শরীর তো মৃত হয়, তার দাহ করা হয়, তাহলে সদাচারসম্পন্ন ধনী পরিবারে বা যোগী গৃহে জন্ম নেয় কে ? সেই সত্তাই জন্ম নেয় যা শরীর থেকে পৃথক। এইজন্য এই কথা দৃঢ়ভাবে মেনে নেওয়া প্রয়োজন যে, 'আমি শরীর নয়, কিন্তু শরীরের জ্ঞাতা', এই কথা স্বীকার না করলে সাধন ঠিকভাবে এগোবে না, সৎসঙ্গের আলোচনাও যথাযথ বোধগম্য হবে না।

শরীর তো প্রতি ক্ষণেই পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, কিন্তু 'মহাসর্গ' ও 'মহাপ্রলয়' হলেও আত্মস্বরূপে কোন পরিবর্তন হতে পারে

---

[১]ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা। (গীতা ৯।৪)
'এই সমগ্র জগৎ আমার নিরাকার স্বরূপের দ্বারা ব্যাপ্ত।'

না, বস্তুত তা যেমন ছিল ঠিক সেই একই রকম থেকে যায়—**'সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ'** (গীতা ১৪।২)।

জীব বর্তমান কাল পর্যন্ত বহু শরীর ধারণ করেছে, কিন্তু সব কটি শরীরই ত্যক্ত হয়ে গেছে, জীব সেই একই আছে। শরীর তো এখানেই শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু জীব স্বর্গ বা নরকে যাবে, তার মুক্তি হবে, ভগবদ্ধামে পৌঁছবে। অর্থাৎ, জীবের সত্তা (স্বরূপ) শরীরের অধীন নয়। সুতরাং শরীরের থাকা বা না থাকায় তার অস্তিত্বে কোন পার্থক্য হয় না। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তথা অনন্ত জগৎ আছে, কিন্তু ওইগুলির দ্বারা সামান্যতম ভাবেও আত্মসত্তার কিছু যায়-আসে না। এগুলির কেশাগ্র পরিমাণ প্রভাবও আত্মসত্তায় পৌঁছতে পারে না। এই সমস্তই যেতে পারে বুদ্ধি-মনের ক্ষেত্র অবধি। প্রকৃতির কার্য মন-বুদ্ধিকে পেরিয়ে যেতে পারে না। এইজন্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কেশাগ্র পরিমাণেও কোন কিছুই জীবের (স্বরূপের) নিজের নয়। জীবের নিজের হলো পরমাত্মা, আর জীব হলো পরমাত্মার। সাধন করে জীবই পরমাত্মা প্রাপ্ত হবে, জীবের শরীর পরমাত্মাকে পাবে না। এইজন্য সাধনকালে মনে রাখতে হয় যে, জীবাত্মা নিরাকার, সাকার (শরীর) নয়। কেউ কোন গৃহে উপবিষ্ট হলে, সে গৃহ হয়ে যায় না। সে এবং গৃহ ভিন্ন ভিন্নই থাকে। গৃহ ছেড়ে সে চলে গেলে, তফাতটা হবে জীবের দশার, গৃহের নয়। এইরকমই শরীর এইখানেই থেকে যাবে, জীব শরীর ত্যাগ করে চলে যাবে। পাপ-পুণ্যের ফল জীবই ভোগ করে, শরীর নয়। মুক্তি হয় জীবেরই, শরীরের নয়। শরীর তো মাটিতে মিশে যাবে, কিন্তু জীব তা হবে না। গীতায় জীবের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে—

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥

(২।২৪-২৫)

'এই শরীরীকে ছেদন করা যায় না, দাহ করা যায় না, সিক্ত করা যায় না, শুষ্ক করাও যায় না, কারণ এটি নিত্য বিদ্যমান, সর্বত্র পরিপূর্ণ, নিশ্চল, স্থির স্বভাব বিশিষ্ট এবং অনাদি।'

'এই দেহী প্রত্যক্ষ হয় না, এটি অচিন্ত্যনীয় তথা নির্বিকার রূপে স্থিত। সুতরাং এই দেহীকে এইভাবে জেনে, আর শোক করা উচিত নয়।'

প্রত্যেক মানুষ চায় যে, তার কখনো মৃত্যু না হয়, সে সব কিছু জেনে যায় এবং সর্বদা সুখী থাকে। এই তিনটি মূলত সৎ, চিৎ ও আনন্দের ইচ্ছা। কিন্তু বাস্তবিক এই (স্বরূপভিত্তিক) ইচ্ছাকে সে চায় শরীরের সহায়তায় পূরণ করতে, কারণ সে পরমাত্মার অংশ হওয়া সত্ত্বেও শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিকে নিজের বলে মনে করে।[১] **কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষ আপন (নিত্য) স্বরূপাশ্রয় ইচ্ছাকে (অনিত্য) শরীর বা জগতের সহায়তায় পূরণ করতেই পারে না**। কারণ শরীর বিনাশশীল, এইজন্য সেটির দ্বারা কেউ মৃত্যু থেকে রেহাই পেতে পারে না। শরীর তো জড়, তাই এটির দ্বারা কখনো জ্ঞান হতে পারে না। শরীর প্রতিক্ষণে পরিবর্তনশীল, তাই কেউ এটির দ্বারা সুখী হতে পারে না। এইজন্য, **মানুষের মধ্যে যে সৎ-চিৎ-আনন্দ প্রাপ্তির ইচ্ছা, তার পূরণ সে শরীরে অসঙ্গ (সম্বন্ধহীন) হলে তবেই হতে পারে**। এই বাস্তবিক ইচ্ছা-পূরণে শরীর বিন্দুমাত্রও বাধক বা সহায়ক নয় কিন্তু এই শরীরগত সম্বন্ধই হলো বাধক। এইজন্য শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হলে তবেই সাধক ক্রিয়া ও পদার্থ থেকে অসঙ্গ হয়ে যায়। ক্রিয়া ও পদার্থ—এই দুটিই প্রকৃতির ব্যাপার। ক্রিয়া ও পদার্থ থেকে অসঙ্গ হয়ে গেলে সাধকের স্বরূপধর্মী ইচ্ছা পূরণ হয়ে যায়। এই স্বরূপধর্মী ইচ্ছা পূর্ণ হলে সাধকের স্থিতি হয়ে যায় আপন সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপে। স্বরূপে স্থিত হলেই

[১]মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥ (গীতা ১৫।৭)

লৌকিক সাধনায় (কর্মযোগে ও জ্ঞানযোগে) সিদ্ধি হয়ে যায়। তখন, স্বরূপ যাঁর অংশ সেই পরমাত্মাকে নিজের বলে মেনে নিয়ে তাঁর শরণাগত হলে অলৌকিক সাধনায় (ভক্তিযোগে) সিদ্ধি লাভ হয়। অর্থাৎ 'পরম প্রেমে'র প্রাপ্তি ঘটে। পরম প্রেমের প্রাপ্তিতেই মনুষ্য জন্মের পূর্ণতা।[১] এই কারণে, **সাধকের প্রথম থেকেই এই সত্যটি স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন যে, 'আমি শরীর নয়', 'শরীর আমার নয়' এবং 'শরীর আমার জন্য নয়'**, কারণ জীব হলো পরা-প্রকৃতি (চেতন), যা পরমাত্মার অংশ আর শরীর ও জগৎ হলো অপরা-প্রকৃতি (জড়)। অপরা প্রকৃতি নিজের সম্পূর্ণ শক্তি ব্যবহার করেও জীবের স্বরূপ-সম্বন্ধিত ইচ্ছাকে পূরণ করতে পারে না, অর্থাৎ জীবকে অমর করতে পারে না, জীবের অজ্ঞানতা নাশ করতে পারে না এবং জীবকে নিত্যসুখী করতে পারে না।

প্রশ্ন—সৎসঙ্গে এই রকম আলোচনা শোনার পরও যখন জাগতিক কর্ম করতে যাই, তখন সেই ইচ্ছা-অনিচ্ছার মধ্যে আটকে যাই। তাহলে উপায়টা কী ?

উত্তর—জাগতিক কর্মে ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বন্দ্বে পড়া তো বালকসুলভ ভাব। ছেলেরা যখন খেলে, তারা মাটির ঢেলা একত্র করে পাহাড়, বাড়ি ইত্যাদি অনেকরকম জিনিস তৈরি করে এবং জমিতে সীমারেখা টেনে দিয়ে কোন ছেলে বলে 'এই পর্যন্ত আমার', 'ওই দিকটা তোমার'। অন্য ছেলে তারটা দখল করলে, আগের জন কলহ শুরু করে এই বলে যে, 'তুমি আমার জায়গা নিলে কেন ?' 'এটা তোমার না, আমার' যখন বয়স্ক কেউ এসে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা মারামারি করছো কেন ?' তখন প্রথম ছেলেটি বলে 'আমি আগে দাগ টেনেছি, তাই জায়গাটা আমার।' সেই বয়স্ক লোকটি তাদের কথা শুনে যখন কলহের মীমাংসা

---

[১]লৌকিক সাধনার সিদ্ধিতে অহং-এর সূক্ষ্ম রেশ থেকে যেতে পারে, কিন্তু অলৌকিক সাধনার সিদ্ধিতে অহং-এর সূক্ষ্ম রেশ পর্যন্ত থাকে না।

করে দেন, তারা রাজি হয়ে যায়। এরই মধ্যে তাদের মা যখন বলেন 'বাচ্চারা, এসো খাবার সময় হয়েছে' সে কথা শুনে ছেলেরা তাড়াতাড়ি খেলা ছেড়ে উঠে চলে যায় ; তখন আর খেলাটির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক থাকে না। এইরকমই মানুষ বলে থাকে এই ধন-সম্পদ আমার, এই জমি আমার ইত্যাদি। বস্তুত ওইগুলি তারও না, অন্য কারোরও না। এটি তো একটা খেলা, তামাশা। একদিন ধন-সম্পদ, জমি সব কিছু ছেড়ে চলে যেতে হবে, এইগুলির কথা স্মরণেও থাকবে না। কোন **মানুষের পূর্বজন্মে কোথায় ঘর ছিল, কিংবা কে তার আত্মীয় ছিল, এ সব কি তার মনে আছে** ? এই জগতের কোন কিছুই ব্যক্তিগত নয়। ধর্মশালা যেমন সকলেরই জন্য, এইরকমই জগৎ হলো সবার জন্য। সেইজন্য গৃহ এখানেই থেকে যায়, জমিও থেকে যায় এখানেই, কিন্তু মানুষ পাল্টাতেই থাকে। এই আলোচনার প্রতি নজর করা প্রয়োজন, কারণ যারা সৎসঙ্গ করে তাদের যদি এই কথাগুলির দিকে মনোযোগ না যায়, তাহলে কাদের যাবে ? কেউ যদি সৎসঙ্গও করে আবার তার অনুরাগ-বিদ্বেষের সক্রিয়তায়ও থাকে, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সে সৎসঙ্গ করেইনি, সেখানকার আলোচনাও শোনেনি, বোঝেনি, তার ওপর সৎসঙ্গের কোন প্রভাবই পড়েনি। সৎসঙ্গ করেও যদি অনুরাগ-বিদ্বেষ, কাম-ক্রোধ না কমে, তাহলে আর কিসে কমবে ? সৎসঙ্গে যোগদানকারীর স্বভাবে, আবরণে যদি উন্নতি না হয় তাহলে সে কীরকম সৎসঙ্গ করেছে ? শুধু সময় নষ্ট করেছে। **সৎসঙ্গও করবে কিন্তু চরিত্রের দশা পাল্টাবে না, এইরকম তো হতে পারে না**। সৎসঙ্গ করলে চরিত্রের পরিবর্তন হবেই। তা যদি না হয়, তো বলতে হবে সৎসঙ্গ হয়ই-নি। প্রকৃত সৎসঙ্গ ঘটলে মানুষের স্বভাব-চরিত্রে রূপান্তর না হয়েই পারে না।

~~○~~

কল্যাণপ্রাপ্তির নিশ্চিত উপায়

ভগবান জীবের প্রতি কৃপা করে তার নিজের কল্যাণ সাধনের জন্য মনুষ্য-শরীর দিয়েছেন। নিজের কল্যাণ সাধন করা ছাড়া মনুষ্যজন্মের দ্বিতীয় কোন প্রয়োজনই নেই। শরীর, ধন-সম্পদ, জমি-বাড়ি, স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদি যা কিছু জাগতিক বিষয় আছে তার সমস্তই যেমন লাভ হয় তেমনই তা হারাতেও হয়। তাই যে যতই ধনী হয়ে উঠুক, বলশালী হয়ে উঠুক, বিদ্বানে পরিণত হোক, উচ্চপদস্থ কর্মী হোক, কিংবা বহু আত্মীয়-স্বজনসম্পন্ন হোক, প্রকৃত কল্যাণ না হলে এসব কোন কিছুই আসলে কাজে লাগবে না । বর বিনা বরযাত্রী-দলের মতো সমস্ত সাংসারিক ভোগ ব্যর্থ। এই জন্য মানুষের আসল কর্তব্য হলো—নিজের কল্যাণ সাধন করা।

এই কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, **নিজের কল্যাণ সাধনে মানুষমাত্রই সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র, সমর্থ, যোগ্য তথা অধিকারী**। কারণ ভগবান জীবকে মনুষ্যশরীর দিলে তার সাথে সেই জীব যাতে নিজের কল্যাণে সচেষ্ট হতে পারে তার জন্য তাকে স্বাতন্ত্র্য, সামর্থ্য, যোগ্যতা তথা অধিকারও দিয়ে দেন।

এখন প্রশ্ন হলো মানুষ নিজের কল্যাণের জন্য কী করবে ? এর উত্তর হলো, মানুষ যদি নিম্নোক্ত চারটি কথা দৃঢ়ভাবে মেনে নেয় তাহলে তার কল্যাণ হবেই—

১. আমার কিছুই নেই।

২. আমার কিছুই চাই না।

৩. আমার কারোর সঙ্গে বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ নেই।

৪. কেবল ভগবানই আমার।

যেসব বিষয়ের প্রাপ্তি হলেও বিচ্ছেদও অবশ্যম্ভাবী, এমন কিছুকে নিজের বলে মনে করাটাই মূল দোষ, যা থেকে অন্য সমস্ত দোষগুলির উৎপত্তি হয়। প্রকৃতপক্ষে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষুদ্রতম বস্তুটি পর্যন্ত

নিজের নয়। এই কারণেই 'আমার কিছুই নেই'—এই কথা মেনে নিলে জীবনে নির্দোষ নির্মল ভাব জেগে ওঠে। এই ভাবটি এলেই মানুষ ধর্মাত্মা পদবাচ্য হয়ে যায়।

আমার যখন কিছু নেই-ই, তাহলে আর আমি কোন্ বস্তুর চাহিদা রাখবো ? সুতরাং 'আমার কিছুই চাই না'—এই কথা মেনে নিলেই জীবনে নিষ্কামভাব এসে যাবে। নিষ্কাম ভাব এলেই মানুষ যোগী হয়ে যায় অর্থাৎ তার সমত্বরূপে যোগ-প্রাপ্তি হয়ে যায়—**'সমত্বং যোগ উচ্যতে'** (গীতা ২।৪৮)। কোনরকম কামনা না থাকলে জীবের চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগ-প্রাপ্তি হয়ে যায়—**'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'** (যোগদর্শন ১।২)।

মানুষ মাত্রেরই স্বরূপ হলো স্বাভাবিকভাবেই অসঙ্গ—**'অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ'** (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৩।১৫)। সুতরাং প্রাপ্তি ও বিচ্ছেদ দুই-ই অবধারিত বলে কোন বস্তু বা ব্যক্তির সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ স্বীকার না করে যদি কেউ থাকতে পারে, তবে সে নিজের স্বরূপের অসঙ্গতা অনুভব করার ফলে জ্ঞানী হয়ে যাবে।

জীবমাত্রেই পরমাত্মার অংশ—**'মমৈবাংশো জীবলোকে'** (গীতা ১৫।৭)। আমি ভগবানের অংশ হওয়ার ফলে কেবল ভগবানই আমার নিজের। ভগবান ছাড়া আর কেউ আমার নয়। এইভাবে ভগবানকে আপনবোধে মেনে নিলেই মানুষ যথার্থ ভক্ত হয়ে যায়।

ধর্মাত্মা, যোগী, জ্ঞানী ও ভক্ত হওয়ার মধ্যেই মানুষের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত আছে। এই হওয়ায় কাঠিন্যও নেই, কারণ প্রকৃতপক্ষে মানুষমাত্রেরই স্বরূপ হলো নির্দোষ, নিষ্কাম, অসঙ্গ এবং ভগবানের অংশ। অর্থাৎ **আমাদের স্বরূপ হলো অস্তিত্বমাত্র (সত্তা)। এই অস্তিত্বে বা সত্তায় নির্দোষতা, নিষ্কামতা ও অসঙ্গতা স্বতঃসিদ্ধ এবং এই সত্তা হলো ভগবানের অংশ।** এইজন্য সাধকের কর্তব্য হলো পূর্বোক্ত চারটি কথাকে দৃঢ়ভাবে স্বীকার করে নেওয়া। তাহলে তার কল্যাণ একেবারে সুনিশ্চিত।

~~০~~

নিত্যপ্রাপ্তকে প্রাপ্তি

ভগবান জীবকে মানব-শরীর দিয়েছেন যাতে সে নিজের কল্যাণসাধন করতে পারে। এই দৃষ্টিতে মানব-প্রজাতি প্রকৃতপক্ষে সাধন-প্রজাতি। সাধন-প্রজাতি হওয়ায় মানুষ মাত্রই নিজের কল্যাণ সাধন করতে পারে, জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। কেন পারে ? কারণ প্রকৃত বিচারে সে মুক্তই। এইজন্য **সাধকের সবার আগে এই সত্যটিকে দৃঢ়ভাবে স্বীকার করে নেওয়া উচিত যে, আমি অবশ্যই মুক্ত হতে পারি। কেন পারি ? কারণ আমি মুক্ত আছিই।** আমি পরমাত্মাকে লাভ করতে পারি। কেন পারি ? কারণ পরমাত্মাকে আমি পেয়েই আছি। যিনি সব স্থানে, সব কালে, সর্বদা আছেন, সকল মানুষের মধ্যে আছেন, সব বস্তুতে, সব অবস্থায়, সব ঘটনায়, সব পরিস্থিতিতে নিত্য বর্তমান, সেই পরমাত্মা কি কখনো আমার থেকে আলাদা হতে পারেন ? **পরমাত্মা যেমন আমার থেকে কখনো আলাদা হতে পারেন না, সেরকমই শরীরের সঙ্গেও আমার কখনো মিলনও হতে পারে না।** এখন পর্যন্ত আমি বহু প্রজাতিতে জন্মগ্রহণ করেছি, বহু শরীর ধারণ করেছি, কিন্তু কোন শরীরই আমার সঙ্গে থেকে যায়নি, অথচ আমি স্বয়ং যেমন তেমনই রয়ে গেছি। তাই সাধককে এই সত্যটি স্বীকার করে নিতে হবে যে, পরমাত্মার সঙ্গে আমার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য এবং সংসারের সাথে শরীরের সম্পর্কও অবিচ্ছেদ্য। এই কারণে **আমি শরীরের দ্বারা নিজের জন্য কিছুই করতে পারি না।** শরীর দ্বারা যে কাজই করি না কেন তা সংসারেরই প্রয়োজনের কাজ হবে, আমার নয়। ক্রিয়ামাত্রেরই সম্বন্ধ জগৎ-সংসারকে নিয়েই। **আমার স্বরূপ নিষ্ক্রিয়।** যদি আমি কোন ক্রিয়াই না করি, তাহলে শরীরের প্রয়োজনটা কী ?

এখন সাধককে বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, আমি যখন শরীর দ্বারা নিজের জন্য কিছুই করতে পারি না, যা কিছু করতে পারি শুধু

সংসারের জন্যই, তাহলে আমার নিজের জন্য আমি কী করতে পারি ? কেমন ভাবেই বা পারি ? বিচার করলে বোঝা যায় যে, আমি নিজের জন্য নিজের দ্বারা নিষ্কাম হতে পারি। কেন হতে পারি ? কারণ **'আমি' নিষ্কাম**। আমি নিজের জন্য মমতাহীন হতে পারি। কেন হতে পারি ? **কারণ 'আমি' মমতাশূণ্য**। আমি নিজের জন্য নিরহংকার হতে পারি। কেন হতে পারি ? কারণ **আমি অহংকারশূণ্য**। গীতায় ভগবানও আমাদের নিষ্কাম, নির্মম (মমতাশূণ্য) ও **নিরহংকার** হওয়ার জন্য বলেছেন[১]। কেন বলেছেন ? কারণ **'আমি' স্বরূপত নিষ্কাম, নির্মম, তথা অহংকারশূণ্য আছিই**।

আমি নিজেই ভগবানকে নিজের বলে মেনে নিতে পারি। কেন পারি ? কারণ ভগবান আমার আপন, নিজের। দ্বিতীয় কেউই আপন তো নয়ই, হতেও পারে না। আমি নিজের দ্বারাই সাংসারিকতা থেকে পৃথক হয়ে যেতে পারি। কেন পারি ? কারণ **আমি সংসার থেকে তো পৃথক সত্তাই**—'অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৩।১৫)। এর তাৎপর্য হলো, **আমি নিজের জন্য নিষ্কাম, নির্মম, নিরহংকার হতে পারি এবং তা এখনই হওয়া সম্ভব। এইরকম হওয়ার জন্য শরীরের আবশ্যকতা নেই, বস্তুত নিজের দ্বারাই তা সম্ভব। 'পরিশ্রম ও পরাশ্রয়' ছেড়ে দিয়ে আমি আত্মিক ভাবেই 'বিশ্রাম ও ভগবদাশ্রয়' পেতে পারি**। এই ব্যাপারে আমি পরাধীন নই, বস্তুত সর্বতোভাবেই স্বাধীন।

শরীরের সাথে আমার কখনোই সম্বন্ধ ছিল না, এখনো নেই, পরেও হবে না, প্রকৃতপক্ষে হওয়া সম্ভবই নয়। যদিও শরীরের দ্বারা আমি 'ভোজন' করতে পারি বটে কিন্তু 'ভজন' করতে পারি না। শরীরের দ্বারা সেবাও করতে পারি না, কিন্তু শরীরের থেকে আলাদা হয়ে করতে পারি ! কেমন করে করতে পারি ? নিজেকে দোষমুক্ত রেখে করতে

---

[১]বিহায় কামান্যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ (গীতা ২।৭১)

পারি। কেন পারি ? কারণ **আমি দোষশূন্য—'চেতন অমল সহজ সুখরাসী॥'** (শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ১১৭।২)। আমি নিজের দ্বারাই ভজনও করতে পারি। কেমনভাবে পারি ? ভগবানকে ভালোবেসেই তা করতে পারি। কেন করতে পারি ? কারণ **তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হলো ভালোবাসার**। শরীরের দ্বারা আমি সেবা ও ভালোবাসার চর্চা তো করতে পারি কিন্তু সেবা ও ভালবাসতে পারি না।

সংসার থেকে পাওয়া শরীর-ইন্দ্রিয়সমূহ-মন-বুদ্ধির দ্বারা আমি সংসারকেই লাভ করতে পারি কিন্তু পরমাত্মাকে পেতে পারি না। পরমাত্মাকে না যায় শরীর দিয়ে ধরা, না যায় ইন্দ্রিয়সমূহ বা মন কিংবা বুদ্ধি দিয়ে ধরা। **যদি এইগুলির দ্বারা পরমাত্মাকে ধরা যেত তাহলে তো কোন যন্ত্রের সাহায্যেও তাঁকে ধরা যেত** । এইজন্যই যদি সাধক পরমাত্মাকে লাভ করতে চান তাহলে তাঁর দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির আশ্রয় ত্যাগ করতে হবে, ক্রিয়ার আশ্রয়ও ত্যাগ করতে হবে। এই দেহাদি জড় বস্তুর দ্বারা পরমাত্মপ্রাপ্তি সম্ভব নয়, এগুলিকে ত্যাগের (সম্বন্ধ-বিচ্ছেদের) দ্বারাই তা সম্ভব। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিকে অন্যদের হিতে (সেবায়) ব্যবহার করে নিশ্চয়ই 'ভালোমানুষ' হওয়া যায়, কিন্তু ভগবৎ-প্রেমিক হওয়া যায় না। অথচ তা হওয়া যায় নিজের দ্বারাই অর্থাৎ আত্মিকভাবেই। এর দ্বারা এইটিই প্রতিপন্ন হয় যে, পরমাত্মাকে পেতে হলে, তাঁর অনুরাগী হতে গেলে শরীরের তো নয়-ই—ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিরও আবশ্যকতা নেই। শরীরের দ্বারা যে বস্তু পাওয়া যায় তা সকলে নাও পেতে পারেন, কিন্তু নিজে থেকে প্রাপ্তব্য বস্তু (পরমাত্মা) সকলেই পেতে পারেন। যা কেউ পেতে পারে, আবার কেউ পারে না, সেটি পরমাত্মা নয়। **তিনিই পরমাত্মা পদবাচ্য, যা সবার পক্ষেই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। কেন পাওয়া সম্ভব ? কারণ তিনি প্রাপ্ত হয়েই আছেন।** পরমাত্মা ব্যতীত আর কিছু যখন নেই-ই, তাহলে আর সেই পরমাত্মা অপ্রাপ্ত থাকেন কী করে ?

~~~○~~~
~~~

ভগবানকে আজই পাওয়া যেতে পারে

পরমাত্মাপ্রাপ্তি খুবই সহজ। **আর কোন কাজ এত সহজ নয়।** কিন্তু কেবল পরমাত্মার জন্যই যেন আকাঙ্ক্ষা থাকে, তার সঙ্গে অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা যেন না থাকে। তার কারণ পরমাত্মার সমান আর কিছু নেই।[১] পরমাত্মা যেমন অনন্য, তেমনই তাঁর জন্য আকাঙ্ক্ষাকেও অনন্য হতে হবে। সাংসারিক ভোগপ্রাপ্তির জন্য তিনটি জিনিস জরুরি—ইচ্ছা, উদ্যোগ এবং ভাগ্য। প্রথমে সাংসারিক বস্তু পাওয়ার জন্য ইচ্ছা থাকতে হবে। তারপর তার জন্য কাজ করতে হবে। কাজ করার পরেও তাকে তখনই পাওয়া যাবে যখন সেটিকে পাওয়ার ভাগ্য থাকবে। যদি ভাগ্যে না থাকে তাহলে ইচ্ছা থাকলেও এবং কর্ম করলেও সেই বস্তু পাওয়া যাবে না। তাই লাভের জন্য উদ্যোগ করলেও লোকসান হয়ে যায়। কিন্তু **পরমাত্মার প্রাপ্তি কেবল ইচ্ছাতেই সিদ্ধ হয়। তাতে উদ্যোগ এবং ভাগ্যের প্রয়োজন নেই।** পরমাত্মাকে পাওয়ার পথে কখনো ক্ষতি হয় না, কেবল লাভই হয়ে থাকে।

এক পরমাত্মা ছাড়া আর কোন জিনিস কেবল ইচ্ছা হলেই পাওয়া যায় না। তার কারণ হলো এই যে, মনুষ্য-শরীর পরমাত্মাপ্রাপ্তির জন্যই পাওয়া গিয়েছে। তাঁকে প্রাপ্ত করবার উদ্দেশ্য রেখেই ভগবান আমাদের মনুষ্যশরীর প্রদান করেছেন। দ্বিতীয় কথা, ভগবান সর্বত্র বিরাজমান। সূচ্যগ্র পরিমাণ স্থানও ভগবান থেকে রিক্ত নয়। সেজন্য তাঁকে পেতে উদ্যোগ এবং ভাগ্যের কোন প্রয়োজন নেই। কর্মের দ্বারা সেই জিনিসই

---

[১]ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥

(গীতা ১১।৪৩)

'হে অনন্ত প্রভাবশালী ভগবান ! এই ত্রিলোকে কেউই আপনার সমান নয়, তাহলে আপনার অপেক্ষা বড় কী করে হতে পারে !'

পাওয়া যায় যা বিনাশশীল। অবিনাশী পরমাত্মা কর্মের দ্বারা প্রাপ্ত হন না, কেবল তীব্র ইচ্ছাতেই তাঁকে পাওয়া যায়।

পুরুষই হোক অথবা নারী, সাধু হোক অথবা গৃহস্থ, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, বালক-যুবা যাই হোক, যে যেমনই হোক—সকলেই শুধু ইচ্ছার দ্বারা পরমাত্মাকে পেতে পারে। পরমাত্মাকে ছাড়া বাঁচা, মরা, ভোগ করবার, সংগ্রহ করবার কোন ইচ্ছাই যেন না থাকে। বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা না থাকলে বস্তু অবিদ্যমান হয়ে যাবে না। **আমাদের ভাগ্যে যা আছে তা আমরা পাবই**। আমাদের ভাগ্যে যা আছে তা অন্য কেউ নিতে পারে না—'**যদস্মদীয়ং ন হি তৎপরেষাম্**'। আমাদের ব্যাধি অন্যের হবে কি করে ? তেমনই আমাদের ভাগ্যে যদি ধন লেখা থাকে, তাহলে তা অবশ্যই আমরা পাব। কিন্তু **পরমাত্মার প্রাপ্তিতে ভাগ্যের কোন সম্বন্ধ নেই**।

কোন মূল্য দিয়ে ভগবানকে পাওয়া যায় না। মূল্য দিয়ে সেই জিনিসই পাওয়া যায় যা মূল্যের চেয়ে কম দামি। বাজারে কোন জিনিসের জন্য যত টাকা লাগে, সেই বস্তু তত টাকার হয় না। আমাদের কাছে এমন কোন জিনিস (কর্ম এবং পদার্থ) নেই যার দ্বারা পরমাত্মাকে পাওয়া যেতে পারে। সেই পরমাত্মা অদ্বিতীয়, সদৈব, সর্বসমর্থ, সদা এবং সর্বত্র বিদ্যমান। তিনি আমাদের এবং আমাদের মধ্যে আছেন—'**সর্বস্ব চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ**' (গীতা ১৫।১৫), '**ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি**' (গীতা ১৮।৬১)। তিনি আমাদের থেকে দূরে নেই। আমরা যদি চুরাশি লক্ষ প্রজাতিতে পতিত হই তাহলেও ভগবান আমাদের হৃদয়ে থাকবেন। স্বর্গ কিংবা নরকেও যদি গমন করি, তাহলেও তিনি আমাদের হৃদয়ে থাকবেন। যদি পশু-পক্ষী অথবা বৃক্ষাদি হয়ে যাই তাহলেও তিনি আমাদের হৃদয়ে থাকবেন। যদি দেবতা হয়ে যাই তাহলেও তিনি আমাদের হৃদয়ে থাকবেন। তত্ত্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত হবার পরেও তিনি আমাদের হৃদয়ে থাকবেন। যদি খুবই দুষ্ট, পাপী,

অন্যায়কারী হয়ে যাই তাহলেও সেই ভগবান আমাদের হৃদয়ে থাকবেন। **এইভাবে সকলের হৃদয়ে অবস্থানকারী ভগবানকে পাওয়া কি কঠিন ?** কিন্তু বাঁচার ইচ্ছা, মানের ইচ্ছা, খ্যাতির ইচ্ছা, সুখ, ভোগ প্রভৃতি নানা রকম ইচ্ছা সঙ্গে থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। কেননা ভগবানের সমতুল্য কেবল ভগবানই। তাঁর সমান কেউ ছিল না, কেউ নেই, কেউ হবেও না, হতে পারেও না, তাহলে তাঁকে কেমন করে পাওয়া যাবে ? কেবল ভগবানের জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকলেই তাঁকে পাওয়া যায়। অবিনাশী ভগবানের কাছে বিনাশশীলের কী মূল্য ? বিনাশশীল ক্রিয়া এবং পদার্থের দ্বারা কি তাঁকে পাওয়া যেতে পারে ? পাওয়া যায় না। সাধক যখন ভগবানের সঙ্গে মিলিত না হয়ে থাকতে পারেন না তখন ভগবানও তাঁর সঙ্গে মিলিত না হয়ে থাকতে পারেন না ; কেননা ভগবানের স্বভাব হলো—**'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'** (গীতা ৪।১১) 'যে ভক্ত যেভাবে আমার শরণাগত হয় আমি তাঁকে সেইভাবেই আশ্রয় দিই।'

ধরুন, কোন মশা গরুড়ের কাছে যেতে চায় আর গরুড়ও তার কাছে যেতে চান। তাহলে মশা গরুড়ের কাছে যেতে পারবে নাকি গরুড় তার কাছে পৌঁছবেন ? গরুড়ের সঙ্গে মিলিত হতে মশার শক্তি কোন কাজে আসবে না। এতে তো গরুড়ের শক্তিই কাজ করবে। তেমনই পরমাত্মাপ্রাপ্তির যদি ইচ্ছা হয় তাহলে পরমাত্মার শক্তিই কাজ করবে। এতে আমাদের শক্তি, আমাদের কর্ম, আমাদের ভাগ্য কাজ করবে না, কাজ করবে আমাদের আকাঙ্ক্ষাই। আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই।

আমরা তো ভগবানের কাছে পৌঁছতে পারি না, তাহলে ভগবানও কি আমাদের কাছে পৌঁছতে পারবেন না ? আমরা যত জোরই দিই না কেন ভগবানের কাছে পৌঁছতে পারব না। কিন্তু ভগবান তো আমাদের হৃদয়ে বিদ্যমান। আমরা ভগবানকে দূরস্থ বলে মনে করি, সেজন্যই

ভগবান আমাদের থেকে দূরে থাকেন। দ্রৌপদী ভগবানকে **'গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্'** বলে ডেকেছিলেন। সেজন্য ভগবানকে দ্বারকা হয়ে আসতে হয়েছিল। তিনি যদি এখানেই প্রকট হতে বলতেন, তাহলে ভগবান তৎক্ষণাৎ প্রকট হতেন ! **যদি আমরা মনে করি যে ভগবানকে এখন পাওয়া যাবে না তাহলে তাঁকে পাওয়া যাবে না,** কেননা আমরা **অবগুণ্ঠন টেনে দিয়েছি।**

গোরক্ষপুরের একটি ঘটনা। ২০০০ সংবতের (তদনুসারে বাংলা ১৩৫০ সাল) শুরুর কথা। আমি সৎসঙ্গের আয়োজনে সেখানে গিয়েছিলাম। সেবারাম নামে এক ব্যক্তি ব্যাঙ্কে কাজ করতেন। একদিন আমি সৎসঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলাম যে, আপনাদের যদি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে আজই ভগবানকে পাবেন, তাহলে তাঁকে আজকেই পেয়ে যাবেন। এই কথাটি সেই ব্যাঙ্ককর্মীর ভালো লেগেছিল। তিনি ভাবলেন যে তাঁকে সেইদিনই ভগবানকে পেতে হবে। তিনি ফুলের মালা, চন্দন নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলেন যে ভগবান এলে তাঁকে মালা পরাবেন, চন্দন পরাবেন। তিনি ঘর বন্ধ করে একান্তে ভগবানের আগমনের প্রতীক্ষায় বসে থাকলেন। যথাসময়ে ভগবানের আসবার সম্ভাবনাও দেখা গেল, সুগন্ধ আসতে লাগল, কিন্তু ভগবান প্রকট হলেন না। পরের দিন তিনি আমাকে বললেন যে 'আজ আপনি আমার বাড়ি ভিক্ষা নেবেন', আমি সে সময়ে মাধুকরী (ভিক্ষা) করতাম। সেদিন তাঁর ঘরে গেলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবানের তো আসবার সম্ভাবনা হয়েছিল, গন্ধও পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু বাধা কী হলো যে তাঁকে পেলাম না ? আমি বলেছিলাম—ভাই তার আমি কী জানি ! কিন্তু আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি যে তোমার মনে কী এমন চিন্তা হয়েছিল যে ভগবানকে এত তাড়াতাড়ি কী করে পাওয়া যাবে ? তিনি বলেছিলেন যে তাঁর মনে এমন চিন্তা হয়েছিল। আমি বলেছিলাম, সে কথাই বাধা দিয়েছে। যদি তোমার মনে হতো যে তুমি ভগবানকে অবশ্যই পাবে,

তাঁকে আসতেই হবে তাহলে তুমি তাঁকে নিশ্চয় পেতে । ভগবানকে এত তাড়াতাড়ি কীকরে পাওয়া যাবে—এরকম কথা ভেবে তুমি নিজেই বাধা দিয়েছ।

আপনারা যদি ঠিক করে নেন যে ভগবানকে আজই পাওয়া যাবে তাহলে তাঁকে আজই পাওয়া যাবে। কিন্তু মনের মধ্যে এমন সংশয় আসা উচিত নয় যে ভগবানকে এত তাড়াতাড়ি কী করে পাওয়া যেতে পারে ! **আপনাদের কর্ম ভগবানের প্রাপ্তিতে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে না। যদি ভগবান আপনাদের দুষ্কর্মের জন্য, পাপ কর্মের ফলে প্রকট হতে না পারেন তাহলে তিনি দর্শন দিয়েও কী ভালোটা করবেন** ! কিন্তু ভগবান কোন কর্মের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন না। এমন কোন শক্তি নেই যা ভগবান প্রাপ্তিতে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে। তিনি পাপকর্মেও বাধাপ্রাপ্ত হন না, পুণ্যকর্মেও বাধাপ্রাপ্ত হন না। তিনি সকলের কাছে সুলভ। যদি আমাদের পাপকর্ম ঈশ্বর প্রাপ্তিতে অন্তরায় সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় তাহলে তো বুঝতে হবে যে আমাদের পাপকর্ম ভগবানের চেয়েও শক্তিশালী। যদি পাপ প্রবল (বলশালী) হয় তাহলে ভগবানকে পেলেও, তিনি কী মঙ্গল করবেন ? পাপের দ্বারাই যদি তাঁর নৈকট্যে অন্তরায়ের সৃষ্টি হয় তাহলে তাঁকে পেয়েও কী লাভ ? কিন্তু **ভগবান এত দুর্বল নন যে পাপ তাঁকে বাধা দেবে**। তাঁর সমান বলশালী কেউ নেই, কেউ ছিল না, কেউ হবে না এবং কেউ হতে পারে না। আপনাদের যদি তীব্র ইচ্ছা হয় তাহলে আপনারা যেমনই হন, আপনারা ভগবানকে পাবেনই। তাঁকে আসতেই হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। পরমাত্মাকে পাবার জন্যই তো মানবজন্ম লাভ হয়েছে, নইলে জন্তুর সঙ্গে মানুষের তফাত কোথায় ?

খাদতে মোদতে নিত্যং শুনকঃ শূকরঃ খরঃ।
তেষামেষাং কো বিশেষো বৃত্তির্যেষাং তু তাদৃশী॥

সূকর কূকর উঁট খর, বড় পশুঅন মেঁ চার।
তুলসী হরি কী ভগতি বিনু, ঐসে হী নর নার॥

দেবতারা হলেন ভোগযোনি। তাঁরাও ভগবানকে পাবার ইচ্ছা করেন—**'দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ'** (গীতা ১১।৫২)। তাঁরা ভগবানের আকাঙ্ক্ষা তো পোষণ করেন কিন্তু ভোগের ইচ্ছাকে ছাড়েন না। মানুষদেরও এই দশা। আপনারা যদি আন্তরিকভাবে ভগবানকে পেতে চান তবে তাঁকে আসতেই হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনারাই যদি ভগবানের সামীপ্যে বাধা সৃষ্টি করেন তাহলে তাঁকে পাওয়া যাবে না।

গীতাতে পরিষ্কার লিখেছে—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

(৯।৩০-৩১)

'যদি কোন প্রবলতম দুরাচারীও অনন্য ভক্ত হয়ে আমার ভজনা করে তাহলে তাকে সাধু বলেই মানতে হবে। কেননা সে খুব ভালভাবেই একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে।

সে তাৎক্ষণিক (সেই সময়েই) ধর্মাত্মা হয়ে যায় এবং সদা বিরাজমান শান্তি লাভ করে। হে কুন্তীনন্দন ! আমার ভক্তের পতন হয় না—তুমি এরকম বিশ্বাস করে নাও।'

তাৎপর্য হলো এই যে প্রবলতম দুরাচারী মানুষও যদি **'অনন্যভাক্'** হয়ে যায় অর্থাৎ তার যদি ভগবানকে ছাড়া অন্য কিছুর আকাঙ্ক্ষা না থাকে তবে তাকেও সাধু বলে মেনে নিতে হবে ; কেননা সে নিশ্চয় করে নিয়েছে যে সে ভগবানকে অবশ্যই পাবে।

আপনারা কেবল ভগবানকে পাওয়ার ইচ্ছাই রাখুন, আর কোন ইচ্ছা রাখবেন না। বাঁচবার ইচ্ছা করবেন না, মরবার ইচ্ছাও করবেন না। সম্মানের ইচ্ছা, প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা করবেন না। ভোগের ইচ্ছা, অর্থের

ইচ্ছাও করবেন না। যদি কেবল ভগবানের জন্য ইচ্ছা করেন তাহলে তাঁকে পেয়ে যাবেন। অন্তত আমার কথাকে পরীক্ষা করে তো দেখুন ! আপনারা ভগবানকে পান না, কেননা আপনারা তাঁকে চান না। আপনাদের মধ্যে যদি অর্থের জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহলে তার মধ্যে ভগবান কেন লাফিয়ে আসবেন ? **সংসারে সব চেয়ে বাজে জিনিস হলো অর্থ। অর্থের চেয়ে বাজে জিনিস আর কিছু নেই। এমন বাজে জিনিসে যদি আপনাদের মন আটকে থাকে তাহলে ভগবানকে কী করে পাবেন** ? অর্থ দিয়ে আপনারা খাদ্য, বস্ত্র, যানবাহন প্রভৃতি জিনিস কিনতে পারেন। কিন্তু অর্থকে খাওয়া যায় না, পরা যায় না, তাতে করে যাতায়াত করা যায় না। তাৎপর্য হলো **অর্থ নিজে কোন কাজে আসে না, তাকে খরচ করলেই তা কাজে আসে।**

ইচ্ছা করলেই ভগবানকে পাওয়া যায়। তাঁকে আটকবার ক্ষমতা কারও নেই। ছোট্ট শিশু যখন কাঁদে তখন মা তার কাছে চলে আসেন। শিশু বাড়ির কোন কাজ করে না, তার বিপরীত সে আপনাদের কাজ করতে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু সে যখন কাঁদে তখন বাড়ির সকলে তার পক্ষে যোগ দেয়। শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর-ভাসুর সকলেই বলেন—বৌমা, ছেলেটা কাঁদছে, তাকে কোলে করো। মাকে সব কাজ ফেলে তাকে কোলে করতে হয়। শিশুদের কান্নাই হলো তাদের একমাত্র শক্তি—**'বালানাং রোদনং বলম্'**। কান্নার মধ্যে অনেক শক্তি আছে। আপনারা যদি অন্তর থেকে ব্যাকুল হয়ে ভগবানের জন্য কাঁদতে থাকেন তাহলে ভগবানের যত ভক্ত হয়েছেন, সাধু-মহাত্মা হয়েছেন তাঁরা সবাই আপনাদের পক্ষে হয়ে যাবেন এবং ভগবানের কাছে অনুযোগ করবেন যে কেন তিনি আপনাদের দর্শন দিচ্ছেন না ! ভগবানের শ্বশুর-শাশুড়ি তাঁরাই।

বাস্তবে ভগবান সঙ্গেই আছেন। আপনাদের সাংসারিক বাসনাই আপনাদের আটকাচ্ছে। আপনাদের বাসনা রয়েছে অর্থের এবং

ভোগের। ভগবান সেগুলিকে জোর করে ছাড়াতে চান না। আপনারা যদি সাংসারিক বাসনা ত্যাগ করে কেবল ভগবানকেই চান তাহলে আপনাদের কে আটকাতে পারে ? আপনাদের বাধা দেওয়ার শক্তি কারও নেই। ভগবানের জন্য যদি আপনারা ব্যাকুল হন তাহলে ভগবানও ব্যাকুল হয়ে যাবেন। আপনারা যদি সংসারের জন্য ব্যাকুল হয়ে যান তাহলে সংসার ব্যাকুল হবে না। আপনারা যদি সংসারের জন্য কাঁদেন তো তাতে সংসার খুশি হবে না কিন্তু ভগবানের জন্য যদি কাঁদেন তাহলে তিনিও কেঁদে ফেলবেন।

শিশু সত্যি সত্যি কাঁদছে, নাকি মিথ্যা মিথ্যা কাঁদছে তা মা-ই বুঝতে পারেন। ছেলের চোখে জল আসেনি, কেবল এ্যাঁ এ্যাঁ করছে, তাতে মা বুঝতে পারেন যে এ হলো প্রবঞ্চনা। শিশু যদি সত্যিই কাঁদে, তার নিঃশ্বাস জোরে জোরে পড়তে থাকে তাহলে মা সব কাজ ফেলে দিয়ে তাকে তখনই কোলে তুলে নেবেন। যদি মা সেই শিশুর কাছে না যান তাহলে সেই মায়ের মরে যাওয়া উচিত ! তাঁর বেঁচে থেকে কী লাভ ! তেমনই যে অন্তরের সঙ্গে ভগবানকে চায় তাকে যদি ভগবান দর্শন না দেন, তাহলে তেমন ভগবানের মরে যাওয়া উচিত !

এক সাধু ছিলেন। তাঁর কাছে একজন লোক এসে জিজ্ঞাসা করল যে ভগবানকে তাড়াতাড়ি কী করে পাওয়া যাবে ? সাধু বলেছিলেন যে ভগবানের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকলে তাঁকে পাওয়া যাবে। সেই লোকটি প্রশ্ন করেছিল তীব্র আকাঙ্ক্ষা কেমন ? সাধু বলেছিলেন, একমাত্র ভগবান ছাড়া থাকতে না পারা হলো তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সেই লোকটি সে কথা বুঝতে পারল না এবং বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল যে তীব্র বাসনা কেমন ? একদিন সাধু তাকে তাঁর সঙ্গে নদীতে চান করতে যেতে বললেন। দুজনে নদীতে গিয়ে স্নান করতে লাগলেন। সেই লোকটি যখন নদীতে ডুব দিয়েছে তখন সাধু তার ঘাড় ধরে নিচে চেপে রাখলেন। সেই লোকটি জলের ভিতর ছটফট করতে লাগল।

তারপর সাধু তাকে ছেড়ে দিলেন। জল থেকে বেরিয়ে এসে সে বলল, 'তুমি সাধু হয়ে এমন কাজ করলে, আমি তো আজ মরেই যেতাম।' সাধু বললেন 'তোমার কী মনে হচ্ছিল, বলতো ? মা, বাবা, অর্থ অথবা স্ত্রী-পুত্র, কার কথা মনে হচ্ছিল ?' লোকটি বলেছিল 'মহারাজ, আমার তো প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল, তখন কাকে আর মনে পড়বে ?' সাধু বলেছিলেন 'তুমি তো তীব্র বাসনা কেমন তা জানতে চেয়েছিলে ? তার নমুনা তোমাকে দেখালাম। যখন ভগবান ছাড়া আর কিছু মনে আসবে না এবং তাঁকে না পেলে থাকতে পারবে না তখন ভগবানকে পাবে। তখন ভগবান না এসে থাকতে পারবেন না।'

কর্মের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না। কর্মের দ্বারা যে বস্তু পাওয়া যায় তা বিনাশশীল। কর্মের দ্বারা ধন, মান, সম্মান, সৎকার পাওয়া যায়। পরমাত্মা হলেন অবিনাশী। তিনি কর্মের ফল নন, তিনি হলেন আকাঙ্ক্ষার ফল। কিন্তু তাঁকে পাওয়ার পরোয়া তো আপনারা করেন না। তাহলে তাঁকে কেমন করে পাবেন ? ভগবান যেন বলেন যে আমাকে ছাড়াই যখন তোমাদের কাজ চলে যাচ্ছে তখন আমারও তোমাদের ছাড়া চলে যাবে। আমাকে ছাড়া যদি তোমাদের কাজ আটকে যায় তাহলে আমার কাজও তোমাদের জন্য আটকে যাবে। আমাকে ছাড়া যখন তোমরা থাকতে পার তখন তোমাদের ছাড়াও আমি থাকতে পারব।

আপনাদের মধ্যে পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য তীব্র ইচ্ছাই নেই। আপনারা যদি সৎসঙ্গ করেন তাহলে লাভ অবশ্যই হবে। যত সৎসঙ্গ করবেন, চিন্তা-ভাবনা করবেন ততই লাভ হবে—এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু পরমাত্মার প্রাপ্তি তাড়াতাড়ি হবে না। কয়েকটি জন্ম চলে যাবে, তবে তাঁকে পাওয়া যাবে। **যদি তাঁকে পাওয়ার ইচ্ছা খুব তীব্র হয়ে যায় তাহলে ভগবানকে আসতেই হবে**। তিনি তো সব সময় মিলিত হবার জন্য প্রস্তুত ! যে তাঁকে চায়, তার কাছে যদি তিনি না যান তাহলে কার কাছে

যাবেন ? এজন্য হে প্রভু ! হে নাথ ! বলতে বলতে তাঁকে ডাকুন।

সচ্চে হৃদয়সে প্রার্থনা জব ভক্ত সচ্চা গায় হৈ।
তো ভক্তবৎসল কান মেঁ, বহ পহুঁচ ঝট হী জায় হৈ॥

ভক্ত আন্তরিক ভাবে প্রার্থনা করলে ভগবানকে আসতেই হবে। ভগবানকে আটকাবার শক্তি কারও নেই। যার মধ্যে কেবল ভগবানকে পাওয়ার ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোন ইচ্ছা নেই—বাঁচার ইচ্ছা, মরার ইচ্ছা এবং মান, সম্মান, আদর-যত্ন, অর্থ, আত্মীয়-স্বজন কোন ইচ্ছাই যার থাকে না, সে যদি ভগবানকে না পায় তাহলে সে কী পাবে ? আপনি পাপী, না পুণ্যাত্মা, পড়ালেখা জানা, নাকি অশিক্ষিত—এই সব জিনিস ভগবান দেখেন না। তিনি কেবল আপনাদের হৃদয়ের ভাব দেখেন—

রহতি ন প্রভু চিত চূক কিএ কী।
করত সুরতি সয় বার হিএ কী॥

(শ্রীরামচরিতমানস, বালকাণ্ড ২৯।৩)

তিনি হৃদয়ের কথাকে মনে রাখেন, পূর্বকৃত পাপকে মনে রাখেনই না। ভগবানের অন্তঃকরণ এমন যে সেখানে আপনাদের পাপের কোন ছাপই পড়ে না। কেবল আপনাদের অনন্য ব্যাকুলতারই ছাপ পড়ে । ভগবানকে কেমন করে পাব, কেমন করে পাব—এমন অনন্য ব্যাকুলতা যদি হয়ে যায় তাহলে ভগবানকে অবশ্যই পাওয়া যাবে—এতে কোন সন্দেহ নেই। **আপনারা অন্য কোন ইচ্ছা না করে কেবল ভগবানের ইচ্ছা করে দেখুন যে তাঁকে পাওয়া যায় কিনা !** আপনারা যদি এভাবে করে দেখেন, তাহলে আমি ঠিক কথা বলছি কি না তার পরীক্ষাও হয়ে যাবে। আমি তো গীতার শক্তিতে বলছি—**'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'** (৪।১১), 'যে ভক্ত যেভাবে আমার শরণ নেয় আমি তাকে সেইভাবে আশ্রয় প্রদান করি।' ভগবানকে ছাড়া যদি আমাদের শান্তি না হয় তাহলে ভগবানেরও আমাদের ছাড়া শান্তি হবে না। আমরা ভগবানের জন্য যদি কাঁদি তাহলে ভগবানও আমাদের জন্য কাঁদবেন, ভগবানের মতো সুলভ আর কিছু নেই। ভগবান বলেছেন—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

(গীতা ৮।১৪)

'হে পৃথানন্দন ! অনন্য চিন্তাশীল যে মানুষ আমাকে নিত্য-নিরন্তর স্মরণ করে, সেই নিত্য-নিরন্তর আমাতে নিয়োজিত যোগীর কাছে আমি সুলভ অর্থাৎ আমি তাঁকে সহজেই প্রাপ্ত হই।'

ভগবান নিজেকে সুলভ বলেছেন, কিন্তু মহাত্মাকে দুর্লভ বলেছেন—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥

(গীতা ৭।১৯)

'অনেক জন্মের শেষ জন্মে অর্থাৎ মনুষ্যজন্মে সব কিছুই পরমাত্মা'—এইরূপে যে জ্ঞানবান আমার শরণ নেন, সেই মহাত্মা খুবই দুর্লভ।

হরি দুরলভ নহিঁ জগত মেঁ, হরিজন দুর্লভ হোয়।
হরি হৈর্য়াঁ সব জগ মিলৈ, হরিজন কহিঁ এক হোয়॥

'ভগবানের ভক্তকে তো সব জায়গায় পাওয়া যায় না, কিন্তু ভগবানকে সব জায়গায় পাওয়া যায়। ভক্তেরা যেখানে দৃঢ় হয়ে যান ভগবান সেখানেই প্রকট হন'—

আদি অন্ত জন অনঁত কে, সারে কারজ সোয়।
জেহি জিব উর নহচো ধরৈ, তেহি ঢিগ পরগট হোয়॥

প্রহ্লাদের জন্য ভগবান স্তম্ভের মধ্যে প্রকট হয়েছিলেন—

প্রেম বদৌঁ প্রহলাদহিকো,
জিন পাহনতেঁ পরমেস্বরু কাঢ়ে॥

(কবিতাবলী ৭।১২৭)

ভগবান সকলের পরম সুহৃদ। পাপী, দুরাচারীরা তাঁকে তাড়াতাড়ি পায় ; মা দুর্বল শিশুর কাছে তাড়াতাড়ি যান। একজন মায়ের দুই ছেলে। একটি ছেলে ঠিক সময়ে খেয়ে নেয়, তারপর আর কিছু খায় না। অন্য

ছেলেটি সারা দিন ধরে খেতেই থাকে। দুজন ছেলেই যদি একসঙ্গে খেতে বসে তাহলে মা তাকেই প্রথমে খেতে দেন যে সময়মতো খেয়ে নেয়। কেননা সে যদি না খেয়ে উঠে যায় তাহলে সন্ধ্যা পর্যন্ত আর খাবে না। অন্য ছেলেটিকে মা বলবেন যে তুই অপেক্ষা কর। কেননা সে তো ছাগলের মতো সারাদিন যা পায় খেতেই থাকে। দুজনেই একই মায়ের সন্তান, তবু মা পক্ষপাত করেন। তেমনই **যে কেবল ভগবানকে ছাড়া আর কিছু চায় না ভগবান তাকেই সর্বপ্রথমে দেখা দেন। কেননা সে ভগবানের বেশি প্রিয়**। কেননা সে ভগবানকে ছাড়া আর কাউকে নিজের বলে মনে করে না। সে যদি ভগবানের বিরহে দুঃখী হয় তাহলে ভগবান তার দুঃখ সহ্য করতে পারেন না।

চার-পাঁচ বছরের কোন ছেলের যদি মায়ের সঙ্গে ঝগড়া হয় তাহলে তার কাছে মাকে নত হতে হয়। সংসারের লড়াইতে যার কাছে বেশি শক্তি তার জিত হয়। কিন্তু **প্রেমের লড়াইতে যার কাছে বেশি প্রেম সে হেরে যায়**। ছেলে মাকে বলে যে আমি তোমার কোলে যাব না, কিন্তু মা তাকে বারবার কাছে ডাকেন। মায়ের এই স্নেহ ভগবানের কাছ থেকেই এসেছে। ভগবানও ভক্তের কাছে আসার জন্য আগ্রহ করেন। ভগবানের যত আগ্রহ, পৃথিবীতে অত আগ্রহ কোথাও নেই। মায়ের যত গরজ, ছেলের গরজ তত নয়। ছেলে তো মায়ের দুধ খাবার সময় দাঁত দিয়ে কামড়ে দেয়। মা তাতে রাগ করেন না। তিনি যদি রাগ করতেন তাহলে শিশু কি বেঁচে থাকতে পারতো ! মা তো শিশুর প্রতি কৃপাই করেন। এইভাবে ভগবান আমাদের অনন্ত জন্মের মা। তিনি ভক্তকে উপেক্ষা করতে পারেন না। ভক্তকে তিনি নিজের মুকুটমণি বলে মানেন—**'মৈঁ তো হূঁ ভগতন কো দাস, ভগত মেরে মুকুটমণি'**। ভক্তের কাজ করবার জন্য ভগবান সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। যেমন ছেলে মাকে ছাড়া থাকতে পারে না এবং মা-ও ছেলেকে ছাড়া থাকতে পারেন না, তেমনই ভক্ত ভগবানকে ছাড়া থাকতে পারে না এবং ভগবানও ভক্তকে ছাড়া থাকতে পারেন না।

~~o~~

একটি নতুন কথা

যার দ্বারা কোন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, ক্রিয়াটি ঘটে যার দ্বারা তাকে 'কারক' বলা হয়। কারকগুলির মধ্যে মুখ্য হলো কর্তা, কারণ সকল ক্রিয়াই কর্তার অধীনে থাকে। অন্যান্য কারকগুলি তো ক্রিয়াটি সম্পন্ন হওয়ার সহায়কমাত্র, কিন্তু কর্তা স্বতন্ত্র থাকে। কর্তার মধ্যে চেতনের প্রকাশ আভাসিত হলেও আসলে চেতন কিন্তু কর্তা নয়। এইজন্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যেখানে ভগবান কর্মমাত্রেরই সিদ্ধিতে অধিষ্ঠান, কর্তা, করণ, চেষ্টা এবং দৈব—এই পাঁচটিকে কর্মের হেতু বলেছেন, সেখানে শুদ্ধ আত্মা (চৈতন্য)কে যারা কর্তা বলে মনে করে তাদের নিন্দা করেছেন—

তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥

(১৮।১৬)

'এই পাঁচটিই হেতু হওয়া সত্ত্বেও, কর্মের ব্যাপারে যে কেবল (শুদ্ধ) আত্মাকে কর্তারূপে দেখে সেই দুর্বুদ্ধি-যুক্ত ব্যক্তি ঠিক দেখে না ; কারণ তার বুদ্ধি শুদ্ধ নয় অর্থাৎ সে বিবেককে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি।'

গীতায় ভগবান কখনো প্রকৃতিকে, কখনো গুণগুলিকে কখনো আবার ইন্দ্রিয়সমূহকে কর্তা বলে অভিহিত করেছেন। গুণ হলো প্রকৃতির কার্য এবং ইন্দ্রিয়গুলি হলো গুণের কার্য। বস্তুত **কর্তৃত্ব রয়েছে তাই প্রকৃতিরই মধ্যে,** আমাদের **চৈতন্য স্বরূপে কর্তৃত্ব** নেই। ভগবান বলেছেন—

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি॥

(১৩।২৯)

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥
(৩।২৭)

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥
(৩।২৮)

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥
(১৪।১৯)

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥
(৫।৯)

তাঁর নিজের মধ্যেও কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব নেই বলে ভগবান জানিয়েছেন—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্॥
ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে॥
(৪।১৩-১৪)

'আমার দ্বারা গুণ ও কর্মের বিভাগপূর্বক চারটি বর্ণকে রচিত করা হয়েছে। এই (সৃষ্টি-রচনাদি)র কর্তা হওয়া সত্ত্বেও আমি-রূপ অবিনাশী পরমেশ্বরকে তুমি অকর্তাই জেনো। কারণ কর্মসমূহের ফলে আমার কোন স্পৃহা নেই, তাই কর্ম আমাকে আবদ্ধ করতে পারে না। এইরকম আমাকে তত্ত্বগতভাবে যে জেনে যায়, সেও কোন কর্মের দ্বারা বদ্ধ হয় না।'

ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু॥
(গীতা ৯।৯)

'হে ধনঞ্জয় ! এই (সৃষ্টি-রচনাদি) কর্মসমূহে অনাসক্ত ও উদাসীনের মতো অবস্থিত আমাকে এই কর্ম আবদ্ধ করে না।'

এর তাৎপর্য হলো, জগতের সৃষ্টি-পালন-সংহার আদি সকল কর্ম করলেও ওই সকল কর্মে ভগবান লিপ্ত হন না, অর্থাৎ তাঁর মধ্যে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব আসতে পারে না।

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥

(গীতা ১৩।৩১)

'হে কুন্তীনন্দন ! এই পুরুষ স্বয়ং অনাদি তথা গুণরহিত হওয়ায় অবিনাশী পরমাত্মাস্বরূপই। এই শরীরে থাকলেও তিনি কোন কর্মই করেন না এবং লিপ্তও হন না।'

দুটি বিভাগ আছে—জড় ও চেতন। জড় হলো নশ্বর আর চেতন অবিনশ্বর। গীতায় ভগবান জড়-ভাগকে প্রকৃতি, ক্ষেত্র, ক্ষর আদি নামে উল্লেখ করেছেন এবং চেতন-ভাগকে অভিহিত করেছেন পুরুষ, ক্ষেত্রজ্ঞ, অক্ষর আদি নামে। **এই দুটি ভাগ, অন্ধকার ও আলোর মতো সর্বতোভাবে পরস্পরের সঙ্গে অসম্বন্ধিত।** জড়-ভাগ অসৎ, যার কোনও সত্তাই বিদ্যমান নেই, আর চেতন-ভাগ হলো সৎ, যার সত্তা বিদ্যমান—'**নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ**' (গীতা ২।১৬)। সমস্ত ক্রিয়াই জড়-বিভাগের মধ্যে ঘটে। চেতন-বিভাগে কখনো কিঞ্চিৎমাত্রও ক্রিয়া হওয়া সম্ভব নয়। **স্থূলশরীর এবং তার মাধ্যমে সংঘটিত ক্রিয়া, সূক্ষ্মশরীর এবং তার মাধ্যমে কৃত মনন এবং কারণশরীরের মাধ্যমে প্রকটিত স্থিরতা ও সমাধি—এই সবই জড় বিভাগীয় প্রকাশ। কামনা, মোহ, অহং ইত্যাদি সমস্ত বিকারও জড়ের অন্তর্গত। সমস্ত পাপ-পুণ্য-ভোগও তাই। পরাশ্রয় ও পরিশ্রম—এই দুটি জড় বিভাগের মধ্যে আর ভগবদাশ্রয় ও বিশ্রাম (নিজের জন্য কিছু না করা)—এই দুটি হলো চেতন-বিভাগের মধ্যে।** জড়

আর চেতনের বিভাগকে পৃথক বলে অনুভব করাই হলো জ্ঞান—**'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা'** (গীতা ১৩।৩৪)। এই জ্ঞানরূপী অগ্নিতে সমস্ত পাপ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়—

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥

(গীতা ৪।৩৬-৩৭)

'যদি সকল পাপীর থেকেও বেশি পাপী হও, তাহলেও জ্ঞানরূপী নৌকার সাহায্যে তুমি নিঃসন্দেহে সহজেই সেই পাপ-সাগর পার হয়ে যেতে পারবে। হে অর্জুন ! প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন ইন্ধনকে সম্পূর্ণ ভস্ম করে দেয়, তেমনই জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত সঞ্চিত, প্রারব্ধ[১] ও ক্রিয়মান কর্মকে সম্পূর্ণরূপে ভস্ম করে দেয়।'

অর্থাৎ সাধক নিজের স্বত স্বাভাবিক অস্তিত্বকে যখন চৈতন্য রূপে যথার্থরূপে অনুভব করতে পারে, তৎক্ষণাৎ তার সকল প্রকার বিকার তথা পাপ দূর হয়ে যায় এবং সে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। জড়ের সাথে নিজেকে সম্বন্ধ-যুক্ত বলে মনে করাই হলো জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে আটকে থাকার কারণ—

'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু' (গীতা ১৩।২১)।

এইখানে একটি সংশয় আসতে পারে যে, চেতনা ছাড়া শুধু জড়-বিষয়ে পাপ-পুণ্য আদি ঘটতে পারে কী করে ? এর সমাধানে উপমা দিয়ে বলা যায় যে, কোন গাড়িতে চাপা পড়ে যদি কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয় তো তার জন্য গাড়ির কোন শাস্তি হয় না, তা হয় চালকেরই। দুর্ঘটনারূপ ক্রিয়াটি গাড়ির দ্বারা হয়ে থাকলেও, শাস্তিটি পেতে হয় যে গাড়িটির

---

[১]জ্ঞান হওয়ার পরও প্রারব্ধের ফলে অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে বটে, কিন্তু জ্ঞানীকে তা আর সুখে বা দুঃখে অভিভূত করতে পারে না।

সঙ্গে সম্বন্ধিত ছিল তাকেই, অর্থাৎ গাড়ির যে চালক (কর্তা) হয়ে ছিল সেই ব্যক্তিটিকে। **কর্তা যে হয়, ভোক্তাও হয় সে-ই**। এরকমই পাপ-পুণ্যরূপ ক্রিয়া হয় জড় (শরীর) দ্বারাই, কিন্তু তার ফলটা ভোগ করতে হয় জড়ের সাথে সম্বন্ধ মেনে নেওয়া কর্তা (চেতন)-কেই। অর্থাৎ, **যা কিছু বিকার সবই ঘটে জড়ের মধ্যে, কিন্তু জড়ের সঙ্গে তাদাত্ম্য মেনে নেওয়ার ফলে তার পরিণাম ভুগতে হয় চেতন (জীব)কে**। যেমন, কোন ব্যক্তির জ্বর হলে তা হয় শরীরেই, কিন্তু শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্য ভাবনার ফলে সে মনে করে যে তার নিজের জ্বর হয়েছে। নিজ (চৈতন্য) স্বরূপে জ্বর হতে পারে না, যদি তা হত তাহলে তার নিরাময় কখনো হত না। জড়-বিভাগের সঙ্গে অর্থাৎ অপরা প্রকৃতির অন্তর্গত অহং-এর সঙ্গে নিজের (তাদাত্ম্যবোধক) সম্পর্ক মেনে নেওয়ার পরিণতিতেই অজ্ঞানী মানুষ নিজেকে কর্তা ও ভোক্তা বলে মনে করে থাকে— **'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে'** (গীতা ৩।২৭), **'পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্'** (গীতা ১৩।২১)। অর্থাৎ মানুষের আত্ম (চৈতন্যস্বরূপ)-এ কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব থাকে না, কিন্তু অবিবেচনার ফলেই সে নিজেকে কর্তা-ভোক্তা রূপে মনে করে। সুখের লালসা বা ফললাভের ইচ্ছার কারণেই সে নিজেকে কর্তা বলে মনে করে এবং নিজেকে কর্তা বলে মনে করার কারণেই তাকে সব 'কর্মফলের ভোক্তাও' হতে হয়। কারণ নিজেকে কর্তা বলে মনে করার ফলে সে প্রকৃতির যে কাজেই নিজের সম্বন্ধ গড়ে তোলে, সেটি তার জন্য ফলদায়ী 'কর্মে' পরিণত হয়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে আত্মস্বরূপে কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বের লেশমাত্রও নেই— **'নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ'** (গীতা ৪।২০), **'নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি'** (গীতা ৫।৮)। চুরাশি লক্ষ প্রজাতিতে আজ পর্যন্ত যা কিছু ক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে তার মধ্যে কোন ক্রিয়াই আত্মস্বরূপ অবধি পৌঁছতে পারেনি, কারণ **আত্মস্বরূপের বিভাগ এবং ক্রিয়ার বিভাগ**

সম্পূর্ণভাবেই ভিন্ন। যতকাল পর্যন্ত নিজের জন্য 'করা'-র ভাব, ততকাল কর্তৃত্ব (অহংকার)ও থাকে, কারণ কর্তৃত্ববোধ বিনা নিজের জন্য 'করা' ঘটতেই পারে না। এই কারণেই **নিজের উদ্ধারের জন্য যে সাধনা মানুষ করে থাকে তাতে অহংকারটি পূর্ববৎ-ই থেকে যায়।** অহংকারসহ কৃত কোন কর্মই প্রকৃত কল্যাণকারক হতে পারে না, কারণ এই অহংকারই তো জন্ম-মৃত্যু রূপ বন্ধনের মূল। এইজন্যই **সাধকের স্বরূপের প্রতিই গুরুত্বটি দেওয়া প্রয়োজন, ক্রিয়ার প্রতি নয়।**

শরীরের সম্বন্ধ হলো সংসারের সাথে আর স্বরূপের সম্বন্ধ হলো পরমাত্মার সাথে। শরীর প্রকৃতির অংশ, বিপরীতে স্বরূপ হলো পরমাত্মার। সুতরাং **আত্মস্বরূপ কখনো শরীরগত (শরীরে স্থিত) হতেই পারে না**। কিন্তু অজ্ঞানতার কারণে মানুষ নিজেকে শরীরস্থ বলেই মনে করে। এখানে একটি বিশেষ কথা উল্লেখযোগ্য যে, **মানুষ নিজেকে শরীরস্থ বলে মনে করলেও প্রকৃতপক্ষে স্বরূপত কখনোই সে কর্তা বা ভোক্তা হয় না—'শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে'** (গীতা ১৩।৩১)। এই বাক্যে প্রমাণিত হয় য়ে, স্বরূপে কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব না থাকাটা সাধনলভ্য ব্যাপার নয়, প্রকৃতপক্ষে তা স্বত স্বাভাবিকই। সুতরাং **সাধকের কাজ কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব থেকে মুক্ত হওয়া নয় বরং নিজের সত্তায় ওইগুলিকে একদম অস্বীকার করা, কারণ বাস্তবে আত্মস্বরূপে ওইগুলি আদৌ নেই-ই**। গীতায় ভগবান আত্মস্বরূপে ভোক্তৃত্বের অবিদ্যমানতা বুঝিয়েছেন আকাশের দৃষ্টান্ত দিয়ে আর কর্তৃত্বের অনস্তিত্ব বুঝিয়েছেন সূর্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে—

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥

(গীতা ১৩।৩২)

'আকাশ যেমন সর্বত্র ব্যাপ্ত হলেও সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে কোথায়ও লিপ্ত হয় না, তেমনই সর্বত্র পরিপূর্ণ আত্মা কোন দেহেই লিপ্ত হয় না।'

চিন্ময় সত্তা তো শরীর কিংবা প্রকৃতিতে যুক্ত হতেই পারে না। এই

সত্তা আকাশের মতো সর্বত্র স্থিত (সর্বগত)—'নিত্যঃ সর্বগতঃ' (গীতা ২।২৪), এটি শরীরের ভেতরে-বাইরে সর্বত্র পরিপূর্ণ। এই সর্বব্যাপী সত্তাই হলো আমাদের স্বরূপ।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥

(গীতা ১৩।৩৩)

'হে ভরতবংশজাত অর্জুন ! একই সূর্য যেমন সমগ্র জগৎকে প্রকাশিত করে, সেইরকমই ক্ষেত্রজ্ঞ (আত্মা) সমগ্র ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করে।'

সূর্যালোকে শুভ-অশুভ সব রকম সমস্ত ক্রিয়াই হয়ে থাকে ; কেউ বেদ পাঠ করে, কেউ প্রাণীহত্যা করে। কিন্তু ওই সব ক্রিয়ায় সূর্যের না হয় পুণ্য, না হয় পাপ। কারণ ওইসকল ক্রিয়ায় সূর্য কর্তা বা ভোক্তা কোনটাই হন না। এইরকমই আত্মা (সর্বব্যাপী সত্তা) সকল শরীরে সত্তাগত স্ফুরণ দিলেও বস্তুত নিজে তো কিছু করেনই না, লিপ্তও হন না। এইজন্য ভগবান বলেছেন—

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥

(গীতা ১৮।১৭)

'যার অহংকৃতভাব (আমি কর্তা—এইভাব) নেই এবং যার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না, সে (যুদ্ধে) এই সমস্ত প্রাণীকে হত্যা করলেও মারে না কিংবা বদ্ধদশাও প্রাপ্ত হয় না।'

গঙ্গায় ডুবে কেউ মারা গেলেও তাতে গঙ্গার কোন পাপ হয় না এবং কেউ তাতে স্নানাদি করলে তাতে গঙ্গার কোন পুণ্য হয় না ; কারণ গঙ্গার মধ্যে অহংকৃত (কর্তৃত্ব) আর বুদ্ধির লিপ্ততা (ভোক্তৃত্ব) থাকে না।

কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব আছে প্রকৃতিতেই, আত্মস্বরূপে নয়। এই কারণেই আত্মস্বরূপে স্থিত তত্ত্বজ্ঞ মহামানব 'আমি কিছুই করি না' এই অনুভব

করেন—'**নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ**' (গীতা ৫।৮)। ভোজন-সেবন, শয়ন-জাগরণ, কর্তব্যপালন কিংবা অন্যান্য কার্যসাধন ইত্যাদি সমস্ত লৌকিক ক্রিয়া তথা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ইত্যাদি সমস্ত পারমার্থিক ক্রিয়া পর্যন্ত প্রকৃতিতেই সংঘটিত হয়ে থাকে। স্বরূপে কোনরকম ক্রিয়াই সম্ভব নয়। এইজন্য সাধকের উচিত, শাস্ত্রবিহিত লৌকিক ও পারমার্থিক কর্মগুলিকে বাহ্যত ত্যাগ না করে, ওগুলিতে নিজের কর্তৃত্ব না মানা অর্থাৎ ওই সব কর্ম নিজের দ্বারা হচ্ছে বা নিজের জন্য হচ্ছে বলে না মনে করা। **কোন কর্মের গুরুত্ব তো প্রকৃতপক্ষে জড়ত্বেরই গুরুত্ব**। কর্মকে মুখ্য করে চললে বছরের পর বছর সাধনা করে গেলেও কোন উপকার প্রত্যক্ষ হয় না। এই কারণেই সাধকের অন্তঃকরণে ক্রিয়া অর্থাৎ জড়বিভাগের গুরুত্ব না রেখে চেতনের গুরুত্বই রাখা প্রয়োজন। সাধক দেহ নয় কিন্তু সকল ক্রিয়াই সম্পাদিত হয় দেহের দ্বারা। **সাধকের স্বরূপ হলো চিন্ময় সত্তামাত্র, আর সত্তায় কোন ক্রিয়া হয় না**। ক্রিয়া আর বস্তু হলো জাগতিক ব্যাপার মাত্র।

প্রকৃতপক্ষে নিজের স্বরূপে কোন কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব নেই, কিন্তু অজ্ঞানতার কারণে নিজের মধ্যে তা আছে বলে মনে হয়। নিজের মধ্যে কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব আছে বলে মনে করলেও বস্তুত 'আমি' কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ববিহীন—'**শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে**।' অর্থাৎ আমি নিজেকে শরীরস্থ বলে মনে করলেও প্রকৃতপক্ষে আমি শরীর থেকে অসঙ্গ। **নিজের মধ্যে বদ্ধতা আছে বলে মনে করলেও প্রকৃতপক্ষে আমি সর্বদাই মুক্ত**। এই সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া সাধকের পক্ষে খুবই আবশ্যক।

~~০~~

সাধক কে ?

ভগবান বলেছেন—**‘ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা’** (গীতা ৯।৪), ‘এই সমগ্র সংসার আমার অব্যক্ত (নিরাকার) স্বরূপের দ্বারা ব্যাপ্ত।’ যার আকৃতি আছে তাকে ‘মূর্তি’ বলে আর যার কোন রকম আকৃতি নেই তাকে ‘অব্যক্তমূর্তি’ বলে। যেমন ভগবান হলেন অব্যক্তমূর্তি, তেমনই সাধকও হলেন অব্যক্তমূর্তি—

‘অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে’ (গীতা ২।২৫)

সাধক শরীর নন—এমন কথার যদিও স্পষ্টরূপে শাস্ত্রে উল্লেখ নেই, কিন্তু এটিই বাস্তবিক কথা। সাধক হলেন ভাব-শরীর। তিনি যোগী, ভোগী নন। ভোগ এবং যোগের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ আছে। ভোগী যোগী নয় এবং যোগী ভোগী নয়। সাধক কোন কাজ ভোগবুদ্ধি বা সুখের জন্য করেন না, তা করেন যোগবুদ্ধিতে। সমতার নাম হলো ‘যোগ’—**‘সমত্বং যোগ উচ্যতে’** (গীতা ২।৪৮)। সমতা হলো ভাব। তাই সাধক হলেন ভাব-শরীর।

স্থূলশরীর প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হয়। এমন কোন মুহূর্ত নেই যখন শরীরের পরিবর্তন না হয়। পরমাত্মার দুটি প্রকৃতি, শরীর হলো অপরা প্রকৃতি এবং জীব হলো পরা প্রকৃতি। পরা প্রকৃতি অব্যক্ত এবং অপরা প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিশেষে অব্যক্ত । অর্থাৎ সকল প্রাণী প্রথমে অব্যক্ত থাকে, মধ্যকালে ব্যক্ত থাকে এবং শেষে অব্যক্ত হয়ে যায়[১]। স্বপ্ন আসে অর্থাৎ প্রথমে জাগ্রত থাকে, মধ্য সময়ে স্বপ্ন হয় এবং অন্তিমে জাগ্রত হয়। মধ্য সময়ে যেমন স্বপ্ন, তেমনই সকল প্রাণীও মধ্য সময়ে ব্যক্ত থাকে।

---

[১]অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥ (গীতা ২।২৮)

সিদ্ধান্ত হলো এই যে, যা আদিতে এবং অন্তিমে থাকে না তা বর্তমানেও থাকে না—**'আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্তমানেঽপি তত্তথা'** (মাণ্ডূক্যকারিকা ২।৬, ৪।৩১)। প্রাণী আদিতে এবং অন্তিমে অব্যক্ত, সুতরাং মধ্যকালে ব্যক্ত দৃষ্ট হলেও তারা বাস্তবে অব্যক্তই। ব্যক্তে দুজন মানুষও এক (সমান) হয় না, কিন্তু অব্যক্তে সকলে এক হয়ে যায়। সুতরাং অব্যক্তে সকলের পরমাত্মার প্রাপ্তি হতে পারে। যা সকলে প্রাপ্ত হতে পারে তিনিই পরমাত্মা। যাকে কেউ কেউ প্রাপ্ত হতে পারে, আবার কেউ কেউ প্রাপ্ত হতে পারে না, তা পরমাত্মা নয়, তা হলো সংসার। সেজন্য পরমাত্মার প্রাপ্তি অব্যক্তের হয় এবং অব্যক্ততে হয়।

অব্যক্তই হলো সাধক। ব্যক্ত সাধক নয়। ব্যক্ত তো একমুহূর্তও স্থির থাকে না। **'প্রতিক্ষণপরিণামিনো হি ভাবা ঋতে চিতিশক্তেঃ'** 'চিতিশক্তিকে (চেতন শক্তি) বাদ দিয়ে বাকি সকল ভাব প্রতিক্ষণ পরিণামী অর্থাৎ এক মুহূর্তও স্থির থাকার নয়।' ভেবে দেখুন, যখন আমরা মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছিলাম তখন আমাদের শরীরের রূপ কেমন ছিল আর আজ কেমন রূপ ? চিন্তা করলে এটি মেনে নিতেই হবে যে, শরীর-সংসার প্রতি মুহূর্তে বদলায়। পরিবর্তন পুঞ্জের নামই হলো সংসার। যা বদলায় সে কেমন করে সাধক হতে পারে ? সেই সাধক যে বদলায় না। সাধকেরই সিদ্ধি লাভ হয়, শরীরের সিদ্ধিলাভ হয় না। সিদ্ধি তো অ-শরীরীর হয়। সেজন্য **সাধককে সর্বপ্রথম এই কথা মেনে নিতে হবে যে শরীর তাঁর স্বরূপ নয়—সেকথা তিনি বুঝতে পারুন আর নাই পারুন।**

জ্ঞানমার্গে সাধক প্রথমে বুঝে নিয়ে তারপরে মেনে নেন। ভক্তিমার্গে প্রথমে মানা পরে জানা (বোঝা) হয়। তাৎপর্য হলো **জ্ঞানে বিবেকই প্রধান আর ভক্তিতে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস প্রধান**। এইখানেই হলো জ্ঞানমার্গ এবং ভক্তিমার্গে প্রভেদ। দুটি মার্গেই একটি বৈশিষ্ট্য আছে। জ্ঞানমার্গী সাধক তো প্রারম্ভ থেকেই নিজেকে ব্রহ্মরূপ মনে করেন, ব্রহ্ম থেকে

নীচে নামেন না। কিন্তু ভক্ত সিদ্ধ হয়ে যাবার পর, পরমাত্মাকে লাভ করবার পরও ব্রহ্ম হন না, বরং ব্রহ্ম তাঁর বশে এসে যান। তুলসীদাস সকল গ্রন্থ লেখার পর শেষে বিনয়-পত্রিকা রচনা করেছিলেন। সেখানে তিনি ছোট শিশুর মতো মা সীতাকে বলেছেন—

কবহুঁক অম্ব, অবসর পাই।
মেরিঔ সুধি দ্যাইবী, কছু করুন-কথা চলাই॥ ১ ॥
দীন, সব অঁগহীন, ছীন, মলীন, অঘী অঘাই।
নাম লৈ ভরৈ উদর এক প্রভু-দাসী-দাস কহাই॥ ২ ॥
বূঝিহেঁ 'সো হৈ কৌন', কহিবী নাম দসা জনাই।
সুনত রাম কৃপালুকে মেরী বিগরিঔ বনি জাই॥ ৩ ॥
জানকী জগজননি জনকী কিয়ে বচন সহাই।
তরৈ তুলসীদাস ভব তব নাথ-গুন-গন গাই॥ ৪ ॥

তাৎপর্য হলো ; সিদ্ধ, ভগবৎপ্রাপ্ত হয়ে যাওয়ার পরও ভক্ত নিজেকে ছোটই মনে করেন। বাস্তব দৃষ্টিতে দেখলে এমন ভক্তই হলেন প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানী। গীতাতেও ভগবান গুণাতীত মহাপুরুষকে জ্ঞানী বলেননি, নিজের ভক্তকেই জ্ঞানী বলেছেন (গীতা ৭।১৬-১৮)। ভগবান জ্ঞানমার্গীকে **'সববিৎ'** (সর্বজ্ঞ) বলেননি, বরং ভক্তকেই **'সববিৎ'** বলেছেন—**'স সববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত'** (গীতা ১৫।১৯)। তুলসীদাস মহারাজ বলেছেন—

'প্রেম ভগতি জল বিনু রঘুরাঈ। অভিঅন্তর মল কবহুঁ ন জাঈ॥'

(শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৪৯।৩)

ভক্তি ছাড়া অন্তরের সূক্ষ্ম 'মল' (অহং) দূর হয় না। সেই 'মল' মুক্তিতে বাধক হয় না, কিন্তু দার্শনিকদের মধ্যে এবং তাঁদের দর্শনগুলিতে মতান্তর সৃষ্টি করে। যখন সেই সূক্ষ্ম 'মল' বিদূরিত হয় তখন মতান্তর থাকে না। **সেজন্য ভক্তই হলেন প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানী।**

শরীর আমাদের স্বরূপ নয়। শরীর পৃথিবীতেই (মায়ের গর্ভে) সৃষ্টি

হয়, পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করে এবং মৃত্যুতে পৃথিবীতেই লীন হয়ে যায়। এর তিনটি গতির কথা বলা হয়েছে—এটি হয় ভস্ম হয়ে যাবে, নয়তো মাটি হয়ে যাবে, কিংবা বিষ্ঠা হয়ে যাবে। একে জ্বালালে ভস্ম হয়ে যাবে, মাটিতে পুঁতলে মাটি হয়ে যাবে এবং জন্তুরা যদি খেয়ে নেয় তাহলে বিষ্ঠা হয়ে যাবে। এজন্য শরীরের মুখ্যতা নেই, বরং অব্যক্ত স্বরূপের মুখ্যতা আছে—

ভূমা অচল শাশ্বত অমল সম ঠোস হৈ তূ সর্বদা।
য়হ দেহ হৈ পোলা ঘড়া বনতা বিগড়তা হৈ সদা॥

এজন্য বাস্তবে সাধক অব্যক্ত হয়ে গিয়েই ভগবানের ভজন করে থাকেন। একটি হলো পাঞ্চভৌতিক শরীর এবং অন্যটি হলো অব্যক্ত ভাবশরীর। **ভজন-ধ্যান প্রকৃতপক্ষে ভাবশরীরের দ্বারাই হয়।** ভজন হলো প্রেমের নাম—'**পন্নগারি সুনু প্রেম সম ভজন ন দূসর আন**' (শ্রীরামচরিতমানস, অরণ্যকাণ্ড ১০ পাঠভেদ)। **প্রেম ভাব-শরীরের দ্বারাই হয়।** অতএব বাস্তবে অব্যক্ত-মূর্তিই ভগবানকে প্রেম করেন, ভগবানের ভজন করেন, ভগবানে লীন হয়ে যান। ভগবান তার কাছে মিষ্টি, ভগবানের কথা ভাল, ভগবানের লীলা সুন্দর, ভগবানের নাম ভালো লাগে।

ভগবান বলেছেন যে, জীব অনাদিকাল থেকে তাঁরই অংশ—'**মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ**' (গীতা ১৫।৭)। এখানে ভগবানের '**মম এব অংশঃ**' বলার তাৎপর্য হলো **শরীরে যেমন মা-বাবা দুজনের অংশ থাকে, জীবের মধ্যে প্রকৃতির তেমন অংশ নেই ৎ কেবল আমার (ভগবানেরই) অংশ আছে।** প্রকৃতির অংশ শরীর তো প্রকৃতিতেই স্থিত থাকে। কিন্তু জীব পরমাত্মার অংশ হওয়া সত্ত্বেও পরমাত্মাতে স্থিত থাকে না। সে নিজেই নিজেকে সংসারে স্থিত বলে মেনে নেয়, ভগবানে স্থিত বলে মনে করে না। সে প্রকৃতিতে স্থিত শরীর-মন-বুদ্ধিকে নিজের স্বরূপ বলে মেনে নেয়—

'মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি' এজন্য 'আমি শরীর রহিত'— এই কথা সে বুঝতে পারে না। মানুষের যদি সবচেয়ে বেশি ভুল কিছু থাকে তবে তা এই যে সে প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তনশীল শরীরকে নিজের স্থায়ী রূপ বলে মেনে নেয়।

ভগবান গীতার প্রারম্ভে শরীর এবং শরীরী (শরীরবিশিষ্ট)-এর বর্ণনা করেছেন। এর তাৎপর্য হলো প্রতিটি সাধককে এই কথা মানতে হবে যে সে শরীর নয়। বাস্তবে সাধক শরীর নন, শরীরীও নন। **সাধকের স্বরূপ হলো কেবল সত্তা। কিন্তু বোঝবার দৃষ্টিতে ভগবান স্বরূপকে 'শরীরী' নামে উল্লেখ করেছেন।** তার কারণ সংসারে যেমন ধনের (অর্থের) সম্পর্কে মানুষকে ধনী বলা হয় তেমনই শরীরের সম্বন্ধে স্বরূপকে 'শরীরী' বলা হয়। যেমন ধনের (অর্থের) সম্পর্ক না থাকলেও ধনী (মানুষ) তো থাকে, কিন্তু তাকে 'ধনী' বলা হয় না, তেমনই শরীরের সম্বন্ধ না থাকলেও শরীরী (স্বরূপ) তো থাকে, কিন্তু তাকে শরীরী বলা হয় না। এইভাবে এক-ই স্বরূপ ক্ষেত্রের সম্পর্কে 'ক্ষেত্রজ্ঞ', দৃশ্যের সম্পর্কে 'দ্রষ্টা' এবং সাক্ষ্যের সম্পর্কে 'সাক্ষী' বলে কথিত হয়। কিন্তু বাস্তবে স্বরূপ শরীর নয়, শরীরীও নয় ; ক্ষেত্র নয়, ক্ষেত্রজ্ঞও নয় ; দৃশ্য নয়, দ্রষ্টাও নয় ; সাক্ষ্য নয়, সাক্ষীও নয়। স্বরূপ হলো চিন্ময় সত্তামাত্র।

এখানে যে কথাটি বিশেষ করে বোঝবার তা হলো এই যে ধনের কারণে যেমন ধনী, শরীরের কারণে তেমনই শরীরী নয়। তার কারণ ধন এবং ধনী যেমন এক জাতের, শরীর এবং শরীরী তেমন এক জাতের নয়। যেমন ধনীর ধনের প্রতি আকর্ষণ থাকে, তেমন শরীরীর শরীরের প্রতি কোন আকর্ষণ থাকে না, বরং আকর্ষণের সম্মতি থাকে। ধনীর মধ্যে তো ধনেরই প্রাধান্য, কিন্তু শরীরীর মধ্যে শরীরের প্রাধান্যই নেই। ধনীর মধ্যে ধনের জন্য বিকার হয়ে থাকে, কিন্তু শরীরীর মধ্যে শরীরের বিকার হয় না। এজন্য ধনের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হলে ধনী কাঁদে, কিন্তু শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হলে শরীরী অখণ্ড, অসীম আনন্দ উপলব্ধি

করে। ধন এবং ধনীর বিবেক (দুটির ভেদজ্ঞান) হলে মুক্তি হয় না, কিন্তু শরীর এবং শরীরীর বিবেক হলে মুক্তি হয়ে যায়। সেজন্য ধনের সম্পর্ক-বিচ্ছেদ হলে ধনী মুক্ত হয় না বরং নির্ধন অথবা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যায়, কিন্তু শরীরের সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হলে শরীরী চিরকালের জন্য মুক্ত হয়ে যায়। তার কারণ **শরীর হলো সংসারের বীজ। অতএব শরীরের সঙ্গে যারই সম্বন্ধ থাকে তারই সমগ্র সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে**। শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হলে সমগ্র সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

সংসারে আমরা দুটি জিনিস দেখি—পদার্থ এবং ক্রিয়া। এই দুটিই হলো প্রকৃতির কার্য। সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা জগৎকে পদার্থ-প্রধান দেখি, কিন্তু বাস্তবে তা হলো ক্রিয়া-প্রধান, পদার্থ-প্রধান নয়। পদার্থে সব সময় পরিবর্তন যখন হয় তখন তা তো ক্রিয়া, তা পদার্থ হলো কী করে ? **ক্রিয়ার পুঞ্জই পদার্থরূপে দৃষ্ট হয়**। সেই ক্রিয়াও পরিবর্তনশীল। এই ক্রিয়া এবং পদার্থগুলি প্রকৃতির স্বরূপ, আমাদের স্বরূপ নয়। আমাদের স্বরূপ হলো ক্রিয়া এবং পদার্থরহিত 'অব্যক্ত'। আমরা যেমন বাড়িতে উপবিষ্ট—এখানে আমরা এবং বাড়ি ভিন্ন ভিন্ন। সেজন্য আমরা বাড়ি থেকে চলে যাই। সেই রকমই আমরা শরীরে উপবিষ্ট রয়েছি। শরীর এখানেই পড়ে থাকে, আমরা চলে যাই। বাড়ি পিছনে পড়ে থাকে, আমরা আলাদা হয়ে যাই। বাস্তবে আমরা তো প্রথম থেকেই শরীর থেকে আলাদা ছিলাম। **আসলে আমরা শরীরে থাকি না, 'শরীরে আছি' বলে মেনে নিই**। এজন্য ভগবান বলেছেন—'**অবিনাশী তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্**' (গীতা ২।১৭)। 'অবিনাশী তো তাঁকেই জানবে যিনি এই সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন।' তাৎপর্য হলো স্বরূপ সর্বব্যাপী, একটি শরীরের মধ্যে সীমিত নয়—'**নিত্যঃ সর্বগতঃ**' (২।২৪)। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি শরীরের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ মেনে রাখেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি সাধক। শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে

বিচ্ছিন্ন হলে তিনি সিদ্ধ হয়ে যান।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে দেব হয়ে গিয়ে দেবতার ভজনা করা উচিত—**'দেবো ভূত্বা যজেদ্দেবম্'**। এজন্য অব্যক্ত হয়ে গিয়েই অব্যক্ত পরমাত্মার ভজনা করা উচিত। শরীর তো ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু সাধক ক্ষণ-প্রতিক্ষণ পরিবর্তনশীল হন না। যে প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল সে কীকরে মুক্ত হবে ? কেমন করে নিত্য হবে ? স্বরূপের কেউ বিনাশ করতে পারে না—**'বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎকর্তুমর্হতি'** (গীতা ২।১৭), কিন্তু শরীর নষ্ট না হয়ে থাকে না। যে অবিনাশী সেই মুক্ত হয়। বিনাশী কেমন করে মুক্ত হবে ? বন্ধনের মিথ্যা ধারণা (মোহ) দূর হয়ে যাওয়াকেই মুক্তি বলে। সেজন্য একবার মোহ বিদূরিত হলে আর মোহ হয় না—**'যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহম্'** (গীতা ৪।৩৫)। তার কারণ মূলে মোহ নেই। বাস্তবে যা নেই তাই বিদূরিত হয়, যা আছে তা দূর হয় না। সৎ কখনো অবিদ্যমান হয় না, আর যা অবিদ্যমান হয়ে যায় তা সৎ নয়, তা হলো অ-সৎ—**'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'** (গীতা ২।১৬)।

শরীর তো ভোগায়তন। যেমন রান্নাঘর হলো খাওয়ার স্থান তেমনই শরীর হলো সুখ-দুঃখ ভোগ করবার স্থান। সুখ-দুঃখ যে ভোগ করে সে শরীর নয়। ভোগ করবার স্থান হলো ভিন্ন এবং যে ভোগ করে সেও ভিন্ন। শরীর তো বাইরের পরিচ্ছদ। আমরা লাল, কাল, সাদা প্রভৃতি যে কোন রঙেরই কাপড় পরি না কেন, তা কখনো স্বরূপ হয় না। তেমনই পুরুষ-নারী হলো বাইরের পরিচ্ছদ। **স্বরূপ নারী নয়, পুরুষ নয়, নপুংসকও নয়**। পরমাত্মা, প্রকৃতি এবং জীব—এই তিনটিই হলো লিঙ্গাতীত।

শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার—এই সবগুলির অবিদ্যমানতা সকলেই উপলব্ধি করেন, কিন্তু নিজের অনস্তিত্বের অনুভূতি কখনো কারও হয় না। যার অনস্তিত্ব অনুভূত হয় আমরা তার ঊর্ধ্বে । আমাদের স্বরূপের অস্তিত্ব সব সময় থাকে, সুষুপ্তিতে (গভীর

নিদ্রাকালে) শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার কিছুই থাকে না, সব বিলীন হয়ে যায়। কোন লোকই এমন কথা বলে না যে সুষুপ্তির সময় সে মরে গিয়েছিল, এখন বেঁচে উঠেছে। সুষুপ্তির সময়েও আমরা থাকি। সেজন্যই আমরা বলি যে আমি খুব ভালভাবে ঘুমিয়েছিলাম, কিছুই জানতে পারিনি। সুষুপ্তিতেও আমাদের অস্তিত্ব আগে যেমন, তেমনই ছিল। কেননা **আমাদের সত্তা (অস্তিত্ব) অহংকারের (অহং) অধীন নয়; বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, শরীর কোন কিছুরই অধীন নয়।** আমাদের সত্তা স্বতন্ত্র । স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ—এই সবরকম শরীর অবিদ্যমান হয়ে যায়, কিন্তু আমরা অবিদ্যমান হই না। এজন্য আমাদের শরীর হলো নিরাকার। সাকাররূপ শরীর পরে সৃষ্ট হয় এবং বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে যায়। **আমরা নিরাকাররূপে অবস্থিত, কিন্তু শরীররূপে নিজেদের সাকার বলে মেনে নিই। এইটিই হলো প্রধান ভুল।** এই ভুলের জন্য আমাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। প্রায়শ্চিত্ত করার ক্ষেত্রে তিনটি কথা আছে—(১) **নিজেকে শরীর মনে করে যে ভুল করেছি সেই ভুল স্বীকার করা,** (২) **মানুষ (সাধক) হয়ে এমন ভুল করেছিনিজের এই ভুলের জন্য অনুতাপ করা** এবং (৩) **এটি নিশ্চিত করে নেওয়া যে ভবিষ্যতে এমন ভুল আর করব না। অর্থাৎ নিজেকে কখনো শরীর বলে মনে করব না।** এই তিনটি কথা স্বীকৃত হলে প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায় এবং সাধক নিজের প্রকৃত অব্যক্ত স্বরূপে স্থিত হয়ে যান।

~~০~~

সাধক, সাধ্য তথা সাধনা

কেবল এক সত্তা ছাড়া আর কিছুই নেই। সেই সত্তায় 'আমি' নেই, 'তুমি' নেই, 'সে' নেই এবং 'এ'—কিছুই নেই। জগৎ-সংসারের সত্তা আমাদের দ্বারা মেনে নেওয়া, বাস্তবে তা নেই। শুধু সত্তারই অস্তিত্ব 'আছে', সংসারের অস্তিত্ব নেই। 'নেই' সত্যই নেই আর 'আছে'-ই সত্যকারের আছে—**'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'** (গীতা ২।১৬)। 'নেই'-এর অনস্তিত্ব স্বত স্বাভাবিক আর 'আছে'র অস্তিত্ব স্বত স্বাভাবিক। এই 'আছে'ই হলো আমাদের সাধ্য। যা 'নেই' সেটি আমাদের সাধ্য কি করে হতে পারে ? **'আছে' কে অনুভব করতে হয় না, কারণ সেটি অনুভবরূপই।**

তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে সাধক তিনিই, যিনি সাধ্য ছাড়া থাকতে পারেন না এবং সাধ্য তিনি, যিনি সাধক ছাড়া থাকতে পারেন না। সাধক সাধ্য থেকে আলাদা হতে পারেন না এবং সাধ্যও সাধক থেকে আলাদা হতে পারেন না। কারণ **সাধক ও সাধ্যের সত্তা একই**। 'আছে'র থেকে কেউই আলাদা হতে পারেন না। অতএব আমরা যদি সাধক হয়ে থাকি তাহলে সাধ্য প্রাপ্তি তৎক্ষণাৎই হওয়া উচিত। **তিনিই সাধক, যিনি সাধ্য ব্যতীত অন্য সত্তা স্বীকারই করেন না**। তিনি সাধ্য ছাড়া অন্য কারো আশ্রয়ই গ্রহণ করেন না, তা সেটি পদার্থই হোক অথবা ক্রিয়া।

যিনি সাধ্য ছাড়া থাকেন, তিনি আবার কেমন সাধক আর যিনি সাধককে ছাড়া থাকেন তিনিই বা কীরূপ সাধ্য ? যে মাকে ছাড়া থাকতে পারে, সে কেমন শিশু আর যে শিশুকে ছাড়া থাকতে পারে সে কেমন মা ? আমাদের সাধ্য আমাদের ছাড়া থাকতে পারে না, আলাদা থাকার শক্তিই তাঁর নেই ; কেননা মূলে সত্তা এক-ই। **যেমন সমুদ্রে এবং তার তরঙ্গে একই জল-তত্ত্বের সত্তা বিদ্যমান, তেমনই সাধক ও সাধ্যের মধ্যে একই সত্তা বিদ্যমান**। তরঙ্গরূপটি কেবল মেনে নেওয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত

তরঙ্গরূপ শরীরের (জড়ত্বের) সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে, ততক্ষণ সে সাধক। জড়ত্ব হতে সর্বতোভাবে সম্বন্ধ-ছেদ হলে আর সাধক থাকে না, তখন শুধু সাধ্যই বিরাজ করে।

যদি সাধক সাধ্যকে ছাড়া থাকেন তাহলে বুঝতে হবে যে তিনি সাধ্য ছাড়াও অন্য কিছুরও (ভোগ ও সম্পদ সংগ্রহ করার) সাধক। তিনি মনে মনে অন্যান্য বস্তুকেও গুরুত্ব দেন। যদি সাধ্য সাধক ছাড়া থাকেন তাহলে বুঝতে হবে যে সাধ্য ছাড়াও সাধকের অন্য কোন সাধ্য আছে অর্থাৎ ভোগ ও সম্পদ সংগ্রহও তাঁর সাধ্য। হৃদয়ে বিনাশশীল বস্তুর প্রতি যত গুরুত্ব থাকবে, তাঁর সাধকভাবে ততই ন্যূনতা থাকবে। সাধকভাব যত কম থাকবে, সাধ্য থেকে তিনি ততই দূরে থাকবেন। পূর্ণ সাধক হলেই সাধ্যের প্রাপ্তি তৎক্ষণাৎ ঘটে।

শরীরকে আমি, আমার এবং আমার জন্য বলে মেনে নিলে সাধকের নিকট সাধ্য অপ্রাপ্ত মনে হয়। সাধ্য ব্যতীত অন্য সত্তা স্বীকার না করাই হলো সাধ্য প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায়। তাই সাধকের শুধু এদিকেই লক্ষ্য রাখা উচিত যে জগৎ-সংসারে সত্তা বলে কিছু নেই। এই জগৎ-সংসার আগেও ছিল না, পরেও থাকবে না এবং মধ্যবর্তী সময়েও প্রতিমুহূর্তে অনস্তিত্বের দিকে যাচ্ছে। সংসারের স্থিতি একেবারেই নেই। উৎপত্তি-প্রলয়ের প্রবাহ স্থিতিরূপে পরিলক্ষিত হয়।

সাধকের সাধ্যতে বিশ্বাস এবং ভালোবাসা (প্রেম) থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাঁর বিশ্বাস ও ভালোবাসা সেই সাধ্যের প্রতি হওয়া উচিত, যা বিবেক-বিরোধী নয়। যে বস্তু প্রাপ্ত হয় এবং যার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যায় তার প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসা হলো বিবেক-বিরোধী কাজ। বিশ্বাস এবং ভালোবাসা—দুটির মধ্যে কোন একটি হলে স্বতঃই দুটি হয়ে যাবে। বিশ্বাস দৃঢ় হলে ভালোবাসা নিজে থেকে হয়ে যাবে। ভালোবাসা যদি না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে বিশ্বাসে ন্যূনতা আছে অর্থাৎ সাধ্যের (পরমাত্মার) বিশ্বাসের সঙ্গে জগৎ-সংসারের বিশ্বাসও

জড়িয়ে আছে। পূর্ণভাবে বিশ্বাস হলে একটি সত্তা ছাড়া অন্য কিছুর (জগতের) সত্তা থাকবে না। সাধ্যের প্রতি যদি বিশ্বাসের ঘাটতি থাকে তাহলে সাধনেও বিশ্বাসের ঘাটতি থাকবে অর্থাৎ সাধ্য ছাড়া অন্যান্য ইচ্ছাও থাকবে। অন্য ইচ্ছা যত থাকবে সাধনে ততই নূন্যতা থাকবে।

সকল ইচ্ছার মূলে থাকে এক পরমাত্মারই ইচ্ছা। তাঁরই উপর সকল ইচ্ছা টিকে থাকে। এখানে যে ভুলটি হয় তা হলো এই যে, এই স্বাভাবিক (পরমাত্মার) ইচ্ছাকে আমরা শরীরের সাহায্যে পূর্ণ করতে চাই। **প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মার প্রাপ্তিতে শরীরের অথবা জগৎ-সংসারের— বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই । পরমাত্মা আমাদের নিজেদের মধ্যে স্থিত আছেন ; তাই কিছু না করলে তবেই তাঁকে অনুভব করা যায়।** কিছু করতে হলে শরীরের প্রয়োজন, কিন্তু কিছু করতে না হলে শরীরের প্রয়োজন আর কী ? কিছু দেখতে হলে চোখের প্রয়োজন হয় কিন্তু কিছু দেখতে না হলে চোখের কী প্রয়োজন ? **তবে নাম-জপাদি সাধন অবশ্যই করতে হবে ; কেননা এগুলি করলে 'কিছু না করার' সামর্থ্য আসে ।**

আমরা পরমাত্মার অংশ, তাই আমাদের সম্বন্ধ হলো পরমাত্মার সঙ্গেই । আমাদের সম্বন্ধ শরীরের সঙ্গে যেমন নেই, তেমনই শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের সঙ্গেও নেই। **আমরা যে পরমাত্মারই অংশ— এই সত্যের প্রতি সাধকের দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত।** যদি দৃঢ় বিশ্বাস করতে না পারেন তাহলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন । আমরা শরীর-সংসারের জন্য—এটি ভুল। ভুলকে ভুল বলে বুঝতে দেরী হলেও ভুল একবার জেনে গেলে সেই ভুল দূর করতে আর বিলম্ব হয় না।

নিয়ম হলো এই যে, অ-সতের (পদার্থ ও ক্রিয়ার) দ্বারা পরমাত্মার প্রাপ্তি হয় না, তা হয় অ-সতের থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হলে তবেই। অসৎ হতে সর্বভাবে সম্বন্ধ-ছেদ করার জন্য সাধকের তিনটি কথা স্বীকার

করা আবশ্যক—

১) কিছুই আমার নয়।

২) আমার কিছুই চাই না ।

৩) আমি কোন কিছু নই।

এখন এই তিনটি কথা নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করা যাক।

প্রথম কথা—কিছুই আমার নয়। এটি স্বীকার করার জন্য সাধককে এই কথাটি মনন করতে হবে যে আমরা নিজেদের সঙ্গে কী এনেছি এবং সঙ্গে কী নিয়ে যাব ? ভেবে দেখলে সাধক জানতে পারবেন যে, আমরা কোন কিছুই সঙ্গে করে আনিনি এবং কিছুই নিয়ে যেতে পারব না। তাৎপর্য হলো এই যে, **যে বস্তু প্রাপ্ত হয় এবং যার সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ হয়ে যায় তা আমাদের হতে পারে না**। যা উৎপন্ন হয় ও বিনাশ হয়, তা কখনো আমাদের হতে পারে না। যে বস্তু আসে ও চলে যায়, তা আমাদের হতে পারে না। তার কারণ স্ব-স্বরূপ—প্রাপ্ত ও পরিত্যাগযুক্ত, উৎপন্ন ও বিনাশশীল এবং আসা-যাওয়াযুক্ত নয়। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সামান্যতম বস্তুও আমাদের নয়।

দ্বিতীয় কথা—আমার কিছুই চাই না । সাধকের চিন্তা করে দেখা উচিত যে, জগৎ-সংসারের কোন বস্তুই যখন আমার নয়, তখন আর আমার কী চাই ? শরীরকে নিজের বলে মনে করলেই কামনা উৎপন্ন হয় যে আমার খাদ্য চাই, বস্ত্র চাই, বাড়ি চাই। **সাধকের এই বিষয়ে চিন্তা করা উচিত যে শরীর থেকে পৃথক হলে আমার আর কী চাই** ? অর্থাৎ সাধক যখন এই সত্যকে স্বীকার করেন যে, তাঁর কোন কিছুই নেই, তখন তিনি এই সত্যকে স্বীকার করতেও সক্ষম হন যে তাঁর কিছুই চাই না।

তৃতীয় কথা—আমি কোন কিছু নই। শরীর এবং জগৎ-সংসারকে সকলেই দেখতে পায়, কিন্তু 'আমি' কে কেউ দেখেনি। শরীরের প্রতীতি

হয় আর স্ব-স্বরূপের অনুভূতি হয়, কিন্তু 'আমি'র প্রতীতিও হয় না এবং তার অনুভূতিও হয় না। 'আমি'র শুধু আভাস হয়ে থাকে। সাধক যখন এই সত্যটি স্বীকার করে নেন যে তাঁর কিছুই চাই না, তখন তিনি এই সত্যকে স্বীকার করতেও সক্ষম হন যে 'আমি' কিছুই নই। **যার মধ্যে জাগতিক মোহ এবং পরমাত্মার জন্য জিজ্ঞাসা থাকে, তাকে 'আমি' বলে বলা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'আমি' কিছুই নয়।** সুষুপ্তিকালে স্ব-স্বরূপ থাকেন, কিন্তু 'আমি' থাকে না। **সুষুপ্তিতে স্ব-স্বরূপের অস্তিত্ব এবং 'আমি'র অনস্তিত্ব সকলেই অনুভব করে থাকেন।**

কিছুই আমার নয় এবং আমার কিছুই চাই না— এই দুটি কথা সিদ্ধ হওয়া মাত্র 'আমি' কেবল সত্তায় অর্থাৎ 'আছে'তে বিলীন হয়ে যায়। তাৎপর্য হলো যে, চেতন অংশ চেতন-তত্ত্বে এবং জড় অংশ জড়তে বিলীন হয়ে যায়। তখন একমাত্র সমষ্টি সত্তা ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

প্রকৃতির স্বরূপ হলো—পদার্থ এবং ক্রিয়া। পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, ক্রিয়ার আরম্ভ ও শেষ হয়। শরীরাদি পদার্থের আশ্রয় হলো 'পরাশ্রয়' এবং ক্রিয়ার আশ্রয় হলো 'পরিশ্রম'। পরমাত্মাকে লাভ করতে হলে ক্রিয়া এবং পদার্থের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। **সংসারে তো 'করা' হলো মুখ্য কিন্তু পরমাত্মাতে 'না করা'ই হলো মুখ্য। শরীর এবং জগৎ-সংসারের সাহায্যে পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না।** যে তত্ত্ব সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, তাকে করার দ্বারা কী করে পাওয়া যাবে ? 'কিছু করলে' বরং তা বহু দূরে হয়ে যায়।

শরীর-ইন্দ্রিয়সকল-মন-বুদ্ধি-যোগ্যতা-বল ইত্যাদি সবই প্রকৃতির। **এগুলির আশ্রয় নিলে প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়।** প্রকৃতির আশ্রয় নিলে পরমাত্মা-লাভ কীকরে হবে ? শরীর প্রকৃতির হওয়ায় তা আমার নয় এবং আমার জন্যও নয়। তাই শরীরের সাহায্যে যেসব কর্ম করা হয়, সেগুলি সংসারের জন্যই করা উচিত। শরীরের দ্বারা জপ-ধ্যান-পূজা-তীর্থ-ব্রত ইত্যাদি যেসব কাজ করা হোক, সেগুলি এই ভাব নিয়ে করা

উচিত যাতে অপরের মঙ্গল হয়। **নিজের জন্য কিছু করলে তা ভোগ হয়, যোগ নয়।** অর্থাৎ শরীর এই জগৎ-সংসারের অংশ, তাই শরীরের সাহায্যে হওয়া প্রতিটি ক্রিয়াই সংসারের জন্য, আমাদের জন্য নয়। **আমাদের জন্য কেবল পরমাত্মা ; কেননা আমরা হলাম তাঁরই অংশ।** সুতরাং পরাশ্রয় এবং পরিশ্রম হলো ভোগ। **যিনি পরাশ্রয় ত্যাগ করে ভগবদাশ্রয়কে অবলম্বন করেন এবং পরিশ্রমকে ত্যাগ করে বিশ্রামের আশ্রয় নেন, তিনি হলেন যোগী। অপরপক্ষে, যে পরাশ্রয় ও পরিশ্রমকে অবলম্বন করে, সে হলো ভোগী।**

পরাশ্রয় এবং পরিশ্রমে সকলেই পরাধীন কিন্তু ভগবদাশ্রয় ও বিশ্রামে সকলেই স্বাধীন। **পরাশ্রয় এবং পরিশ্রম তো জগৎ-সংসারের জন্য, কিন্তু ভগবদাশ্রয় ও বিশ্রাম হলো নিজের জন্য।** সাধকের মধ্যে যে অপূর্ণতা থাকে তা পরাশ্রয় ও পরিশ্রমেরই জন্য। **ভগবদাশ্রয় ও বিশ্রাম আসা মাত্র মানব-জীবন পূর্ণতা লাভ করে।** তার কারণ ভগবান ব্যতীত এমন কেউ নেই যিনি সর্বক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকেন, যাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ না হয়। সংসারে প্রাপ্তির জন্য হলো ক্রিয়া এবং পরমাত্মার প্রাপ্তির জন্য হলো বিশ্রাম। ক্রিয়ার দ্বারা শক্তির হ্রাস হয় এবং অ-ক্রিয়ার দ্বারা অর্থাৎ বিশ্রামের দ্বারা শক্তির সঞ্চয় হয়। শুধু তাই নয়, সমস্ত শক্তিই অক্রিয় তত্ত্বের দ্বারা প্রকটিত হয়ে থাকে । মানুষ সারাদিন পরিশ্রম করে রাত্রিতে ঘুমোয়। নিদ্রায় তার ক্লান্তি দূর হয়ে যায় এবং আবার কাজ করবার শক্তি লাভ করে। কিন্তু নিদ্রার সুখ হলো তামস—**'নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্'** (গীতা ১৮।৩৯)। **নিজের জন্য বিশ্রাম করা অর্থাৎ কিছু না করা হলো ভোগ, কিন্তু পরমাত্মার জন্য বিশ্রাম করা হলো সাধনা ; কেননা পরমাত্মা হলেন পরম বিশ্রাম-স্বরূপ।** সুতরাং বিশ্রাম নিজের জন্য না হয়ে পরমাত্মার জন্য হওয়া উচিত। **নিত্য পরমাত্মাসত্তায় সদা-সর্বদা স্থিত থাকাই হলো পরমাত্মার জন্য বিশ্রাম করা।** পরমাত্মার জন্য যে বিশ্রাম তা তামস নয়, সেটি সাত্ত্বিক হয়ে গুণাতীত হয়ে যায় ।

তাই সাধকের কাছে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান দুটি কথা হলো—ভগবদাশ্রয় এবং বিশ্রাম। ভগবদাশ্রয় এবং বিশ্রামে পারমার্থিক ইচ্ছা পূর্ণ হয় এবং সাংসারিক ইচ্ছা দূর হয়। যদি সাধকের ভগবানের প্রতি বিশ্বাস না থাকে বরং নিজের উপরেই বিশ্বাস থাকে, তাহলে তিনি স্বাশ্রয়ের আশ্রয় নিতে পারেন। সাধকের যদি ভগবানের উপরে কিংবা নিজের উপরেও বিশ্বাস না থাকে, তাহলে তিনি ধর্মের অর্থাৎ কর্তব্যের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন। আমি ভগবানের, ভগবান আমার—এ হলো ভগবানের আশ্রয়। কিছুই আমার নয়, কিছুই আমার চাই না—ওইটি হলো 'স্ব'-এর আশ্রয়। পদার্থ এবং ক্রিয়া হলো কেবল অপরের কল্যাণের জন্য—এটি হলো কর্তব্য-কর্মের অর্থাৎ ধর্মের আশ্রয়। ভগবানের আশ্রয় হলো 'ভক্তিযোগ'; 'স্ব'-এর আশ্রয় হলো 'জ্ঞানযোগ'; কর্তব্য-কর্মের অর্থাৎ ধর্মের আশ্রয় হলো 'কর্মযোগ'। যদিও এই তিনটি যোগমার্গ দ্বারা পদার্থ ও ক্রিয়ারূপ প্রকৃতির আশ্রয় দূরীভূত হয় এবং কেবল সত্তাতেই নিজের স্বতঃসিদ্ধ স্থিতির উপলব্ধি হয়ে যায়, তবুও এই তিনটির মধ্যে ভগবানের আশ্রয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ ; কেননা মূলত আমরা ভগবানেরই অংশ। ভগবদাশ্রয়ের দ্বারা মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিও লাভ হয় আর এটিই হলো মানব জীবনের চরম লক্ষ্য।

একমাত্র 'আছে' (সত্তামাত্র) ছাড়া আর কিছুই নেই—এটি জানা হয়ে গেলে মুক্তি হয়ে যায় এবং সেই 'আছে' হলো নিজের—এটি মেনে নিলে ভক্তি লাভ হয়। প্রকৃতপক্ষে যা 'আছে', সেইটিই নিজের হতে পারে ; যা 'নেই', তা নিজের কী করে হতে পারে ? সাধক যদি অ-সতের সত্তাকে স্বীকার না করেন এবং নিজের কোন আগ্রহ না রাখেন, তাহলে স্বতঃই ভক্তিলাভ হয়।

~~O~~

ক্রিয়া ব্যতিরেকে পরমাত্মাপ্রাপ্তি

জগৎসংসার সর্বত্র পরমাত্মাতত্ত্ব দ্বারা পরিপূর্ণ—**'ময়া ততমিদং সর্বম্'** (গীতা ৯।৪), **'সমোঽহং সর্বভূতেষু'** (গীতা ৯।২৯)। যদি কেউ পরমাত্মাকে পেতে চায় তাহলে সে যেন কোন কিছুই চিন্তন না করে। যা সর্বব্যাপী, সেটি নিয়ে চিন্তা তো হতেই পারে না। **কোনরূপ চিন্তা ছাড়া থাকলে আমার স্থিতি তো স্বতঃই পরমাত্মাতেই হয়ে থাকে।** এইজন্য পরমাত্মাপ্রাপ্তির ঠিক ঠিক সাধন হলো, কোনরকম চিন্তন না করা ; না পরমাত্মার, না সংসারের, না অন্য কোন কিছুর। **সাধক যে অবস্থাতেই থাকুক, সেখানেই সে স্থির হয়ে যাক, কারণ সেখানেই পরমাত্মা রয়েছেন।** ক্রিয়া তো তারই জন্য হতে পারে, যা স্থান-কাল-পাত্র আদি বিচারে ভিন্ন ভাবে আছে, দূরে আছে। কিন্তু যা সর্বত্র, সর্বদা, সর্ব বস্তুতে, সর্ব জীবে, সর্ব অবস্থায়, সকল পরিস্থিতিতে, সমস্ত ঘটনায় নিত্য বিদ্যমান তার প্রাপ্তির জন্য কোন ক্রিয়ার প্রয়োজনটা কোথায় ?

মৌন থাকা, শান্ত হওয়া, কিছু না করা খুবই বড় এমন এক সাধনা, যার বিষয়ে বহুজনেই অবহিত নন। ক্রিয়ার মাধ্যমে জাগতিক প্রাপ্তি হয়, আর ক্রিয়া বিহীন থাকলে পরমাত্মা প্রাপ্তি হয়। জগৎ-সংসারের স্বরূপ বা স্বভাব হলো ক্রিয়াশীলতা (শ্রম) আর পরমাত্মার স্বরূপ হলো নিষ্ক্রিয়তা (বিশ্রাম)। প্রত্যেক ক্রিয়ারই আরম্ভ ও শেষ থাকে, কিন্তু ক্রিয়াতীত তত্ত্ব থাকে একইরূপে নির্বিকার। শুধু তাই নয়, এই ক্রিয়াতীত তত্ত্ব থেকেই সকল ক্রিয়াকর্মের উৎপত্তি ঘটে এবং সেগুলির লয়ও হয় ওই তত্ত্বের মাঝেই। ক্রিয়ার ফলে শক্তির হ্রাস হয় আর নিষ্ক্রিয়তায় হয় শক্তির সঞ্চয়। **এইজন্য সাধকের উচিত প্রতিটি ক্রিয়ার (কর্মের) আগে এবং শেষে শান্ত (চিন্তাহীন) হয়ে যাওয়া।** প্রথমে শান্ত হয়ে শ্রবণ করলে শ্রুত বাক্য বিশেষভাবে উপলব্ধ হতে পারবে, পঠন করলে পঠিত কথা বিশেষভাবে বুঝতে পারা যাবে। আবার শেষে শান্ত

হলে শ্রুত বা পঠিত বিষয় ধারণা করতে শক্তিলাভ হবে। ক্রিয়ার কালে আসে বৈষম্য আর ক্রিয়াশূন্য দশায় থাকে সমতা। এইজন্য সক্রিয়তায় কোন দু-জন ব্যক্তির সামর্থ্য সমান হতে পারে না, কিন্তু নিষ্ক্রিয় থাকলে লক্ষ-কোটি মানুষও একইরকম অবস্থার হয়। কেউ বিদ্বান বা মূর্খ হোক, ধনী বা নির্ধন হোক, রোগী বা নীরোগ হোক, দুর্বল বা বলবান হোক, যোগ্য বা অযোগ্য হোক, নিষ্ক্রিয় দশায় সকলেই এক দশার হয়ে যায়, সবার স্থিতিই পরমাত্মা-গত হয়ে যায়। অর্থাৎ **কিছু চিন্তা করলেই সেই দশা হবে সংসারগত, আর চিন্তাবিহীন থাকলে সেটি হবে পরমাত্মাগত স্থিতি**। প্রকৃতপক্ষে আমাদের স্থিতি স্বতঃই আছে পরমাত্মাতে, কিন্তু চিন্তা থাকে বলে এটি বোধগম্য হয় না। এইজন্য ভগবান গীতায় বলেছেন—

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ (৬।২৫)

'ধৈর্যসহ বুদ্ধির দ্বারা জগৎ থেকে ধীরে ধীরে উপরত হবে এবং মন (বুদ্ধি)কে পরমাত্মাস্বরূপে সম্যক্‌ভাবে স্থাপন করে আর কোন প্রকার চিন্তা করবে না।'

অর্থাৎ, সাত্ত্বিক বুদ্ধি ও সাত্ত্বিক ধৃতি দ্বারা ক্রিয়া ও পদার্থ সমন্বিত এই জগৎসংসার থেকে ধীরে ধীরে নিজের বোধ শক্তিকে সরিয়ে নাও, তাড়াহুড়ো করবে না, কারণ তাড়াহুড়ো করলে সাধনা উত্তম হয় না। **এক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা ব্যতীত আর কিছুই নেই—এইরূপ নিশ্চিত ধারণা করে আর কোন চিন্তা করবে না**। পরমাত্মা স্বত স্বাভাবিক সদ্‌ঘন, চিদ্‌ঘন এবং আনন্দঘন। 'ঘন' অর্থাৎ ভরাট, যেমন, পাথর বা কাঁচ ভরাট হয়, যার ফলে তার মধ্য দিয়ে ছুঁচ পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে না। পরমাত্মা তো পাথর বা কাঁচের চেয়েও বেশি ভরাট বা পূর্ণ। কারণ পাথর বা কাঁচে অগ্নি প্রবিষ্ট হতে পারে, কিন্তু পরমাত্মার মধ্যে কোন কিছুই প্রবেশ করতে পারে না। **এইরূপ সম্পূর্ণভাবে ভরাট বা পূর্ণসত্তা পরামাত্মাকে নিয়ে সাধক যদি চিন্তা করে তো উল্টে তা তার থেকে দূরে সরে যাবে। এইজন্য, সে যেখানে আছে, সেখানেই (নিদ্রা-আলস্য**

পরিত্যাগ করে) নিজের অন্তরে-বাইরে তাকে মৌন শান্ত থাকার স্বভাব করে নিতে হবে। এটি খুবই সুগম তথা উত্তম সাধনা। এর দ্বারা খুবই শান্তিলাভ হবে এবং সমস্ত পাপ-তাপও নষ্ট হয়ে যাবে।

অনুরাগ-বিদ্বেষ, হর্ষ-শোক, সুখ-দুঃখ আদি দ্বন্দ্ব আর যাতে না হয়, সেটাই হলো উপরত হওয়ার তাৎপর্য। রাস্তায় চলাকালে যেমন কোথায়ও পাথর পড়ে থাকলে কিংবা কাঠ পড়ে থাকলে বা কাগজ পড়ে থাকলে, তাতে পথিকের কিছু আসে-যায় না, তেমনই কোন রকম ক্রিয়া বা বস্তু বিষয়ে সাধকেরও কোনও প্রয়োজন নেই—**'নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন'** (গীতা ৩।১৮)। এসব থেকে অসঙ্গভাবে থাকতে হয়। **তটস্থ থাকাটাও একটা বিদ্যা।** সাধক তটস্থ থেকে যদি সব কর্ম করতে পারেন তো তিনি সংসার-জগৎ থেকে অসঙ্গ হয়ে যান। সংসারে লাভ হোক, ক্ষতি হোক, সমাদর হোক, অনাদর হোক, সুখ হোক, দুঃখ হোক, প্রশংসা হোক, নিন্দা হোক, এসবে যদি তটস্থ থাকা যায় তাহলে পরমাত্মাপ্রাপ্তি হয়ে যায়। কিন্তু যদি এসবে অনুরাগ-বিদ্বেষ, হর্ষ-শোক, সুখ-দুঃখ ভাব সে রাখে তাহলে তো তা ভোগই হয়ে যাবে, যোগ নয়। ভোগীর কল্যাণলাভ হয় না। এইজন্য শ্রীতুলসীদাস বলেছেন—

তুলসী মমতা রাম সোঁ, সমতা সব সংসার।
রাগ ন রোষ ন দোষ দুখ, দাস ভএ ভব পার॥

(দোঁহাবলী ৯৪)

গীতায় আছে—

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ (৬।৩)

'যে যোগে (সমতায়) আরূঢ় হতে চায়, এমন মননশীল যোগীর (সাধন-রূপে) কর্তব্য-কর্ম পালনই কারণ-রূপে উক্ত হয়েছে, আর এরূপ যোগারূঢ় ব্যক্তির শম (শান্তি) প্রাপ্তি পরমাত্মাপ্রাপ্তির কারণ রূপে উক্ত হয়েছে।'

শম (শান্তি)-এর অর্থ হলো—কিছু না করা। **যতকাল 'করার' সঙ্গে**

সম্বন্ধ থাকে, ততকালই প্রকৃতির সাথে সম্বন্ধ, আর যতকাল প্রকৃতির সাথে সম্বন্ধটি থাকে, ততকাল অশান্তি, দুঃখ, জন্ম-মৃত্যুও থাকে। প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ হতে পারে 'না করা'র মধ্য দিয়েই। কারণ ক্রিয়া ও পদার্থ দুটিই প্রকৃতির। চৈতন্য-তত্ত্বে ক্রিয়াও নেই, পদার্থ বা বস্তুও নেই। ক্রিয়া বা কর্ম অনিত্য আর নৈষ্কর্ম্য নিত্য। কর্মের আরম্ভ ও শেষ আছে, কিন্তু নৈষ্কর্ম্য নিত্য-নিরন্তর সমভাবেই বিদ্যমান। এই কারণে পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য 'শম' অর্থাৎ কিছু না করাই হলো কারণ। হ্যাঁ, যদি এই শান্তিকে উপভোগ করা হয় তবে কিন্তু পরমাত্মা প্রাপ্তি হবে না। 'আমি শান্ত আছি'—এইরকম শান্তির বোধে অহংকার যুক্ত করলে তথা 'খুবই শান্তি হচ্ছে'—এইরকম ভাবসহ শান্তিতে তুষ্ট হয়ে গেলে তাতে শান্তির উপভোগ হয়ে যায়। তাই শান্তির সঙ্গে ব্যক্তির নিজস্বতা মিলিত করতে নেই বরং ভাবতে হয় যে, শান্তিটি ব্যক্তিনিরপেক্ষ স্বাভাবিক তত্ত্ব। শান্তিকে উপভোগ করলে শান্তি চিরস্থায়ী হবে না, উল্টে চাঞ্চল্য ঘটবে অথবা নিদ্রা এসে যাবে। উপভোগ না করলে শান্তি বিদ্যমান থাকবে। ক্রিয়া ও অভিমান বিনা যে স্বাভাবিক শান্তিবোধ হয়, তাই হলো 'যোগ', কারণ ওই শান্তির কোন কর্তা বা ভোক্তা নেই। যেখানেই কর্তা বা ভোক্তা থাকে, সেখানে ভোগই হয়। ভোগ হলে সাধকের স্থিতিটি জাগতিক হয়ে যায়।

সকল কর্ম এবং বস্তুই জগতের তথা জগতের জন্যই হয়। এই কারণে কর্মযোগী এইগুলিকে নিজের বা নিজের জন্য না মনে করে সংসারের সেবাতেই নিয়োজিত করে। সেবায় নিয়োজিত করলে কর্ম ও বস্তুময় সংসার থেকে তার সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে যায়। প্রকৃতি হলো শ্রম-রূপ আর পরমাত্মাতত্ত্ব হলো বিশ্রামরূপ। এই কারণে জ্ঞানযোগী কর্ম ও বস্তু থেকে অসঙ্গ হয়ে বিশ্রামকেই বরণ করে নেয়। বিশ্রামকে বরণ করার তাৎপর্য হলো, নিজের যে চিন্ময় স্বরূপ-সত্তা, তাতে স্বতঃসিদ্ধ স্থিতির অনুভব করা। কিন্তু **ভক্তিযোগী ভগবদাশ্রয়কেই গ্রহণ করে অর্থাৎ, নিজের চিন্ময় সত্তা যাঁর অংশ, সেই ভগবানেরই আশ্রয় গ্রহণ করে। সেবা ও বিশ্রামে 'মুক্তি' ঘটে আর ভগবদাশ্রয়ে 'প্রেম'-এর প্রাপ্তি হয়।**

এটি একটি সিদ্ধান্ত যে, যে তত্ত্ব সর্বব্যাপী তাকে কোন ক্রিয়া দ্বারা লাভ করা সম্ভব নয়। ক্রিয়া করা মাত্রই তো মানুষের সেই তত্ত্বের সঙ্গে ভিন্নতার ভাব এসে যায়। কিন্তু **কোন রকম ক্রিয়া না করলে এই পরমাত্মাতত্ত্বেই তার স্থিতি থাকবে**। এইজন্য সাধকের প্রয়োজন চলা-ফেরায়, ওঠা-বসায় সব সময়েই শান্ত (নিশ্চুপ, মৌন, কিছু না করা) থাকার স্বভাব করে নেওয়া।

সর্বদা শান্ত থাকতে গেলে সাধকের সামনে মুখ্য বাধা রূপে আসে ব্যর্থ বা বৃথা চিন্তা-ভাবনা। যখনই সাধক কোন কাজ শেষ করে কিছুক্ষণের জন্য শান্ত হয়ে বসতে যায়, তখন তার মনে অতীত বা ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত স্থান, কাল, বস্তু, ব্যক্তি ও ঘটনা ইত্যাদির চিন্তা শুরু হয়ে যায়। অতীতের বা ভবিষ্যতের বিষয় এখন (বর্তমানে) তো নেই, তাই **বৃথা চিন্তার অর্থ হলো, যা 'নেই' তা নিয়ে চিন্তা করা। যে বিষয়ের প্রাপ্তি কর্ম-সাপেক্ষ তা নিয়ে চিন্তা করাও বৃথা চিন্তা। যার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই তা নিয়ে চিন্তা করাও বৃথা বা ব্যর্থ চিন্তা।**

নিজে চিন্তা করা এক ব্যাপার, আর স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তা আরেক ব্যাপার। যখন কারো তৃষ্ণা পায়, তখন সে নিজে জলের জন্য চিন্তা করে না, জলের চিন্তা আপনা থেকেই আসে। এই রকমই সাধকেরও পরমাত্মার চিন্তা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হওয়া উচিত, কারণ এর প্রকৃতই আবশ্যকতা রয়েছে। কিন্তু (সাধারণত) সাধকের দশা হয়ে যায় এমন যে, পরমাত্মার চিন্তাটা করেন তিনি নিজে আর সংসারের চিন্তাই হয়ে যায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তিনি সংসার নিয়ে বৃথা চিন্তাকে দূর করার জন্য সঠিক চিন্তা (ভগবানের নামরূপাদির চিন্তা, আত্মচিন্তা ইত্যাদি) করার চেষ্টা করেন। এর ফলে জোর করে করা চিন্তার প্রভাব অন্তঃকরণে গ্রথিত হয়ে যায়, ওদিকে বৃথা চিন্তাটাও পূর্ববৎ চলতে থাকে। সিদ্ধান্ত হলো এই যে, যথার্থ চিন্তা করলেই ব্যর্থ চিন্তা দূর হয় না, উল্টে সাধকের মনে, 'আমি এতকাল ধরে সাধনা করেছি, এত বছর ধরে সাধনা করেছি'—এইরকম ধারণাকে কেন্দ্র করে অভিমানের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সে যখন সঠিকভাবে নিজের দশার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, সে হতাশ হয়ে দেখে এত সাধনা

করেও তার প্রকৃত শান্তি প্রাপ্ত হয়নি। যতকাল ব্যর্থ চিন্তা থাকে ততকাল সাধকের অন্তরে না হয় শান্তি বা স্বাধীনতাবোধ, না হয় প্রিয় সুখের প্রাপ্তি। শুধু তাই নয়, নিরাশ হয়ে সাধক নিজের মধ্যে অসামর্থ্য অনুভব করতে শুরু করে। এই অসামর্থ্যের ফলে তার যা করা উচিত নয়, সে তা করে বসে আর যে কাজ করা প্রয়োজন, তা করে না। এই অসামর্থ্যের কারণেই সে নিজের কর্তব্য, নিজের স্বরূপ তথা নিজের অংশী পরমাত্মাকে বিস্মৃত হয়ে যায়। এই অসামর্থ্য দূর করার জন্য বিশ্রামের (শান্তির) প্রয়োজন এবং বিশ্রাম লাভের জন্য আবশ্যক হলো ব্যর্থ বা বৃথা চিন্তা দূর করা।

এখন, এই বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করা প্রয়োজন যে, কী কী কারণে ব্যর্থ চিন্তা হয় এবং সেগুলির দূরীকরণের উপায় কী—

১) **আবশ্যক কার্য না করলে**—অবশ্যকরণীয় কাজগুলি না করলে বৃথা চিন্তা হতে থাকে। তাই সাধকের কর্তব্য হলো যে কাজ করা উচিত, যে কাজ সে করে ফেলতে পারে এবং যে কাজ বর্তমানেই করে ফেলা প্রয়োজন, এই রকম আবশ্যক কাজ সেরে ফেলা।

২) **অনাবশ্যক কাজ করলে**—অনাবশ্যক কাজ করলে কিংবা তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করলে ব্যর্থ চিন্তা হতে থাকে। যে কাজ করা উচিত নয়, যা করা সম্ভব নয় এবং বর্তমানের সঙ্গে যে কাজের সম্বন্ধ নেই, তাকে অনাবশ্যক কার্য বলে অভিহিত করা হয়। তাই সাধকের উচিত কখনো অনাবশ্যক কাজ না করা তথা তা নিয়ে অযথা চিন্তা-ভাবনা না করা।

৩) **মমত্ব পোষণ করলে**—সাধকের যে বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি মমত্ব আছে অর্থাৎ যাকে সে নিজের তথা নিজের জন্য বলে মনে করে, তা নিয়ে তার চিন্তা-ভাবনা আপনা থেকেই হতে থাকে। তাই সাধকের এই রকম বিচার-বিবেচনা করতে হবে যে, যা পাওয়া যায় এবং হারাতেও হয়, সুতরাং তা নিজের হবে কী করে!

৪) **কামনা করলে**—সাধকের মনে যা নিয়ে কামনা থাকে সে বিষয়ে স্বতঃই চিন্তা ওঠে। কামনাকে দূর করার জন্য সাধককে বিচার

করতে হবে এইভাবে যে, শুধু চাইলেই কোন বস্তু পাওয়া যায় না। বস্তু-প্রাপ্তিটা হয় প্রারব্ধের অধীনে, কামনার অধীনে নয়। যদি কাম্য বস্তু পাওয়াও যায়, তা টিকে থাকে না, কারণ যার প্রাপ্তি আছে তার বিচ্ছেদও আছে, এই-ই নিয়ম। সংযোগ থাকলে বিয়োগও অবশ্যম্ভাবী। প্রাপ্ত বস্তু দিয়ে মানুষের কখনো প্রকৃত তৃপ্তি হয় না। একটি কামনা পূরণ হওয়া মাত্রই আরেকটি নতুন কামনার সৃষ্টি হয়। অতএব কামনার কোন শেষ নেই।

৫) **তাদাত্ম্যবোধ করা**—শরীরকে 'আমি', 'আমার' এবং 'আমার জন্য' বলে মনে করলে সাধক ব্যর্থ চিন্তা থেকে রেহাই পেতে পারেন না। 'এইটি'কে 'আমি' বলে মনে করা বিবেক-বিরুদ্ধ ভাবনা। কারণ 'এইটি' (শরীর) কখনই 'আমি' (স্বরূপ) হতে পারে না। শরীরের বিভাগ আর স্বরূপের বিভাগ একেবারে ভিন্ন।

৬) **ভুক্ত ও অভুক্তের প্রভাব**—সাধক যে সব বিষয়কে ইন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগ করেছে কিংবা উপভোগ করতে চায়, সেই সব ভুক্ত বা অভুক্ত বিষয়ের প্রভাব তার অন্তঃকরণে পড়ে এবং সেগুলি বৃথা চিন্তারূপে প্রকাশিত হয়। এই প্রভাবকে দূর করার জন্য সাধকের প্রয়োজন ব্যর্থ বা বৃথা চিন্তার প্রশ্রয়দান বা বিরোধিতা কোনটাই না করা। ওগুলিকে সে তো নিজের মনে আনবেই না, সেগুলিকে সত্য বলেও মনে করবে না। ব্যর্থ-চিন্তা নিয়ে অনুরাগ বা বিদ্বেষ করলে কিংবা নিজের বলে মনে করলে সাধকের মধ্যে ওইগুলির ভাবই জাগবে। তাই সাধকের প্রয়োজন ওই সকল ব্যর্থ চিন্তাকে উপেক্ষা করা। উপেক্ষা করলে ওইগুলি আপনা থেকেই সরে যাবে। কারণ বৃথা চিন্তা স্বাভাবিক নয়, বরং তা অস্বাভাবিক তথা ভ্রান্তই। ওইসব চিন্তা দূর হলে 'শান্তি' অর্থাৎ 'বিশ্রাম' স্বাভাবিকভাবেই লাভ হবে। কারণ **'বিশ্রাম' স্বতঃসিদ্ধ, তা চেষ্টাসাধ্য নয়**। বিশ্রামের ফলে সাধকের কর্তব্য-পালন, স্বরূপ-জ্ঞান তথা পরমাত্মার উপলব্ধির সামর্থ্য প্রাপ্তি হয়, যে প্রাপ্তির ফলে মানবজীবন হয়ে ওঠে সার্থক।

~~0~~

সত্যের অনুসন্ধান

শাস্ত্রে বলা হয়েছে, মনুষ্যশরীর হলো কর্মপ্রধান। যখন মানুষের অন্তরে কিছু পাওয়ার জন্য ইচ্ছা হয়, তখনই তার কাজ করার প্রবৃত্তি হয়। কর্ম দুই রকমের হয়—কর্তব্য ও অকর্তব্য। **নিষ্কামভাব সহ কর্ম করা হলো 'কর্তব্য', আর সকামভাবসহ কর্ম করা 'অকর্তব্য'। সম্বন্ধজনিত সুখের বাসনাই হলো অকর্তব্যের মূল কারণ।** নিজের সুখের কামনা যদি দূরীভূত হয় তাহলে আর অকর্তব্য হয় না। অকর্তব্য না হওয়ায় কর্তব্যের পালন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হয়ে যায়। **যে সাধনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয় তাই হলো প্রকৃত, আর যে সাধন করা হয় তা হয় কৃত্রিম।**

মানুষের মনে যদি কোন কামনা জাগে, তাহলেই তার পূরণ হবে এমন কোন নিয়ম নেই। কামনা পূরণ হতেও পারে, নাও হতে পারে। কখনো কোন ব্যক্তির সমস্ত কামনারই পূরণ হয়নি, তা হতেও পারে না। যদি কারোর মনে কোন কামনা জাগে, কিন্তু সেটি পূর্ণ না হয় তাহলে তার খুব দুঃখ হয়। কিন্তু মানুষের এমনই দশা যে, কামনার পূর্তি না হলে সে দুঃখও পায়, এদিকে ফের কামনাও করে। এর পরিণাম হয় এই যে, তার সব কামনার পূর্তি তো হয়ই না, আবার দুঃখও দূর হয় না। এই কারণে **দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে মানুষের একটাই পথ আছে—কামনা ত্যাগ।** এখানে একটা সংশয় হতে পারে যে, যদি মানুষ কোন কামনাই না করে তাহলে সে কর্ম করবে কেন ? এর সমাধান হলো এই যে, **ফলপ্রাপ্তির জন্য যেমন কর্ম করা যায়, তেমনই ফলের আশা ত্যাগ করার জন্যও কর্ম করা হয়।** যে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়, সে তো ফলের ইচ্ছা ত্যাগ করার জন্যই কর্ম করে। এটি নিয়েও সংশয় হতে পারে যে, একজন মানুষ যদি কোন কামনাই না করে, তো তার জীবন-নির্বাহ হবে কী করে ? জীবন-ধারণের জন্য তো অন্ন-জল ইত্যাদি চাই। এর উত্তরে বক্তব্য হলো, অন্ন-জল নিয়ে নিয়ে তো বহু বছরই কেটে যায়

তাতে কী সত্যিই ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় ? ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না। অন্ন-জল বিনা মানুষ বাঁচতে পারে না, কিন্তু অন্ন-জল ঠিকমতো পেলেও কি মানুষের মৃত্যু হয় না ? মৃত্যু তো হবেই। **বস্তুত আমাদের জীবন-ধারণ কামনা-পূর্তির অধীনে নয়।** জন্মগ্রহণের পর শিশু কি মাতৃদুগ্ধ কামনা করে, তবে পায় ? জীবন-ধারণ কামনার দ্বারা হয় না, হয় একটা নির্দিষ্ট বিধানের মাধ্যমে।

কখনো কারোর সব কামনার পূর্তি হতে পারে না। কিছু কামনার পূর্তি যেমন হয়, তেমন কিছু কামনার হয় না—সকলেরই এই একই অভিজ্ঞতা। এই ব্যাপারে বিচার করা উচিত যে, কোন মানুষের কোন কামনার পূর্তি হলে এবং কোনও কামনার পূর্তি না হলে এই দুই ভিন্ন দশায় তার অস্তিত্বে কি কোন তফাত ঘটে ? কামনার পূর্তি না হলে কি তার অ-ভাব হয়ে যায় ? বিচার করলে দেখা যাবে, **কামনার পূর্তি হোক বা না হোক আমার সত্তা (অস্তিত্ব) যেমন ছিল ঠিক সেরকমই থাকে।** কামনা উৎপন্ন হওয়ার আগে আমি যেমন ছিলাম, কামনার 'পূর্তি' হওয়ার পরও আমি তেমনই থাকি। কামনার 'অপূর্তিতে'ও আমি সেই একরকমই থাকি। আবার কামনার 'নিবৃত্তি' হলেও আমি ঠিক সেরকমই থাকি। এই আলোচনা থেকে, প্রত্যয় সহকারে একটি কথা বলা যায় যে, যদি কামনার অপূর্তিতে আমার কোন হানি না হয়, তাহলে আমি কেন কামনা করে দুঃখ পেতে যাব ?

মানুষের সামনে আছে শুধু দুটো দিক—হয় সে নিজের সকল কামনা পূর্ণ করে নিক, নয়তো সে কামনা ত্যাগ করুক। কিন্তু সকল কামনাকে পূরণ করা তো সম্ভব নয়, তাহলে সেগুলিকে ত্যাগ করায় ভয়টা কোথায় ? যা আমি করতে পারি, তা তো করি না। কিন্তু যা করতে পারি না, সেটা করার জন্য ব্যগ্র হই—এই ভুল করার ফলেই আমরা দুঃখ ভোগ করি।

যে মানুষ কামনা মুক্ত হতে চায়, তার সর্বপ্রথম করণীয় হলো এই প্রত্যয় যে, 'জগতে আমার কোন কিছুই নেই'। যতকাল মানুষ শরীরকে বা কোন বস্তুকে নিজের বলে মনে করে, ততকাল তার পক্ষে

সম্পূর্ণভাবে কামনা ত্যাগ করা কঠিন। **'অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে এমন একটি বস্তুও নেই যা আমার বা আমার জন্য'—এই সত্যটাকে স্বীকার করে নিতে পারলে স্বাভাবিক ভাবেই কামনা দূর হয়ে যায়। কারণ আমার বা আমার জন্য যখন কোন একটিও বস্তু নেই, তাহলে আমি কীই বা কামনা করব বা কেন করব** ? কারোর পক্ষে সর্বতোভাবে কামনা ত্যাগ তখনই ঘটে যখন তার শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ (অহংভাব) না থাকে। সুতরাং সম্পূর্ণভাবে কামনাত্যাগের অর্থ হলো—'বেঁচে থেকে মরে যাওয়া।' যেমন কোন মানুষের মৃত্যু হলে, সে আর কোন কিছুকেই নিজের বলে চিহ্নিত করে না এবং কোন কিছু আর চাইতেও পারে না, তার ওপর অনুকূলতা-প্রতিকূলতা, মান-সম্মান, নিন্দা-স্তুতি ইত্যাদির প্রভাবও পড়ে না, সেইরকমই কোন মানুষের সম্পূর্ণভাবে কামনা ত্যাগ হয়ে গেলে, তার ওপরও অনুকূলতা-প্রতিকূলতা ইত্যাদির প্রভাব পড়ে না কিন্তু সে জীবিত থাকে। এই কারণে মহারাজ জনক দেহী অবস্থায় থাকা কালেও 'বিদেহী' রূপে পরিচিত ছিলেন। যে জীবিতাবস্থায়ই মরে থাকে, সে অমর হয়ে যায়। তাই, **মানুষ যদি কামনামুক্ত হতে পারে তাহলে সে জীবিত অবস্থাতেই অমর হয়ে যায়—**

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অর্থ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।।
(কঠোপনিষদ্ ২।৩।১৪, বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৪।৭)

'সাধকের হৃদয়ে স্থিত সমস্ত কামনা যখন সমূলে নষ্ট হয়ে যায়, তখন মরণধর্মী মানুষ অমর হয়ে যায় এবং এইখানেই (মনুষ্যশরীরেই) ব্রহ্মের অধিষ্ঠান অনুভব করে নেয়।'

যখন সাধকের মধ্যে কামনা-পূর্তির প্রবৃত্তি আর একটুও থাকে না, তখন তার দ্বারা সকল কর্মই নিষ্কামভাবে সংঘটিত হতে থাকে এবং সে কর্মবন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যায়। **সুখের কামনা না থাকায় তার সমস্ত দোষই নষ্ট হয়ে যায়, কারণ সমস্ত দোষই উৎপন্ন হয় সুখের আকাঙ্ক্ষা থেকে।** সাধকের জীবন হওয়া উচিত নির্দোষ। জীবনধারণে দোষ থাকলে সাধক হওয়া যায় না। এখন এইটিই বিচার্য যে দোষটা থাকে

কিসে ? জগতে বস্তু আছে মাত্র দুটি—সৎ ও অসৎ। (অবিনাশী) সৎ-এর মধ্যে দোষ তো থাকতেই পারে না, আবার (বিনাশী) অসৎ-এর মধ্যেও দোষ থাকে না। সতের কোন দোষ থাকে না কারণ সতের মধ্যে কোনরকম অভাবই নেই—**'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'** (গীতা ২।১৬)। কামনার উৎপত্তি হয় অভাব থেকেই। যার কখনো কোন অভাব হয় না, তার মধ্যে তো কোন কামনা সৃষ্টিই হতে পারে না, আবার যার মধ্যে কোন কামনা নেই, তার কোন দোষও হতে পারে না। অসতের মধ্যেও কোন দোষ থাকে না, কারণ অসতের তো কোন সত্তাই নেই—**'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ'** (গীতা ২।১৬)। যার কোন স্থায়িত্বই নেই, সেই আধারহীনে দোষটা থাকবে কোথায় ? স্থায়িত্বহীনতাই হলো অসতের সব থেকে বড় দোষ, তাতে দ্বিতীয় দোষ থাকার সম্ভাবনাই নেই। সৎ ও অসতের সম্বন্ধের মধ্যেও দোষের অবস্থিতি মানা যায় না। কারণ অন্ধকার আর আলোর সম্বন্ধ হওয়া যেমন অসম্ভব, সেইরকমই সৎ ও অসতের মধ্যে সম্বন্ধ হওয়াও অসম্ভব। তাহলে দোষটা আছে কার মধ্যে ? দোষ তারই মধ্যে আসতে পারে যার মধ্যে বাসনা আছে। কারণ সকল প্রকার দোষেরই উৎপত্তি স্থল হলো কামনা। **'কাম এষ....'** (গীতা ৩।৩৭)। মানুষ যখন জড়ের সঙ্গে সম্বন্ধিত ভাবে সুখ পাওয়ার কামনা করে, তখন তার চিত্তে লোভের উৎপত্তি হয় ; যখন সে ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ককে কেন্দ্র করে নিজের সুখের অন্বেষণ করে, তখন তার চিত্তে মোহের প্রাদুর্ভাব হয় ; আবার যখন সে পরিবেশের আনুকূল্যে সুখ পেতে চায়, তার চিত্তে বিচ্ছিন্নতাবোধের প্রাদুর্ভাব ঘটে। একটি বীজের মধ্যে যেমন অসংখ্য বৃক্ষের অরণ্য সুপ্ত থাকে, তেমনই একটি দোষের মধ্যে সকল দোষই বিদ্যমান। এমন একটিও দোষ পাওয়া যাবে না, যার মধ্যে সমস্তরকম দোষই মিলেমিশে না আছে। এই কারণে যতকাল কোন সাধকের চরিত্রে একটিও দোষ থাকে, ততকাল তার নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কিয়দংশে দোষ যেমন থাকে তেমনই কিছু গুণও (নির্দোষিতা) অবশ্যই থাকে। কোন মানুষই সর্বভাবে সকলের কাছে সব সময়ের জন্য দোষী সাব্যস্ত হতে পারে না,

কারণ প্রত্যেকেই স্বরূপত পরমাত্মার অংশ।[১] **কোন সাধক যদি সম্পূর্ণভাবে দোষমুক্ত হতে চায় তবে তার অন্য সম্বন্ধীয় সকল সুখ কামনাকে ত্যাগ করতে হবে সম্পূর্ণভাবেই।**

এখন বিচার্য হলো কামনা আছে কিসে ? কেউ কেউ বলেন যে, কামনা থাকে মনের মধ্যে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মনে কামনা থাকে না, মনে তা আসে—'**প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্**' (গীতা ২।৫৫)। মন হলো একটি করণ (অন্তঃকরণ)। করণে কোন কামনা হতে পারে না। লেখনীর মধ্যে কি কখনো লেখার কামনা জাগে ? গাড়ির মধ্যে কি চলার ইচ্ছা জাগতে পারে ? সম্ভবই না। যদি ধারণা করা হয় যে মনেই কামনা জাগে তাহলে তো কামনা-অপূর্তির জন্য দুঃখও মনেই হওয়া উচিত। কিন্তু কামনা-অপূর্তির দুঃখ তো হয় কর্তার (ব্যক্তির) নিজের। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে কামনা কোন করণে (মন, বুদ্ধি ইত্যাদিতে) জাগে না, জাগে কর্তার মধ্যে। করণ হলো কর্তার অধীনে। কিন্তু কামনার পূর্তি ও অপূর্তিজনিত সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বে অভিভূত থাকায় কর্তার (ব্যক্তিটির) বিবেক কাজ করে না। ফলে সে অগত্যা কামনাকে মনেরই ব্যাপার বলে ধারণা করে।

এইবার বিচার করতে হবে 'কর্তা' কে ? মন যদি কর্তা হত তাহলে তা বুদ্ধির অধীনে কাজ করতো না। কিন্তু মানুষ মাত্রেরই এটি জানা আছে যে, যে কাজে বুদ্ধি সায় দেয় না, মন সে কাজ ছেড়ে দেয়, আর বুদ্ধি যে কাজে নিশ্চয়তা দেয়, মন সেই কাজটি করতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু বুদ্ধিও তো স্বতন্ত্র কর্তা নয়, কারণ বুদ্ধিও একটি করণ (অন্তঃকরণ)। যখন কোন মানুষ কোন কামনা পূর্তির ইচ্ছায় সুখ অনুভব করে, তখনই বুদ্ধি সেই কাজটি করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কিন্তু সুখভোগের পরিণামে দুঃখই হয়—এই কথা যে বুঝতে পারে এমন মানুষ কামনা-পূর্তির সুখ বর্জন করলে তার বুদ্ধি সুখ-ভোগ প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় না-দিয়ে তাকে

---

[১]ঈস্বর অংস জীব অবিনাসী। চেতন অমল সহজ সুখরাসী॥

(শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ১১৭।১)

ত্যাগই করে দেয়। করণ হলো কর্তার অধীন এবং কোন ক্রিয়া সম্পাদনে করণ খুবই সাহায্যকারী ভূমিকা নেয়—**'সাধকতমং করণম্'** (পাণিনি অ.১।৪।৪২), কিন্তু কর্তা হলো স্বতন্ত্র **'স্বতন্ত্র কর্তা'** (পাণিনি অ.১।৪।৫৪)। ব্যক্তির স্বরূপও কর্তা নয়, কারণ স্বরূপে যদি কর্তৃত্ব থাকতো তাহলে তা কখনোই দূর হত না। এইজন্য গীতায় ভগবান স্বরূপে কর্তৃত্ববোধ নেই বলেছেন—**'শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে'** (গীতা ১৩।৩১)। প্রকৃতপক্ষে যে ভোক্তা (সুখী-দুঃখী) হয়, কর্তা হলো সে-ই।

এখন বিচার করে দেখতে হবে ভোক্তা কে ? ভোক্তা তো সৎ হতে পারে না, আবার অসৎও হতে পারে না। কারণ সৎ-এর মধ্যে ভোক্তৃত্ব থাকতে পারে না, আর অসতে ভোক্তৃত্ব থাকা সম্ভবই না। সাধক যখন বিবেক সহকারে শরীরের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধই দূর করে দেন, যা হলো বাস্তব কথা, তখন প্রকৃতপক্ষে, কর্তাও থাকে না, ভোক্তাও থাকে না, শুধুমাত্র এক চিৎ-সত্তাই বর্তমান থাকে। ফলে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, **প্রকৃতপক্ষে কর্তা-ভোক্তা কেউ নেই, এগুলিকে শুধু মেনে নেওয়া হয়েছে মাত্র**। এইখানে একটি কথা লক্ষ্যণীয় যে, জ্ঞানলাভ হয়ে সাধকের যখন 'শরীরে'র সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না, তখন তাঁর 'শরীরী'র সঙ্গেও আর সম্বন্ধ থাকে না। কারণ-শরীরের সম্বন্ধ-সাপেক্ষেই চিৎ-সত্তাকে 'শরীরী' বলে অভিহিত করা হয়। **শরীরের সঙ্গে সর্বতোভাবে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হলে চিৎ-সত্তা থেকে যায় কিন্তু তা 'শরীরী' পদবাচ্য হয় না**। চিন্ময় সত্তায় সকল শরীরীই এক হয়ে যায়। এই চিৎ-সত্তাই 'ব্রহ্ম' এবং সেই সত্তায় স্বতঃসিদ্ধ স্থিতিকেই মুক্তি বলা হয়। মুক্তিতে জীবের ব্রহ্মের সঙ্গে সাধর্ম্য হয়ে যায়, অর্থাৎ ব্রহ্ম যেমন সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তেমনই জীবও সচ্চিদানন্দস্বরূপ হয়ে যায়—**'ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ'** (গীতা ১৪।২)। সাধর্ম্য হলে জীব 'জন্ম-মৃত্যু' থেকে মুক্ত হয়ে যায়—**'সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ'** এবং সে শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, অজর, অমর তথা স্বাধীন হয়ে যায়। একে যোগের

প্রাপ্তিও বলা হয়—‘**তদা যোগমবাপ্স্যসি**’ (গীতা ২।৫৩)।

যেখানে যোগ, সেখানে ভোগ সম্ভব নয়, আবার যেখানে ভোগ আছে সেখানে যোগ হতে পারে না—এইটিই নিয়ম। কিন্তু সাধনায় একটি এমন অবস্থাও আসে যখন সাধকের যোগ, জ্ঞান বা ভক্তির অভিমান এসে যায় এবং সে মনে করে যে, ‘আমি যোগী’, ‘আমি জ্ঞানী’ বা ‘আমি ভক্ত’। এর কারণ হলো, অনাদি কাল থেকেই জীবের অভ্যাস গড়ে উঠেছে এমন যে, যা কিছুর সাথেই তার কোন সম্বন্ধ রচিত হয়, সেটিকে ধরে তার একটা অভিমান গড়ে ওঠে, যেমন ধনের প্রাচুর্যে ‘আমি ধনী’ এই অভিমানটি এসে পড়ে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ‘আমি যোগী’—এই অভিমান বস্তুত যোগের ভোগ, কারণ এই ধারণায় যোগের সঙ্গ ঘটায় যোগের সাথে অহং মিলিত হচ্ছে ; ‘আমি জ্ঞানী’—এই ভাবটিও প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের ভোগ, কারণ এখানেও জ্ঞানের সঙ্গ লাভে, জ্ঞানের সাথে অহং মিলে যাচ্ছে ; ‘আমি ভক্ত’—এই ভাবও প্রকৃত বিচারে ভক্তির ভোগ, কারণ এই ধারণাতেও ভক্তির সঙ্গ করা হচ্ছে, ফলে ভক্তির সঙ্গে অহং-এর মিলন ঘটছে। **ভোগ না থাকলে যোগী, জ্ঞানী এবং ভক্তও থাকে না অর্থাৎ ব্যক্তিত্ববোধটিই দূর হয়ে যায়**। কারণ যোগ, জ্ঞান বা ভক্তিলাভ হলে মানুষ সেটির সাথে এক হয়ে যায় অর্থাৎ সে যোগস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, ভক্তিস্বরূপ হয়ে যায়। তাই তার কোন অভিমান হয় না। **যতকাল ব্যক্তিত্ব থাকে, ততকাল পতনের সম্ভাবনা থেকেই যায়**। এইজন্য যে যোগের অভিমানী, সে কখনো ভোগেও আটকে যেতে পারে ; যে জ্ঞানের অভিমানী, সে অজ্ঞানেও বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। যে মুক্তির অভিমানী, সে বন্ধনগ্রস্তও হতে পারে[১] ; আবার যে ভক্তির অভিমানী সে

---

[১] যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদংঘ্রয়॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২।৩২)

‘হে কমলনয়ন ! যে ব্যক্তি আপনার চরণে শরণ না নেয় এবং আপনার প্রতি

হয়ে যেতে পারে অনুরাগে আসক্ত।

যখন যোগ, জ্ঞান ও ভক্তির অভিমান (ভোগ) থাকবে না, তখনই সাধক মুক্ত হয়ে যাবে। মুক্ত হওয়ার পরও সাধক যে মতের (প্রণালীর) প্রাধান্যে উত্তরণ লাভ করেছে, তার একটা সূক্ষ্ম সংস্কার তার মধ্যে থেকে যায়, সেটিকে বলা হয় 'অভিমানশূন্য অহং'। যেমন ভাজা ছোলার দ্বারা খেতের কাজ আর হয় না কিন্তু খাওয়া তো যায়, তেমনই অভিমানশূন্য অহংএর ফলে জন্ম-মৃত্যু আর হয় না বটে কিন্তু (নিজের মতাদর্শের সংস্কার থাকার কারণে) অন্যান্য দার্শনিকগণের সঙ্গে মতভেদ পোষণ করা হয়। অর্থাৎ, ওই সূক্ষ্ম অহং-এর কারণে মুক্তমানবের নিজের মতাদর্শে স্থিতিশীলতা এসে যায়। যতকাল নিজের মতে স্থিতি থাকে, নিজের মতের প্রতিই আগ্রহ থাকে, ততকাল অন্যান্য দার্শনিকদের সঙ্গে ঐক্যভাব আসে না। সাধনা তো সকলেরই হয় ভিন্ন ভিন্ন ধারায়, কিন্তু সাধনতত্ত্ব তো একই। অর্থাৎ কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি সব রকম সাধনা মিলে হলো সাধন তত্ত্ব। মুক্ত-মানবের মত হলো প্রকৃতপক্ষে সাধন তত্ত্বই। কিন্তু তিনি সাধনতত্ত্বকেই সাধ্যরূপে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন।

জীব হলো ঈশ্বরের অংশ, তাই সে যে মতটিকে ধরে অগ্রসর হয়, সেটিকেই সত্যরূপে মনে করে থাকে। সুতরাং **সাধকের মনে রাখা দরকার যে, সে যে মতকেই অনুসরণ করুক না কেন সেটাকে যেন আঁকড়ে না থাকে অর্থাৎ নিজের আগ্রহ যেন না রাখে**। সে জ্ঞানেরও আকাঙ্ক্ষা রাখবে না, ভক্তিরও না। সে যেন নিজের মতকেই শ্রেষ্ঠ এবং অন্যান্য মতকে নিকৃষ্ট মনে না করে, সকল মতকেই যেন সে সমাদর করে। গীতানুসারে যেমন '**মোহকলিল**' (মোহরূপ কলুষ) ত্যাগ করা আবশ্যক তেমনই '**শ্রুতিবিপ্রতিপত্তি**' (বিভিন্ন ফলশ্রুতির ফলে

ভক্তিহীনতার ফলে যার বুদ্ধিও শুদ্ধ নয়, সে নিজেকে মুক্ত মনে করলেও, বস্তুত সে বদ্ধই থাকে, সে যদি কষ্টকর সাধনার মাধ্যমে উচ্চ থেকে উচ্চতর পদে পৌঁছতেও পারে, তাহলেও সে অধঃপতিত হয়ে যায়।'

বিক্ষেপ)ও ত্যাগ করা আবশ্যক (দ্রঃ গীতা ২।৫২-৫৩), কারণ এই দুটিই সাধকের প্রতিবন্ধক। এইজন্য সাধক যতকাল নিজের মধ্যে দার্শনিক মতভেদ দেখবেন, সকল মতকেই তিনি সমানভাবে সমাদর করতে না পারবেন, ততকাল তাঁর নিশ্চিন্ত হওয়া ঠিক নয়। নিজের মধ্যে মতভেদ দেখলে তিনি 'সাধনতত্ত্ব' অবধি পৌঁছতে পারলেও 'সাধ্য'-তত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেন না। সাধ্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে নিজের মতের আগ্রহ আর থাকে না, তখন সকল মতকেই সমভাবে দেখতে পারা যায়—

পহুঁচে পহুঁচে এক মত, অনপঁহুচে মত ঔর।
'সন্তদাস' ঘড়ী অরঠকী, ঢুরে এক হী ঠৌর॥
নারায়ণ অরু নগরকে, 'রজ্জব' রাহ অনেক।
কোঙ্ঈ আবৌ কহীঁ দিসি, আগে অস্থল এক॥

মতভেদ নিয়ে আচার্যগণের মধ্যে বিবাদ হয় না, বস্তুত বিবাদ হয় তাঁদের অনুগামীগণের মধ্যেই। কারণ অনুগামীগণের তো মুক্তাবস্থার অনুভূতি জাগেনি, অথচ ওই মতের (পক্ষপাতী) আগ্রহ আছে, কিন্তু আচার্যের তো অনুভূতি হয়ে গেছে। আচার্যগণের মতভেদের ফলে তাঁদের অনুগামীদের নিজের নিজের মতের প্রতি অনুরাগ এবং অন্যদের মতের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে যায়। এই **অনুরাগ-বিদ্বেষের ফলে সত্যানুসন্ধিৎসায় খুব বড় বাধার সৃষ্টি হয়।** কিন্তু অনুরাগ-বিদ্বেষ না-হলে সাধক সত্যানুসন্ধিৎসু হয়। 'প্রকৃতপক্ষে তত্ত্ব তো একটিই সুতরাং তাতে মতভেদ থাকবে কেন'— এই ভাবটিতে সজাগ থাকে। এইজন্য মুক্তি হলেও সে সন্তুষ্ট হয় না। **সত্যানুসন্ধিৎসায় অগ্রসর হতে হতে সে নিজেই লীন হয়ে যায়, শেষে থেকে যায় শুধু 'বাসুদেবঃ সর্বম্' বোধটিই।**

প্রথম থেকে যে সাধকের মধ্যে ভক্তির সংস্কার থাকে, তাঁর মুক্তিতে সন্তুষ্টি আসে না। এই কারণে তাঁর যখন মুক্তির সুখও লঘু হয়ে যেতে থাকে, তখনই তাঁর হয় প্রেমের প্রাপ্তি। ভক্তি যেমন সাধন তেমন সাধ্যও —**'ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা'** (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩।৩১)। ভক্তির

সাধনায় সাধন এবং সাধ্য দুই-ই ভগবান হওয়ায় নিজের মতের প্রতি আগ্রহ সহজেই দূর হয়ে যায় এবং সাধ্য-ভক্তি অর্থাৎ প্রতিক্ষণে বর্ধিত অনুরাগের প্রাপ্তি স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে যায়। **প্রেমানুরাগের প্রকাশে, 'সবই ভগবান'—এই বোধে সাধকের ভগবানের সমগ্র স্বরূপের সাক্ষাৎ অনুভব হয়ে যায়** এবং সাধ্যের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা জাগ্রত হয়। একবার ভালোবাসা জেগে গেলে একটি মতের প্রতি (পক্ষপাতী) আগ্রহ আর থাকে না, সকল প্রকার মতভেদ মিলে গিয়ে এক হয়ে যায়। মুক্তিতে তো অখণ্ডরস বা একক রস প্রাপ্তি হয়, কিন্তু ভক্তিতে প্রাপ্তি হয় অনন্ত রসের, প্রতিক্ষণেই যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। **প্রেম হলো সকল সাধনার অন্তিম ফল অর্থাৎ সাধ্য**। প্রত্যেক সাধকের নিজ নিজ সাধনা দ্বারা এই সাধ্যকেই লাভ করতে হয়। এইজন্যই মনুষ্য প্রজাতি যথার্থই সাধন-প্রজাতি বা প্রেম-প্রজাতি রূপে অভিহিত হয়। কারণ মনুষ্যজন্ম হয় পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্যই এবং পরমাত্মাপ্রেম প্রাপ্তিতেই ঘটে মনুষ্যজন্মের সার্থকতা।

মানুষ ও সাধক একই পর্যায়ের ; যে সাধক নয়, সে প্রকৃত বিচারে মানুষও নয়। যে সাধক, সেই প্রকৃতপক্ষে মানুষ। মানুষের প্রকৃত কর্তব্য হলো, **সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া**। পরমাত্মা আছেন—এই হলো সত্য এবং জগৎ নেই এটিও সত্য। সত্যকে সত্য বলে মেনে নেওয়াও সত্যকে স্বীকার করা, আবার অসত্যকে অসত্য বলে মেনে নেওয়াও সত্যকে স্বীকার করা। যার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আছে, তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ মেনে নেওয়াও সত্যকে স্বীকার করা, আর যার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নেই তার সঙ্গে সম্বন্ধ না-মানাও সত্যকে স্বীকার করা। মূলে সত্য একই। সেটি হলো এই যে, একমাত্র ভগবান ব্যতীত আর কোন কিছু নেই-ই—'**বাসুদেবঃ সর্বম্**'।

~~O~~

অমরতার অনুভব

মনুষ্য মাত্রেরই একটি স্বাভাবিক জ্ঞান অর্থাৎ বিবেক আছে। সাধকের কাজ হলো ওই বিবেককে গুরুত্ব দিয়ে চলা। ওই বিবেক উৎপন্ন হয় না। যদি তা উৎপন্ন হতো তাহলে তা নষ্টও হয়ে যেত, কারণ যা সৃষ্ট হয় তা সবই নশ্বর—এই হলো নিয়ম। তাই **এই বিবেকের উৎপত্তি হয় না, প্রকৃতপক্ষে হয় জাগ্রত**। সাধক যখন নিজের এই স্বতঃসিদ্ধ বিবেককে গুরুত্ব দেন, তখনই ওই বিবেক জাগ্রত হয়। একেই তত্ত্বজ্ঞান বা তত্ত্ববোধ বলা হয়।

মনুষ্যমাত্রেরই স্বাভাবিকভাবেই একটি ভাব থাকে যে 'আমার জীবন যেন টিকে থাকে, কখনো যেন না মরি'। সে চায় অমর হয়ে থাকতে। প্রকৃতপক্ষে অমর থাকার ইচ্ছা থেকে সিদ্ধ হয় যে সে তো অমরই। যদি সত্যিই সে অমর না হত তাহলে তার মধ্যে অমরতার ইচ্ছাও জাগত না। যেমন ক্ষুধা বা তৃষ্ণার উদ্রেক হয় বলে, এটি সিদ্ধান্ত করা যায় যে এমন বস্তু (অন্ন ও জল) আছে, যার দ্বারা ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়। যদি অন্ন বা জল না থাকত তাহলে ক্ষুধা বা তৃষ্ণার উদ্রেকও হত না। অতএব অমরতা স্বতঃসিদ্ধ। এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, যে অমর তাঁর মধ্যে অমর হওয়ার ইচ্ছা হয় কেন ? এর উত্তর হলো, অমর হওয়া সত্ত্বেও সে নিজের বিবেককে অমান্য করে মরণশীল শরীরের সাথে তাদাত্ম্য করে নিয়েছে অর্থাৎ 'আমি শরীর'—এইরকম মেনে নিয়েছে, ফলে তার মধ্যে মৃত্যুর ভয় ও অমরতায় ইচ্ছাও সৃষ্টি হয়েছে।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই এই বিবেক বোধ রয়েছে যে, 'এই শরীর (স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর) আমার প্রকৃত স্বরূপ নয়। শরীর প্রত্যক্ষভাবেই পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। বাল্যাবস্থায় শরীর যেমন ছিল আজ তেমন নেই এবং শরীর আজ যেমন আছে, ভবিষ্যতে সেটি তেমন

থাকবে না। কিন্তু আমি সে-ই আছি, অর্থাৎ বাল্যাবস্থায় আমি যেমন ছিলাম, আজও আমি তাই আছি এবং ভবিষ্যতেও তাই থাকব। সুতরাং আমি শরীর থেকে পৃথক এবং শরীরও আমার থেকে পৃথক, অর্থাৎ আমি শরীর নই।' এই কথা সকলেই অনুভব করে থাকে। তবুও নিজেকে শরীরের থেকে পৃথক মনে না করে শরীরের সঙ্গে এক বলে মনে করাটা কিন্তু নিজের বিবেককে অনাদর করা, অপমান তথা অস্বীকার করা। সাধকের উচিত নিজের এই বিবেকবোধকে মান্য করা যে, 'আমি তো নিত্য অস্তিত্বসম্পন্ন আর শরীর হলো মরণশীল। এমন কোন মুহূর্ত নেই, যে সময় শরীর মৃত্যুর দ্বারা অধিকৃত না হচ্ছে। শরীরের মরণ-মুখী প্রবাহকেই জীবন বলা হয়। এই প্রবাহের প্রকাশকে জন্ম বলা হয় আর তার অদৃশ্য হওয়াকে মৃত্যু বলা হয়। অর্থাৎ যা **সর্বদাই পরিবর্তনশীল, তারই নাম জন্ম, তারই নাম (জীবন) স্থিতি, তারই নাম মৃত্যু**। বাল্যাবস্থা মৃত হলে আসে যুবাবস্থা, আবার যুবাবস্থার মৃত্যুতে জন্ম নেয় বৃদ্ধাবস্থা। এইরকম প্রতিক্ষণে জন্ম ও মরণকেই জীবন (স্থিতি) বলা হয়। জন্মগ্রহণ ও মৃত্যু—এই ক্রম সূক্ষ্ম ভাবে নিরন্তর হয়ে চলেছে। কিন্তু আমি স্বয়ং সর্বদাই একইভাবে বিদ্যমান। অবস্থাসমূহের পরিবর্তন হয়, কিন্তু আমার স্বরূপে কখনো কিঞ্চিৎমাত্রও পরিবর্তন হয় না। সুতরাং **শরীর সর্বদাই মৃত্যুতেই রয়েছে আর আমি (স্বরূপত) সর্বদাই রয়েছি অমরতায়'। এই বিবেক বোধকে গুরুত্ব দিতে হবে।**

গীতায় আছে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নানি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

(২।২২)

'মানুষ যেমন পুরানো বস্ত্রকে ত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র ধারণ করে, সেইরকমই, দেহী পুরোনো শরীরকে ত্যাগ করে অন্য নতুন শরীরে প্রবিষ্ট হয়।'

পুরোনো বস্ত্রত্যাগে আমি মরে যাই না এবং নতুন বস্ত্রধারণে আমি

জন্ম নিই না, সেইরকমই পুরোনো শরীরকে ত্যাগ করায় আমি মরে যাই না এবং নতুন শরীর ধারণ করলে আমি জন্ম নিই না। অর্থাৎ মরণ হয় শরীরের, আমার নয়। আমিই যদি মরে যেতাম তাহলে পুণ্য ও পাপের ফল ভোগ করবে কে ? অন্য গর্ভে কে যাবে ? বন্ধন হবে কার ? মুক্তিই বা হবে কার ?

শরীর বিনাশশীল, এটিকে কেউ ধরে রাখতে পারে না, আর আমার স্বরূপ হলো অবিনাশী, এটিকে কেউ মারতে পারে না—

অবিনাশী তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি॥

(গীতা ২।১৭)

অবিনাশী সর্বদা অবিনাশীই থাকবে এবং বিনাশশীল সর্বদাই থাকবে বিনাশশীল। যা বিনাশশীল তা আমার স্বরূপ নয়। আমি কোন বস্ত্র পরিধান করলে কি বস্ত্রটি আমার স্বরূপ হয়ে যায় ? আমি কোন চাদর জড়িয়ে নিলে কি চাদরটি আমার স্বরূপ হয়ে যায় ? আমি যেমন পরিধেয় থেকে পৃথক, সেই রকমই আমি এই শরীর থেকেও পৃথক। এই কারণে সর্বদা স্বাভাবিকভাবেই এই কথাটি মনে থাকা উচিত যে, আমি মরণশীল নই, আমি তো অমর। **'অমর জীব মরে সো কায়া'**, জীব অমর, কায়া বা শরীরই মরে। যদি এই বিবেকবোধকে গুরুত্ব সহকারে ধারণা করা যায় তাহলে মৃত্যুভয় দূর হয়ে যাবে। **আমি যখন মরিই না, তবে আর মরণকে ভয় কীসের ? আবার, যা মরণশীল তার স্থায়িত্বের ইচ্ছা হয় কেমন করে** ? যার বাল্যাবস্থা আর নেই সে তো আর তার বাল্যাবস্থাকে দেখতে পাবে না, কারণ তা এখন মৃত, কিন্তু সে নিজে ঠিকই আছে। সুতরাং শরীর সর্বদাই মরণশীল আর জীব (আমি) সর্বদাই অমর, স্থায়ী—এতে সংশয়ের স্থান কোথায় ? এখন শুধু প্রয়োজন এই কথাটিকে বরণ করার, গুরুত্ব দেওয়ার, এটিকে নিজে অনুভব করতে হবে, শুধুমাত্র শুনে রেখে দেওয়া নয়। ধনপ্রাপ্তি হলে মানুষ যেমন অন্তর থেকে খুশি হয়, সেইরকমই এই কথাটি শুনে অন্তর থেকে খুশি হওয়া চাই এবং

বাঁচার ইচ্ছা তথা মরণের ভয় আর থাকা উচিত নয়। কারণ যে কথায় আমার দুঃখ, অন্তর্দাহ, সন্তাপ, ক্রন্দন দূর হয়ে যায়, সেটি প্রাপ্তির থেকে অধিক খুশি হওয়ার মতো কথা আর কী হতে পারে ? এমন প্রাপ্তি তো কোটি কোটি অর্থ-প্রাপ্তি হলেও হবে না। কারণ যত বড়ো অর্থভাণ্ডারই হোক বা পৃথিবীর রাজত্বই প্রাপ্তি হোক, একদিন তো সব ত্যক্ত হবেই। আমাকে ছেড়ে চলে যাবেই।

অরব খরব লোঁ দ্রব্য হৈ, উদয় অস্ত লোঁ রাজ।
তুলসী জো নিজ মরন হৈ, তো আবে কিহি কাজ॥

মানুষ শরীরে নিজের স্থিতিকে মেনে নেয়, নিজেকে শরীর বলে ধারণা করে—এইটিই তো হলো তার ত্রুটি। ভুল কথাকে সমাদর করা আর সঠিককে অনাদর করাই হলো মুক্তির পথে প্রকৃত বাধা। নিজেকে শরীর বলে মনে করেই মানুষ বলে 'আমি বালক', 'আমি যুবক', 'আমি বৃদ্ধ'। প্রকৃতপক্ষে সে বালকও নয়, যুবকও নয়, বৃদ্ধও নয়, বস্তুত শরীরই বালক হয়েছিল, যুবক হয়েছিল, বৃদ্ধ হয়েছিল। শরীরের অসুখে মানুষটিও অসুস্থ হয়েছিল, শরীর দুর্বল হয়েছিল তাই সেও দুর্বল হয়েছিল, অর্থাগম হওয়ায় সে ধনী হয়েছিল, অর্থহানি হওয়ায় সে নির্ধন হয়েছিল—এই যে ভাব, এটি শরীরের সঙ্গে তথা অর্থের সঙ্গে নিজের একত্ব ভাবনার ফলেই সৃষ্ট। যখন ক্রোধ আসে, তখন মানুষ বলে 'আমি ক্রোধী'। বিচার করে দেখতে হয়, 'ক্রোধ কি সবসময় থাকে ?' সবার প্রতিই কি ক্রোধ হয় ? **যা সর্বদা থাকে না এবং যা সবার প্রতি হয় না সেটা আমারই বা হবে কেন** ? গৃহের মধ্যে কুকুর এলে কি কুকুরটি গৃহের কর্তা হয়ে যায় ? এইরকমই ক্রোধ এলে কি মানুষটিই ক্রোধী হয়ে যায় ? ক্রোধ তো আসে এবং চলেও যায়, কিন্তু আত্মস্বরূপ তো সর্বদাই একরকম থাকে।

স্থান পরিবর্তিত হয়, কাল পরিবর্তিত হয়, বস্তুসমূহ পরিবর্তিত হয়, ব্যক্তি পরিবর্তিত হয়, দশা পরিবর্তিত হয়, পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়, ঘটনা পরিবর্তিত হয়, কিন্তু আমি সর্বদাই থাকি। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও

বাঁচার ইচ্ছা তথা মরণের ভয় আর থাকা উচিত নয়। কারণ যে কথায় আমার দুঃখ, অন্তর্দাহ, সন্তাপ, ক্রন্দন দূর হয়ে যায়, সেটি প্রাপ্তির থেকে অধিক খুশি হওয়ার মতো কথা আর কী হতে পারে ? এমন প্রাপ্তি তো কোটি কোটি অর্থ-প্রাপ্তি হলেও হবে না। কারণ যত বড়ো অর্থভাণ্ডারই হোক বা পৃথিবীর রাজত্বই প্রাপ্তি হোক, একদিন তো সব ত্যক্ত হবেই। আমাকে ছেড়ে চলে যাবেই।

অরব খরব লৌঁ দ্রব্য হৈ, উদয় অস্ত লৌঁ রাজ।
তুলসী জো নিজ মরন হৈ, তো আবে কিহি কাজ॥

মানুষ শরীরে নিজের স্থিতিকে মেনে নেয়, নিজেকে শরীর বলে ধারণা করে—এইটিই তো হলো তার ত্রুটি। ভুল কথাকে সমাদর করা আর সঠিককে অনাদর করাই হলো মুক্তির পথে প্রকৃত বাধা। নিজেকে শরীর বলে মনে করেই মানুষ বলে 'আমি বালক', 'আমি যুবক', 'আমি বৃদ্ধ'। প্রকৃতপক্ষে সে বালকও নয়, যুবকও নয়, বৃদ্ধও নয়, বস্তুত শরীরই বালক হয়েছিল, যুবক হয়েছিল, বৃদ্ধ হয়েছিল। শরীরের অসুখে মানুষটিও অসুস্থ হয়েছিল, শরীর দুর্বল হয়েছিল তাই সেও দুর্বল হয়েছিল, অর্থাগম হওয়ায় সে ধনী হয়েছিল, অর্থহানি হওয়ায় সে নির্ধন হয়েছিল—এই যে ভাব, এটি শরীরের সঙ্গে তথা অর্থের সঙ্গে নিজের একত্ব ভাবনার ফলেই সৃষ্ট। যখন ক্রোধ আসে, তখন মানুষ বলে 'আমি ক্রোধী'। বিচার করে দেখতে হয়, 'ক্রোধ কি সবসময় থাকে ?' সবার প্রতিই কি ক্রোধ হয় ? **যা সর্বদা থাকে না এবং যা সবার প্রতি হয় না সেটা আমারই বা হবে কেন** ? গৃহের মধ্যে কুকুর এলে কি কুকুরটি গৃহের কর্তা হয়ে যায় ? এইরকমই ক্রোধ এলে কি মানুষটিই ক্রোধী হয়ে যায় ? ক্রোধ তো আসে এবং চলেও যায়, কিন্তু আত্মস্বরূপ তো সর্বদাই একরকম থাকে।

স্থান পরিবর্তিত হয়, কাল পরিবর্তিত হয়, বস্তুসমূহ পরিবর্তিত হয়, ব্যক্তি পরিবর্তিত হয়, দশা পরিবর্তিত হয়, পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়, ঘটনা পরিবর্তিত হয়, কিন্তু আমি সর্বদাই থাকি। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও

সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থা পরিবর্তিত হয়, কিন্তু আমি তো একইরকম থাকি, সেইজন্যই আমি অবস্থাগুলি তথা তাদের পরিবর্তনকে অর্থাৎ তাদের আরম্ভ ও সমাপ্তিকে জানতে পারি। স্থূলদৃষ্টির বিচারে উদাহরণ দেওয়া যায় যে, আমি হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশে আসার সময় প্রথমে হরিদ্বার থেকে রায়বালা এসেছি, তারপর রায়বালা থেকে হৃষীকেশে এসেছি। যদি আমি হরিদ্বারেই থাকতাম তাহলে রায়বালা এবং হৃষীকেশে কেমন করে আসতাম ? রায়বালাতেই যদি থাকতাম, তাহলে হরিদ্বার ও হৃষীকেশে কী করে আসতাম ? আবার হৃষীকেশেই যদি থাকতাম, তাহলে হরিদ্বার আর রায়বালায় আসতাম কেমন ভাবে ? সুতরাং আমি হরিদ্বারেও থাকি না, রায়বালাও না, আবার হৃষীকেশেও না। হরিদ্বার, রায়বালা এবং হৃষীকেশ—তিনটিই পৃথক পৃথক স্থান, কিন্তু আমি একই। হরিদ্বারে যে আমি ছিলাম, রায়বালাতেও সে-ই ছিলাম, আবার হৃষীকেশেও ছিলাম সে-ই আমিই। এইরকমই জাগ্রত দশায় যে আমি ছিলাম, স্বপ্নেও সে-ই আমি ছিলাম, সুষুপ্তিতেও সেই আমিই থাকি। সুতরাং পরিবর্তনশীল দশাকে না দেখে সেগুলিতে একই ভাবে অস্তিত্বশীল সত্তাটিকেই দেখা প্রয়োজন অর্থাৎ নিজের (স্বরূপগত) নির্লিপ্ততা অনুভব করতে হবে—

'রহতা রূপ সহী কর রাখো বহতা সঙ্গ ন বহীজে'

পরিবর্তনশীলের সাথে আমার সম্বন্ধ নেই—এই হলো অমরত্ব (মুক্তি)র বোধ। **অমরত্ব স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বাভাবিক, তা তৈরি করা যায় না। মৃত্যুর সঙ্গে সম্বন্ধ তো আমরা মেনে নিয়েছি।**

প্রশ্ন—এখনই যদি সামনে একটি সিংহ উপস্থিত হয় তাহলে ভয় তো লাগবেই ?

উত্তর—ভয় এই কারণে লাগবে যে, 'আমি শরীর থেকে পৃথক' এই কথাটি তুমি শুনে শিক্ষালাভ করেছ মাত্র, এখনো অনুভব করোনি। শিখে নেওয়া কথা আর বুঝে নেওয়া কথায় এটিই তফাত। তোতা পাখি কত সময় 'রাধে কৃষ্ণ গোপী কৃষ্ণ' বলে, কিন্তু যখন তাকে বেড়ালে ধরে

সে শুধু ট্যাঁ-ট্যাঁ করতে থাকে, অথচ তখনই 'রাধে কৃষ্ণ গোপী কৃষ্ণ' বলার সময়। কিন্তু শুধু শুনে শিখে রাখা জ্ঞান তো দরকারের সময় কাজে লাগে না।

সিংহ যদি আসে, তাহলে সেটির থেকে বাঁচার চেষ্টা করা কোন দোষ নয়, কিন্তু ভীত হওয়া দোষের। কারণ **মরণশীল তো মরছেই আর যা জীবনসম্পন্ন (আত্মস্বরূপ) তা তো জীবনধারায় থাকছেই, তাহলে ভয়টা কীসের** ? সিংহ যদি মারে তো মরণশীলকেই মারবে, জীবন্তকে (আত্মাকে) কেমন করে মারবে ? ভক্ষণ করলে সিংহের ক্ষুধা তো মিটে যাবে, আত্মস্বরূপের কী যাবে-আসবে তাতে ? যা মরণশীল তাকে কত দিন বাঁচিয়ে রাখা যাবে ? তা তো মরবেই। সুতরাং বেঁচে থাকার ইচ্ছা করতে নেই এবং মরণের ভয়ও করতে নেই।

একটি বিশেষ কথা আছে। সৎসঙ্গ করার পূর্বের অবস্থায় একজনের যতটা ভয় লাগছিল, সৎসঙ্গের পর তার আর ততটা ভয় হয় না। সৎসঙ্গ করলে চিত্তবৃত্তিতে অনেক তফাত এসে যায় এবং বিকারগুলি নিজে থেকেই নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। কিন্তু তা তখনই সম্ভব যখন সে সৎসঙ্গের আলোচনাকে সমাদর করবে, গুরুত্ব দেবে, অনুভব করবে। সৎসঙ্গের আলোচনাকে গুরুত্ব দিলে সাধকের অনুভবে এই তিনটি কথা অবশ্যই ধরা পড়ে—

১) আগে যত জোরালো ভাবে কাম-ক্রোধাদি আসত এখন আর অতটা আসে না।

২) আগে যতক্ষণ ওইগুলি থাকত, এখন আর ততটা সময় থাকে না।

৩) আগে যত তাড়াতাড়ি ওগুলি আসত, এখন সেরকম আসে না।

এসবে লক্ষ্য করলে সাধকের উৎসাহ বর্ধিত হওয়া উচিত এই ভেবে যে, যে বিকার কমে যাচ্ছে তা নষ্টও হয়ে যাবে অবশ্যই। ব্যবসায়কর্মে তো লাভ ও লোকসান দুই থাকে। কিন্তু সৎসঙ্গে শুধুই লাভ হয়, কোন লোকসান হয় না। মাতৃক্রোড়ে যেমন শিশু আপনা থেকেই বেড়ে ওঠে,

বড় হওয়ার জন্য তাকে কোন চেষ্টা করতে হয় না, তেমনই **সৎসঙ্গে আগ্রহী উপস্থিত মানুষের আপনা থেকেই বিকাশ ঘটে**। যদি তার অনুসন্ধিৎসা তীব্র হয় এবং নিজের কাম-ক্রোধাদি বিকারগুলিকে অসহ্য বলে মনে হয় তাহলে তার অচিরেই সিদ্ধিলাভ হবে।

সৎসঙ্গের ফলে বিবেক জাগ্রত হয়। সাধক সেই বিবেককে যতখানি গুরুত্ব দেবেন, তাঁর কাম-ক্রোধাদি বিকারও ততখানিই দূর হয়ে যাবে। বিবেককে সর্বদিক দিয়ে গুরুত্ব দিলে সেই বিবেকই তত্ত্বজ্ঞানে পরিণত হয়ে যাবে, দ্বিতীয় সত্তার অভাব হওয়ায় তার মধ্যে বিকার থাকার প্রশ্নই উঠতে পারবে না। অর্থাৎ, তত্ত্বজ্ঞান হয়ে গেলে বিকারসমূহের সামান্যতম অবশেষও আর থাকে না।

কোন প্রিয়জনের মৃত্যু হলে, অর্থহানি হলে মানুষের শোক হয়। এরকমই ভবিষ্যৎ নিয়ে মানুষের চিন্তা হয় যে, যদি স্ত্রীর মৃত্যু হয় কী হবে ? পুত্রের মৃত্যু হলে কী হবে ? এই সব শোকচিন্তাও বিবেককে যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়ার কারণেই হয়। জগৎ-সংসারে পরিবর্তন হওয়া, পরিস্থিতির রূপান্তর হওয়া আবশ্যক। পরিস্থিতি যদি না পরিবর্তিত হয় তাহলে জগৎ চলবে কী করে ? মানুষ বাল্যাবস্থা থেকে যুবাবস্থায় যাবে কী করে ? মূর্খ থেকে বিদ্বান হবে কী করে ? বীজ থেকে বৃক্ষ হবে কেমন করে ? পরিবর্তন ছাড়া জগৎ তো স্থির চিত্রবৎ হয়ে যাবে। **বস্তুত মরণশীল (পরিবর্তনশীল)ই মরে, জীবনসম্পন্ন সত্তা কখনো মরে না**। এটি সকলেরই প্রত্যক্ষ অনুভূতি যে, মৃত্যু হলে জীবের শরীর তো সকলের সামনে পড়েই থাকে, কিন্তু শরীরের কর্তা (জীবাত্মা) নির্গত হয়। যদি এই অনুভূতিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাহলে তো কোন চিন্তা-শোক হতেই পারে না। ভগবান রাম, বালির মৃত্যুর পর তার স্ত্রী তারাকে এই অনুভূতিটির দিকে লক্ষ্য করাতে চেয়েছিলেন—

তারা বিকল দেখি রঘুরায়া। দীন্‌হ গ্যান হরি লীন্‌হী মায়া।।
ছিতি জল পাবক গগন সমীরা। পঞ্চ রচিত অতি অধম সরীরা।।

**প্রগট সো তনু তব আগেঁ সোবা। জীব নিত্য কেহি লগি তুম্‌হ রোবা॥
উপজা গ্যান চরন তব লাগী। লীন্‌হেসি পরম ভগতি বর মাগী॥**

(শ্রীরামচরিতমানস, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ১১।২-৩)

প্রশ্ন—বিবেকের প্রতি মানুষের অনাদরের প্রকৃত কারণ কী ?

উত্তর—প্রকৃত কারণ হলো সম্বন্ধ বা সংসর্গজনিত সুখের প্রতি আসক্তি। মানুষ সম্বন্ধজনিত সুখকে ভোগ করতে চায়, তাই আপন বিবেককে সে সমাদর করতে পারে না অর্থাৎ অন্তরে জ্ঞানটি উন্মেষিত হয় না অর্থাৎ **ভোগের প্রতি তার যতটা আসক্তি থাকে, বুদ্ধিতে তার ততটাই জড়তা এসে যায়, যার ফলে সৎসঙ্গের তাত্ত্বিক আলোচনা পড়ে বা শুনে সে বুঝে উঠতে পারে না।** গীতায় বলা হয়েছে যে, ভোগ ও ঐশ্বর্যে আসক্ত মানুষ পরমাত্মার জন্য প্রয়াস কিছুতেই নিশ্চিতভাবে করতে পারে না[১]। ভোগের আসক্তিতে তার জ্ঞান আবৃত হয়ে যায়[২]। সেইজন্য যতকাল বস্তু, ব্যক্তি, ক্রিয়া, চিন্তা, স্থিরতা (সমাধি) ইত্যাদিতে তার কিঞ্চিৎমাত্রও অনুরাগ থাকে, ততকাল জ্ঞান শুধু শ্রুত অবস্থাতেই থাকে (অর্থাৎ বোধ্য হয় না)—'রাগো লিঙ্গমবোধস্য'।

প্রশ্ন—শরীর আমি নয়—এটি তো ঠিক আছে, কিন্তু শরীর তো আমার এবং আমার জন্য বটেই ?

উত্তর—শরীরের সঙ্গে আমরা তিন রকম সম্বন্ধ মেনে নিই—(১) শরীর আমি, (২) শরীর আমার, এবং (৩) শরীর আমার জন্য। এই তিনটি সম্বন্ধই কৃত্রিম, স্বাভাবিক নয়। **প্রকৃতপক্ষে শরীর 'আমি'ও না,**

---

[১]ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ (গীতা ২।৪৪)

[২]আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥ (গীতা ৩।৩৯)

'হে কুন্তীনন্দন ! এই অগ্নিতুল্য দুষ্পূরণীয় তথা বিবেকী পুরুষের নিত্য শত্রু কাম দ্বারা মানুষের বিবেক আচ্ছন্ন থাকে।'

‘আমার’ও না, আবার ‘আমার জন্য’ও না। কারণ, আমি যদি শরীর হতাম, তাহলে শরীরের পরিবর্তনে আমিও পরিবর্তিত হতাম এবং শরীরের মৃত্যু হলে ‘আমি’ও আর থাকতাম না। কিন্তু সবাই অনুভব করে যে শরীর আগে যেমন ছিল, এখন আর সেইরকম নেই, অথচ আমি সেই একই রকম আছি। শরীর পরিবর্তিত হয়, কিন্তু আমি পরিবর্তিত হই না। যদি শরীর আমার হত তাহলে তার ওপর আমার পূর্ণ অধিকার থাকত, অর্থাৎ আমি যেমন চাই, শরীরকেও তেমনই রাখতে পারতাম, সেটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতাম, সেটির বর্ণ রূপান্তরিত করতাম, সেটির পরিবর্তন হতে দিতাম না, অসুখ হতে দিতাম না, দুর্বল হতে দিতাম না, জরাগ্রস্ত হতে দিতাম না, অন্তত মরতে তো দিতামই না। কিন্তু সকলেই জানে যে, শরীরের ওপর কারোর কোন বশ চলে না এবং না চাইলেও বহু প্রতিরোধের চেষ্টা করলেও অসুখ তো হয়ই, শরীর দুর্বল হয়ে যায়, জরাগ্রস্ত হয়ে যায় এবং একসময় মৃতও হয়ে যায়। যদি এই শরীর ‘আমার জন্য’ হত তাহলে তো সেটি পাওয়াতেই আমার তুষ্টি হয়ে যেত, নিজের ভেতরে আর কোন কিছু পাওয়ার ইচ্ছা থাকত না এবং কখনো আমার শরীর ত্যাগ করতে হত না, সেটি সর্বদাই আমার সঙ্গে থাকত। কিন্তু সকলেই অনুভব করে যে, শরীর-প্রাপ্তি হলেও আমাদের একটুও তৃপ্তি হয় না, আমাদের ইচ্ছার কোন সমাপ্তি হয় না, পূর্ণতার অনুভবও হয় না এবং শরীরও স্থায়ীভাবে থাকে না, বস্তুত তা আমার থেকে বিযুক্ত হয়।

স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই তিন শরীরের সঙ্গেই আমার যেমন কোন সম্বন্ধ নেই, সেইরকমই স্থূলশরীরের মাধ্যমে যে ‘ক্রিয়া’, সূক্ষ্মশরীরের মাধ্যমে যে চিন্তা ও কারণশরীরের মাধ্যমে যে ‘স্থিরতা’ (সমাধি)-তার সাথেও আমার কোন সম্বন্ধ নেই। এর কারণ হলো, প্রত্যেক ক্রিয়ার আরম্ভ ও শেষ আছে। কোন চিন্তাই স্থায়ীভাবে থাকে না, বস্তুত একের পর এক তা আসে যায়। স্থিরতার পর চঞ্চলতা, সমাধির পর ব্যুত্থান হয়েই থাকে। অর্থাৎ, কোন ক্রিয়াই নিরন্তর থাকে না, কোন চিন্তনও নিরন্তর থাকে না এবং স্থিরতাও নিরন্তর থাকে না। এই তিনটির আসা-

যাওয়া, পরিবর্তনের অনুভব তো আমরা সবাই করি, কিন্তু নিজের (স্বরূপের) পরিবর্তন কারোরই কখনো হতে পারে না। আমাদের অস্তিত্ব থাকে নিরন্তর। আমার সাথে কোন বস্তু বা ক্রিয়া তো থাকেই না, চিন্তাও থাকে না, স্থিরতাও থাকে না। **থাকি শুধু একক আমি। এইজন্যই আমাদের একান্তে (পদার্থ, ক্রিয়া, চিন্তা ও স্থিরতা ব্যতীত) থাকার স্বভাব গঠন করা প্রয়োজন।**

যখন স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণশরীর এবং তাদের কার্য ক্রিয়া, চিন্তা ও স্থিরতার সঙ্গে সম্বন্ধই নেই তাহলে আর ওইগুলির সাথে সংযুক্তি হোক বা বিযুক্তি হোক, তাতে আমার কী যায় আসে ? গুণাতীত যোগীর এরূপ অনুভূতি হয়ে থাকে—

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥

(গীতা ১৪।২২)

'হে পাণ্ডব ! প্রকাশ, প্রবৃত্তি তথা মোহ—এই সব যদি প্রবৃত্ত হয়, তাহলে গুণাতীত মানুষ এইগুলিতে বিদ্বেষ করেন না এবং এইগুলি নিবৃত্ত হয়ে গেলে তিনি এইগুলির ইচ্ছা করেন না।'

সংযুক্তি, বিযুক্তি তো অন্য কিছু সাপেক্ষে হয়, কিন্তু তত্ত্ব তো নিরপেক্ষ। তত্ত্বতে সংযোগ নেই, বিয়োগও নেই, বস্তুত আছে শুধু নিত্য যোগ—'**তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্**' (গীতা ৬।২৩)।

যতকাল পদার্থ, ক্রিয়া, চিন্তা, স্থিরতার সাথে আমার সম্বন্ধ থাকে, ততকালই পরতন্ত্রতাও থাকে, কারণ পদার্থ, ক্রিয়া ইত্যাদি হলো 'পর', 'স্ব' নয়। এইগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ-ছেদ হলেই আমি স্বতন্ত্র (যুক্ত) হয়ে যাব। বস্তুত আমার স্বরূপ (অস্তিত্ব) স্বাধীনতা-পরতন্ত্রতা—দুটি থেকেই পৃথক। কারণ ওইগুলি তো সাপেক্ষ, কিন্তু স্বরূপ হলো নিরপেক্ষ সত্তা।

ভগবান বলেছেন—

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।

(গীতা ২।১৬)

'অসতের ভাব বিদ্যমান নয় এবং সতের অভাবও বিদ্যমান নয়।'

শরীর, পদার্থ, ক্রিয়া, অবস্থা ইত্যাদি অসৎ। সুতরাং ওইগুলির ভাব (সত্তা) বিদ্যমান নয়, অর্থাৎ ওইগুলির অনস্তিত্ব আছে সর্বদাই। স্বরূপ হলো সৎ, সুতরাং তার অনস্তিত্ব বিদ্যমান নয় অর্থাৎ সেটির ভাব (সত্তা) নিত্য বর্তমান। অসতের সাথে নিজের সম্বন্ধ না মানলে অভাবরূপ অসতের অভাব হয়ে যায় এবং ভাবরূপ সৎ একভাবে বিদ্যমান থাকে এবং তার অনুভব হয়ে যায়।

জ্ঞানমার্গে অসতের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং নিজের (চিৎ-সত্তামাত্র) স্বরূপে স্বতঃসিদ্ধ স্থিতির অনুভব হয়ে যায়। এরপর স্বরূপ যাঁর অংশ, সেই পরমাত্মার দিকে স্বাভাবিক আকর্ষণ হতে থাকে, তাকেই বলে প্রেম। নিজের স্বরূপ সবারই প্রিয়, অতএব সেটি যাঁর অংশ, সেই পরমাত্মাকে যে কতো প্রিয় বলে বোধ হবে !—তার কোন সীমা নেই।

~~০~~

আমিত্বহীন স্বরূপের অনুভব

প্রত্যেক সাধকেরই মমত্বশূন্য তথা নিরহংকার হওয়া খুবই আবশ্যক। কারণ 'আমি' ও 'আমার' ভাবটিই হলো মায়া যার দ্বারা জীব বদ্ধ হয়।

মৈ অরু মোর তোর তৈঁ মায়া। জেহিঁ বস কীন্হে জীব নিকায়া॥

(শ্রীরামচরিতমানস, অরণ্যকাণ্ড ১৫।২)

মৈ-মেরে কী জেবরী, গল বঁধ্যো সংসার।
দাস করীরা ক্যোঁ বঁধে, জাকে রাম অধার॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ এই তিনটি সাধনমার্গেই মমত্বশূন্য তথা অহংকারশূন্য হওয়ার কথা বলেছেন ; কর্মযোগে বলা হয়েছে **'নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি'** (২।৭১), জ্ঞানযোগে আছে, **'অহঙ্কারং ....বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে'** (১৮।৫৩) এবং ভক্তিযোগে উক্ত হয়েছে **'নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী'** (১২।১৩)। এই বিষয়ে সাধকদের জন্য একটি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য কথা হলো এই যে, প্রকৃতপক্ষে জীবের স্বরূপে অহংবোধ (আমিত্ব) নেই। অহংবোধ (আমিত্ব) এবং মমত্ববোধ (আমার)—এই দুটিই নিজ স্বরূপে মেনে নেওয়া হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তা স্বরূপে নেই। যদি তা সত্যিই থাকত তাহলে তো কেউ কখনো মমত্বশূণ্য ও নিরহঙ্কার হতেই পারত না এবং ভগবানও মমত্বশূন্য এবং নিরহংকার হওয়ার প্রসঙ্গই তুলতেন না। অর্থাৎ মানুষ মমত্বরহিত ও অহংকাররহিত হতে পারে বলেই ভগবান এইরকম কথা বলেছেন।

'আমি' কী ?

প্রত্যেক মানুষই অনুভব করে 'আমি আছি'। এই 'আমি আছি' বোধটিই হলো চিদ্ জড়গ্রন্থি। যদিও এর মধ্যে 'আমি'র মুখ্যতা দেখা যায় এবং ওই বোধে 'আছি' বোধকে সহায়করূপে অনুভব হয়, তথাপি

প্রকৃতপক্ষে মুখ্যতা আছে 'আছি' (স্বরূপ)-এরই, 'আমি'-এর নয়। কারণ এই অহং বা **'আমি' বোধের পরিবর্তন আছে, কিন্তু অস্তিত্ব বা 'আছি' বোধের কোন পরিবর্তন নেই**। যেমন, 'আমি বালক', 'আমি যুবক', 'আমি বৃদ্ধ', 'আমি রোগী', 'আমি নীরোগ'—এই সব প্রকাশে 'আমি'র দশা পাল্টে যাচ্ছে কিন্তু প্রতিটিতেই অস্তিত্ববোধটি 'আছি' রূপে একরকমই থাকছে, কোনভাবেই পরিবর্তিত হচ্ছে না। 'আছি' (অস্তিত্ব) বোধ নির্বিকার রূপে নিত্য বর্তমান। **'আমি' (অহং) প্রকৃতির অংশ আর 'আছি' (অস্তিত্ব) হলো প্রকৃতির অতীত পরমাত্মার অংশ। এই যে 'আছি' বোধ তা সৎ-অস্তিত্ববাচক। 'আমি'র সঙ্গে যুক্ত হওয়াতেই তাতে 'আছি' বোধ হয়। যদি 'আমি' (অহং) সঙ্গে না থাকত, তাহলে 'আছি' শব্দটা আসত না, ব্যবহৃত হতো 'আছে'**। এই 'আছে' সর্বব্যাপী, কিন্তু 'আমি'র সংযোজনে তাতে পরিচ্ছিন্ন বা খণ্ডিত অস্তিত্বের প্রতীতি হয়।

আমি, আপনি, ইনি এবং উনি—এই চারটিতে শুধুমাত্র 'আমি'র সঙ্গেই 'আছি' ব্যবহৃত হয়, বাকী তিনটিতে ব্যবহৃত হয় 'আছেন', যেমন, আপনি আছেন, ইনি আছেন, উনি আছেন। অনাদিকাল থেকে চলে আসা অগণিত প্রাণীকুলের সবাইকে 'আছে' বলে বলা যায় যেমন, 'এই প্রাণীটি আছে'। পৃথিবী, স্বর্গ, নরক, পাতাল ইত্যাদি সমস্ত 'লোক'কে 'আছে' বলে উল্লেখ করা যায়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ, এই চারযুগকে 'আছে' বলে উল্লেখ করা যায়। কিন্তু **'আমি' বলে উল্লেখ একমাত্র নিজেকেই করা যায়**। সব ব্যক্তি বা বস্তুর অস্তিত্বই জ্ঞাপিত হয় 'আছে' শব্দ দিয়ে, কিন্তু 'আছি' শব্দ একমাত্র 'আমি'র ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

'আমি' (অহং) জড় আর 'আছি' চিন্ময়সত্তা। 'আমি' এবং 'আছি', দুটির একত্র হয়ে যাওয়া বা মিলিত হয়ে যাওয়াই তাদাত্ম্য (চিদ্‌জড়গ্রন্থি)। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, আমরা নিরবচ্ছিন্ন নিত্য অস্তিত্বের আনন্দকেও চাই আবার নশ্বর অনিত্য ভোগ তথা তার প্রাচুর্যকেও চাই। 'আমি' ও 'আছি'র তাদাত্ম্যের কারণেই এই দুই

বিভাগের উৎপত্তি।

'আমরা চিরকাল (জীবিত) থাকতে চাই'—এই ইচ্ছা নশ্বরের হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না আর অবিনশ্বরেরও হওয়ার কথা নয়। কিন্তু অবিনশ্বরের মধ্যে ওই ইচ্ছা জাগে, মৃত্যুভয় এলে তবেই। মৃত্যুভয় আসে জড়তার সঙ্গ হওয়ার ফলেই, কারণ চিৎ-স্বরূপ অবিনাশী হলেও জড় তো নশ্বর। অর্থাৎ চিৎ-সত্তা ('আছি' বা অস্তি বাচক)-এর সঙ্গে 'আমি'কে মিলিয়ে ফেলার ফলেই মৃত্যুভয় জাগে। ফলে মৃত্যুহীন জীবনের জন্য ইচ্ছাও জাগে। সুতরাং **বেঁচে থাকার ইচ্ছা 'আমি'-তেও নেই 'আছি'-তেও নেই, প্রকৃতপক্ষে তা আছে 'আমি আছি'-রূপ তাদাত্ম্যবোধে**। এই তাদাত্ম্যের কারণেই মানুষের মধ্যে ভোগেচ্ছা ও অনুসন্ধিৎসা (মুমুক্ষুত্ব) দুই-ই থাকে।

'আমি আছি'—এই দুইটির মধ্যে যদি 'আমি'কে প্রাধান্য দেওয়া হয় তাহলে সংসারের (ভোগ-ঐশ্বর্যের) ইচ্ছা হবে আর যদি 'আছি' কে প্রাধান্য দেওয়া হয় তবে পরমাত্মাকে লাভের (মোক্ষের) ইচ্ছা প্রাধান্য পাবে। যখন 'আমি' কে কেন্দ্র করে গঠিত সম্বন্ধ অর্থাৎ তাদাত্ম্যবোধ দূর হবে, তখন সংসারের ভোগের ইচ্ছাও চলে যাবে এবং পরমাত্মাপ্রাপ্তির ইচ্ছাও পূর্ণ হবে। কারণ জগৎ-সংসার অপূর্ণ, তাই জাগতিক (সাংসারিক) সমস্ত ইচ্ছা কখনোই পূরণ হয় না, আবার পরমাত্মা স্বয়ংই পূর্ণ, তাই তাঁকে লাভ করার ইচ্ছা কখনোই অপূর্ণ থাকে না অর্থাৎ পূরণ হয়। ভোগেচ্ছাই হোক বা মুমুক্ষুত্বই হোক, প্রতিটি ইচ্ছারই উৎপত্তি হয় জড়ের সঙ্গে (তাদাত্ম্য) সম্বন্ধকে কেন্দ্র করেই। এই তাদাত্ম্যবোধ দূর হলেই মানুষ জীবন্মুক্ত হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে জীব মাত্রেই তো আদি থেকেই জীবন্মুক্ত, কিন্তু আমিত্বের সঙ্গে সম্বন্ধ (তাদাত্ম্য) মেনে নেওয়ার ফলেই তার বোধে জীবন্মুক্তির অনুভব সম্ভব হচ্ছে না। এইজন্যই **যা নিত্যপ্রাপ্ত তার 'প্রাপ্তি' বলা হয়, আর যা নিত্য নিবৃত্ত, তার 'নিবৃত্তি' বলা হয়।**

অনুভব কীকরে হবে !

প্রশ্ন—'আমি' এবং 'আছি' এই দুটি যে ভিন্ন—তার অনুভব কী করে করব ?

উত্তর—এ তো আমাদের সবারই অনুভূত বিষয়। জাগ্রত ও স্বপ্ন াবস্থায় তো আমাদের সক্রিয় বোধ থাকে, কিন্তু সুষুপ্তিতে (গাঢ় নিদ্রায়) কোন সক্রিয়তা থাকে না। কারণ সুষুপ্তির দশায় 'আমিত্ব' বা অহংবোধ জাগ্রত থাকে না, তখন অহংবোধটি অবিদ্যায় লীন হয়ে থাকে। কিন্তু **অহং লীন হয়ে থাকলেও আমাদের স্বরূপ যথাযথই থাকে**। সেইজন্য সুষুপ্তি থেকে জাগরণের পর আমরা বলি 'আমি এমন সুখের নিদ্রায় ছিলাম যে আমার কোন বোধই ছিল না'। কিন্তু 'কোন বোধই ছিল না' এই বোধটি অবশ্যই ছিল। তা না হলে কী করে বলছি যে 'কোন বোধই ছিল না ?' এর দ্বারা এইটিই প্রতিপন্ন হচ্ছে যে জাগ্রতে ও স্বপ্নে অহংবোধ জাগ্রত থাকা কালেও আমার স্বরূপ (সত্তা) ছিল এবং সুষুপ্তিতে অহংবোধ জাগ্রত না থাকলেও তখনো স্বরূপ (সত্তা) একই রকম ছিল। সুতরাং আমি অহং-এর ভাব ও অভাব—দুটোকেই জানতে পারছি। যদি আমি অহং থেকে ভিন্ন না হতাম, অহংকারই যদি হতাম তাহলে তো সুষুপ্তিতে অহংবোধ লীন হওয়া কালে আমি থাকতামই না[১]। সুতরাং আমিত্ব (অহংবোধ) না থাকলেও আমাদের স্বরূপ-অস্তিত্ব অবিচল বিদ্যমান থাকে—এইটিই সিদ্ধান্ত।

আমরা অহং-এর ভাব ও অভাব—দুটি দশাই জানি, কিন্তু নিজের স্বরূপের অভাবকে কখনোই কেউ জানতে পারে না, কারণ আমাদের স্বরূপের অভাব তো কখনো হতেই পারে না—**'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'** (গীতা ২।১৬)। অসৎ বস্তু অর্থাৎ অহং-এর ভাব ও অভাবকে প্রকাশকারী আমার স্বরূপ-সত্তা নিত্য বর্তমান। যেমন, গতকাল দিনের বেলা আমি জাগ্রত ছিলাম, রাত্রে শয়নে স্বপ্ন দেখা কিংবা গাঢ় নিদ্রা

---

[১]সুষুপ্তিতে অহং দূর হয়ে যায় না, বস্তুত সেটি অবিদ্যায় লীন হয়ে যায় এবং নিদ্রা শেষ হলে (জাগ্রত হলে) আবার তা প্রকটিত হয়ে যায়। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান (উপলব্ধি) হলে অহংবোধের লয় হয়ে যায়।

হয়েছিল, আর আজ আবার জাগ্রতদশায় থাকাকালে ও স্বপ্নদশায় অহং-ভাব অনুভূত হচ্ছে কিন্তু গাঢ়নিদ্রায় অনুভূত হয় অহং-এর অভাব। জাগ্রত, স্বপ্ন বা সুষুপ্তি অবস্থা যে সবসময় থাকে না—এটিও আমি অনুভব করি। সুতরাং আমার স্বরূপ হলো অহং তথা জাগ্রতাদি অবস্থাত্রয়ের ভাব ও অভাবকে প্রকাশকারী অলুপ্ত (সদা বিদ্যমান) চিৎ-প্রকাশ। এইজন্যই আমরা বলি যে, গতকাল যে আমি জাগ্রত ছিলাম, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতেও সেই ছিলাম, আজও সে-ই জাগ্রত আছি। অর্থাৎ এই **তিন অবস্থাতেই অখণ্ডরূপে আমার স্বরূপ সত্তার অনুভব হয়**। এই ভাবে বলা যায়, আমি যে প্রজাতিতেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, তাতে আমার অহংবোধ পরিবর্তিত হবে, কিন্তু স্বরূপত আমি পরিবর্তিত হব না। যেমন আগে আমি বলতাম, 'আমি বালক', তার কিছুকাল পরে বলেছি 'আমি যুবক' এবং এখন বলছি 'আমি বৃদ্ধ'—এই বাল্যাবস্থা, যুবাবস্থা ও বৃদ্ধাবস্থা তো ভিন্ন, কিন্তু ওই দশাগুলিতে আমি তো স্বরূপত একই আছি অর্থাৎ শারীরিক অবস্থা পরিবর্তিত হলেও আমার প্রকৃত সত্তা একটুও পরিবর্তিত হয়নি। এই রকমই জীব মনুষ্যরূপে জন্মালে, 'আমি মানুষ' বলে মনে করে, দেবতা হলে 'আমি দেবতা' বলে নিজেকে ধারণা করে, পশু দেহে গেলে ভাবে 'আমি পশু', ভূত-প্রেত হলেও 'আমি ভূত-প্রেত' বলে নিজেকে বোঝে—এইরকম চলতেই থাকে। এর দ্বারা এইটিই প্রতিপন্ন হয় যে, **জীবের দেহান্তর ঘটলে অহং তো পরিবর্তিত হয় বটেই, কিন্তু আত্ম-স্বরূপ অপরিবর্তিত, একরূপ থাকে।**

এইভাবে সুষুপ্তিতে অহংকারের অভাব এবং অবস্থাত্রয়ে তথা দেহান্তরে অহংকারের পরিবর্তনের অনুভব তো সবারই ঘটে কিন্তু নিজের স্বরূপের অভাব কিংবা পরিবর্তনের অনুভব কখনো কারোর কোন ভাবেই হয় না, হতেই পারে না। অর্থাৎ এইটিই সিদ্ধান্ত যে, অহংকার (আমিত্ববোধ) আমার স্বরূপ নয়। আমাদের ভুলটা হয় এই যে, আমরা এই সিদ্ধান্তটিকে সমাদর করি না বা গুরুত্ব দিই না। যদি আমরা এই সিদ্ধান্তটিকে যথার্থ স্বীকার করি, তাহলে অনাদিকাল থেকে

অহং এর সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে আমিত্ব-সূচক যে সংস্কারে বদ্ধ হয়েছি সেই সংস্কার নিজেই ক্ষয়িত হতে হতে লয় পাবে।

আমার স্বরূপ

আমার স্বরূপ প্রকৃতপক্ষে একটি অস্তিত্বমাত্র। এই অস্তিত্বে 'আমি-তুমি-ইনি-উনি' ইত্যাদি রূপ কোন ভেদ নেই। আমি-তুমি-ইনি-উনি—এই চারটিই প্রাকৃতিক (জাগতিক) কিন্তু স্বরূপ হলো প্রকৃতির অতীত সত্তা। এইগুলি সংখ্যায় চারটি, আর স্বরূপ হলো শুধুমাত্র একটি। এই চারটি অনিত্য আর স্বরূপ হলো নিত্য। এই চারটি অন্যের সাপেক্ষে বর্তমান আর স্বরূপ হলো নিরপেক্ষ সত্তা। এই চারটি প্রকাশিত হয়, আর স্বরূপ হলো তার প্রকাশক। এই চারটি হলো আধেয় আর এই স্বরূপ হলো তার আধার। এই চারটি জানার অন্তর্গত আর (স্বরূপ) সত্তা হলো জ্ঞাতা। এই চারটির পরিবর্তন তথা অভাব ঘটে, কিন্তু স্বরূপের কখনোই পরিবর্তন বা অভাব ঘটতে পারে না। এইজন্য মানুষ এই চারটির পরিবর্তন, আসা-যাওয়া, ভাব-অভাব, উৎপত্তি-বিনাশের অনুভব করলেও নিজের স্বরূপের (অস্তিত্বের) পরিবর্তন, আসা-যাওয়া, ভাব-অভাব তথা উৎপত্তি-বিনাশের অনুভব তার কখনোই হতে পারে না।

আমি, আপনি, ইনি, উনি—এই চারটি তো অসৎ, জড় তথা দুঃখ-রূপ, কিন্তু আত্ম সত্তা তো সৎ-চিৎ-আনন্দরূপ। এই চিন্ময় সত্তায় সকলেই স্বরূপত নিত্য বিদ্যমান। সাংসারিক স্থূল সক্রিয়তার মধ্যেও এই সত্তা থাকে নিত্য অটল স্থিতিতে। এর মধ্যে কোনরকম বিকার, চাঞ্চল্য, অশান্তি বা উদ্বেগ হতে পারে না। কারণ এই সত্তায় না আছে 'অহংতা' (আমিত্ব) না আছে মমতা (মমত্ব)। এই সত্তা অস্তি-মাত্র, জ্ঞান-মাত্র। **এই জ্ঞানের কেউ জ্ঞাতা হতে পারে না, অর্থাৎ জ্ঞান থাকলেও জ্ঞানী নেই**। যতকাল জ্ঞানী থাকে, ততকাল সীমাবদ্ধতা তথা ব্যক্তিত্ব (অহং-স্বাতন্ত্র্য) থাকে। ওই ভাব দূর হলে, শুধুমাত্র বিদ্যমান থাকে নির্বিকার, নিরহংকার, সর্বব্যাপী সত্তা, যা সর্বজীবেরই

নিত্যপ্রাপ্ত আত্মাস্বরূপ[১]।

স্বরূপের জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা ও সমাধি, এই পাঁচটি অবস্থার কোনটিই নেই। এই পাঁচটি দশাই অনিত্য, কিন্তু স্বরূপ হলো নিত্য। এই অবস্থাগুলি হলো প্রকাশ্য আর স্বরূপ হলো প্রকাশক। **এই পাঁচটি অবস্থা প্রতিটি অন্যগুলি থেকে ভিন্ন, অথচ এইগুলির জ্ঞাতা আত্ম-স্বরূপ শুধুমাত্র একটিই**। এই পাঁচ অবস্থার পরিবর্তন, অভাব তথা আরম্ভ ও শেষ তো জীব বুঝতে পারে, কিন্তু নিজের স্বরূপের পরিবর্তন, অভাব তথা আরম্ভ ও শেষের কোন অনুভব তার কখনোই হয় না, কারণ স্বরূপে এই সব ব্যাপার ঘটতেই পারে না। স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট পদার্থ যেমন মিথ্যা (অভাব-রূপ), তেমনই ওই পদার্থগুলিকে অনুভবকারী (স্বপ্ন দর্শনকারী) অহংকারও মিথ্যা। স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রতাবস্থা কিছুকালের জন্য সুপ্ত থাকে মাত্র, অর্থাৎ শেষ হয় না, কিন্তু জাগ্রতাবস্থায় পূর্বদৃষ্ট স্বপ্ন একেবারে শেষ হয়ে যায়। তাই, স্বপ্ন শেষ হওয়া মাত্র সেটির দ্রষ্টা অহংকারও শেষ হয়ে যায়। এইভাবেই জাগ্রতাবস্থার যে অহংকারবোধ, তাও দেহত্যাগের পর দূর হয়ে যায়, কিন্তু তাদাত্ম্য বোধের কারণে, জন্মান্তরে নতুন দেহগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আবার অহংকার জেগে ওঠে। যদিও জাগ্রৎ, স্বপ্ন আদি অবস্থাগুলিতে অহংকারও ভিন্ন ভিন্ন হয়, তথাপি ওই দশাগুলিতেও আত্ম-স্বরূপ একই থাকার কারণে ভ্রমবশত জীবের মনে হয় যে তার অহংকারও একই আছে।

তুরীয়াবস্থারূপ একটি (চতুর্থ) দশা আছে, যেটিকে জাগ্রত, স্বপ্ন ও

---

[১]প্রকৃতপক্ষে, স্বরূপ-সত্তার বর্ণনা শব্দের দ্বারা সম্ভব নয়। এই সত্তাকে, অসতের বিপরীতে সৎ, বিকারের বিপরীতে নির্বিকার, অহংকারের বিপরীতে নিরহংকার, সীমায়িতের বিপরীতে অসীম বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে এই সত্তাকে সৎ, নির্বিকার ইত্যাদি শব্দে বলা যথার্থ নয়। কারণ সকল শব্দই প্রযুক্ত হয় আপেক্ষিক ভাবে তথা প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধিত ভাবে, অথচ এই সত্তা সর্ব-নিরপেক্ষ তথা প্রকৃতির অতীত। এইজন্য গীতায় উক্ত হয়েছে যে, এই তত্ত্বকে ‘সৎ’ও বলা যায় না ‘অসৎ’ও বলা যায় না—‘ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে’ (১৩।১২)।

সুষুপ্তির অতীত-দশা বলা হয়। বাস্তবে এই তুরীয়াবস্থা কোন অবস্থা নয়, প্রকৃতপক্ষে তিন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটিকেও তুরীয়াবস্থা অর্থাৎ চতুর্থ অবস্থা রূপে বলা হয় মাত্র। এটিকে বদ্ধাবস্থার বিপরীতে মুক্তাবস্থাও বলা হয়। এটির একটি নাম নির্বাণও বটে—

পদ নিরবাণ লখে কোঈ বিরলা,
তিন লোকমেঁ কাল সমানা,
চৌথে লোকমেঁ নাম নিসাণ, লখে কোঈ বিরলা।

তুরীয়াবস্থা, মুক্তাবস্থা, অথবা নির্বাণপদ কোন অবস্থা বা পদ নয়, প্রকৃতপক্ষে এই হলো আমাদের স্বতঃসিদ্ধ নিত্য স্বরূপ।

আমিত্ব দূরীকরণের উপায়

'আমিত্ব' (বা অহংভাব) দূর হবে কী করে ?—এই প্রশ্ন যদি সর্বদা জাগ্রত থাকে, তাহলে অহংকার দূর হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে অহংকার তো নেই-ই। কিন্তু যথার্থ ও তীব্র আগ্রহ না থাকার কারণেই সাধকের এটি অনুভূত হয় না। এক সন্তের চরিতকথায় আছে যে, গ্রীষ্মকালে একদিন তাঁর খুব তৃষ্ণার উদ্রেক হয়েছিল এবং তাঁর কমণ্ডলুতে শীতল জলও ছিল। কিন্তু তাঁর মধ্যে এই দৃঢ় ভাব ছিল যে যতক্ষণ না আত্মোপলব্ধি হবে ততক্ষণ তিনি জলপান করবেন না। এই রকম তীব্র আগ্রহের ফলে তাঁর অবিলম্বে উপলব্ধি হয়ে গেল। এই উপলব্ধি একবার হয়ে গেলে, চিরদিনের জন্য, যুগ যুগান্তরের জন্যই তা অনুভূত থাকবে—**'যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব'** (গীতা ৪।৩৫)।

অহংভাব দূরীকরণের জন্য তিনটি পন্থা আছে—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। কর্মযোগে, নিষ্কামভাবে অপরকে সেবা করা বিধেয়, অপরকে সুখী করার মধ্য দিয়ে নিজের ভোগ ও ঐশ্বর্যের ইচ্ছা দূরীভূত হয়ে যাবে। ভোগেচ্ছা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেলে অহংকারও দূর হয়ে যাবে, কারণ ভোগেচ্ছার ওপরই অহংকার নির্ভর করে থাকে। জ্ঞানযোগে, বিবেকের সাহায্যে বুঝতে হয় যে, অনিত্য কোন কিছুর

সঙ্গেই নিজের (আত্মা-স্বরূপের) কোন সম্বন্ধ নেই, প্রকৃতপক্ষে আত্মা-স্বরূপের সম্বন্ধ সর্বব্যাপী সৎ-স্বরূপের সঙ্গেই। এই রকম বোধের মধ্য দিয়ে সৎ-স্বরূপকে উপলব্ধি করলেই অহংকার লয় পাবে। ভক্তিযোগে, 'ভগবানই আমার, সংসার আমার নয়'—এইটি মেনে নিয়ে সংসারের প্রতি বিরাগী এবং ভগবানের প্রতি অনুরাগী হতে পারলে অহংকার নষ্ট হয়ে যাবে। **কর্মযোগে অহংকার শুদ্ধ হয়ে যায়, জ্ঞানযোগে অহংকার লয় প্রাপ্ত হয়, আর ভক্তিযোগে অহংকার রূপান্তরিত হয়ে যায়।** শুদ্ধ হওয়া, লয় পাওয়া, আর রূপান্তরিত হওয়া—তিনটিরই পরিণাম একই (অর্থাৎ অহং-এর বিলয় বা অভাব)।

অহংকার অনিত্য এবং পরিবর্তনশীল—এটি সকলেই অনুভব করে। প্রতিদিনেই বারংবার অহং এর দশা পরিবর্তিত হয়। পিতার সামনে পুত্র বলে 'আমি পুত্র', পুত্রের সামনে আবার সে-ই বলে 'আমি পিতা', কেউ যদি তাকে বলে যে 'তুমি ঠিক ঠিক বলো, তুমি পুত্র না পিতা ?' তাহলে সে কী উত্তর দেবে ? কোনটিকে সে সত্য বলে জানাবে ? এই বহুরূপের ভাব ছেড়ে আমরা যদি যথার্থভাবে দেখি তবে সত্যটি চিনতে পারা যাবে। একই মানুষ মাতার কাছে 'সন্তান', আবার ভগ্নীর কাছে 'ভ্রাতা', স্ত্রীর কাছে 'স্বামী'—এই যে তার বহুরূপীভাব বা পরিবর্তনশীলতাকে মেনে নেওয়া, এইটিই তার অহংকার দূরীকরণের বাধা। **প্রকৃতপক্ষে কোন মানুষই পিতা বা পুত্র, ভ্রাতা বা স্বামী নয়, কিন্তু এই সবকটিতেই অধিষ্ঠিত একক (অপরিবর্তনীয়) সত্তা। এই সত্তাই হলো জীবের আত্মা-স্বরূপ।** যদি এই স্বরূপ পিতা হত তাহলে তা কখনো পুত্র হত না, কিংবা যদি পুত্র হত তবে পিতা হত না। অথচ পুত্রের সামনে সে বলে 'আমি পিতা', আর পিতার সামনে বলে 'আমি পুত্র' ; অর্থাৎ এই অহংভাব একটি আপেক্ষিক প্রকাশমাত্র, যা কেবলমাত্র সাংসারিক ব্যবহারের জন্যই প্রযোজ্য। এই অহং-বৃত্তি কর্তা নয়, বস্তুত এটি একটি করণ মাত্র। কর্তা হলো অহংকার। 'ভোজন করছি', 'পান করছি', 'বলছি' ইত্যাদি সাধারণ ক্রিয়া শুধু 'অহংবৃত্তি'

থেকে হয়, কিন্তু সমস্ত ক্রিয়ার সঙ্গেই থাকে অহংকার। ওই সকল ক্রিয়ার প্রেক্ষিতে জীব যখন নিজের মধ্যে কোন বিশেষত্ব দেখে, তার অভিমান এসে যায়, যেমন—'আমি ধনবান', 'আমি বিদ্বান', 'আমি ভাষ্যকার' ইত্যাদি ইত্যাদি।

গীতায় আছে—**অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।** (৩।২৭)

'অহংকারে মোহিত অন্তঃকরণবিশিষ্ট অর্থাৎ অহংকারে তাদাত্ম্যবোধকারী মানুষ নিজেকে কর্তা বলে মনে করে।' প্রকৃতপক্ষে আত্মস্বরূপ কর্তা নয়। সুতরাং সাধকের উচিত 'আমি কিছুই করি না' এই ধারণায় দৃঢ় থাকা—'**নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ**' (গীতা ৫।৮)। যখন নিজের বোধে কর্তৃত্বভাব ও লিপ্ততা থাকে না, তখনই সাধকের পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়ে যায়, সে সিদ্ধিলাভ করে—'**যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে**' (গীতা ১৮।১৭)।

বস্তু, অর্থ, আত্মীয়, শরীর ইত্যাদিতে যে অনুরাগ, তা-ই হলো বুদ্ধির লিপ্ততা। কর্তৃত্ববোধ ও লিপ্ততা—এই দুটির কোনটিই স্বরূপে নেই, ওগুলিকে মেনে নেওয়া হয় মাত্র—'**শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে**' (গীতা ১৩।৩১)। যেমন কোন ব্যক্তি কোন আলোকিত স্থানে বসে থাকলে ওই আলোটি লোকটির সাথে লিপ্ত হয় না এবং তার মধ্যে 'আমি আলো' বা 'আমার আলো' এইরকম কোন 'অহংভাব' বা 'মমতা' জাগে না, তেমনই সমস্ত ক্রিয়ার প্রকাশক হওয়া সত্ত্বেও আত্মস্বরূপ (স্বয়ং) নির্লিপ্তই থাকে। বস্তুত স্বরূপ ওই ক্রিয়াসমূহকে প্রকাশিত করে না, প্রকৃতপক্ষে ক্রিয়াসমূহই স্বরূপের দ্বারা প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ স্বরূপের অস্তিত্বে ক্রিয়াসমূহ নিজ নিজ সক্রিয়তা লাভ করে।

তাদাত্ম্যের ফলেই অনুরাগ-বিদ্বেষ, হর্ষ-শোক, চিন্তা-ভয়, উদ্বেগ-চাঞ্চল্য আদি বিকারের উৎপত্তি হয়। সাধকের যদি ওই বিকারগুলি না হয় এবং তার নিজের মধ্যে কেবল সীমায়িত (পরিচ্ছিন্ন) ভাবই অনুভূত হয় তাহলেও তার পক্ষে তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ 'অহংভাব' হলো

পরিচ্ছিন্নতাবোধক, কিন্তু আত্মস্বরূপ তো তা নয়। তাই জীবের প্রকৃত সত্তা (অপরিচ্ছিন্নতা) হলো আত্মস্বরূপ, তাহলে নিজের মধ্যে কেন পরিচ্ছিন্নতার ভাব থাকবে ?—সাধককে এইরূপ বিচারপূর্বক চলতে হবে ; সন্তুষ্টিতে থাকা ঠিক নয়। এইজন্য পূর্বসংস্কারবশত নিজের মধ্যে পরিচ্ছিন্নভাব (অহংভাব) দেখলে সাধকের মনে করতে হবে যে, **প্রকৃতপক্ষে 'অহংভাব' আসছে না, তা বিদায়ই নিচ্ছে**। কোন গৃহদ্বার দিয়ে মানুষ এলেও তাকে দেখা যায়, আবার বেরিয়ে গেলেও দেখা যায়। এর মানে এই নয় যে, 'অহং'-এর খণ্ডিত রূপ হয়। 'অহং' কখনো খণ্ডিত হয় না। বস্তুত অনাদিকাল থেকে 'অহং'ভাব জনিত যে সংস্কার গড়ে উঠেছে, সেটিরই ভাব বা আভাস হঠাৎ হঠাৎ একেকভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তাই এই সবে গুরুত্ব না দিয়ে, এগুলিকে উপেক্ষা করা উচিত এবং দৃঢ়তার সঙ্গে এই ধারণা করা প্রয়োজন যে আত্মস্বরূপে প্রকৃতপক্ষে 'অহং' নেই-ই।

প্রকৃতির কোন কার্যই যখন স্থির নয় তখন অহংই বা কী করে স্থির থাকবে ? অহং সর্বক্ষণই পরিবর্তিত হচ্ছে, কখনোই স্থির বা একরকম থাকছে না, থাকতে পারেও না। কিন্তু প্রকৃতির থেকে যা অতীত তত্ত্ব (আত্ম-সত্তা), সেটি তো কখনো বদলায় না, সেটি সর্বদা স্থির ও একরূপ থাকে। সুতরাং পরিবর্তনশীল বস্তুর সাথে (অপরিবর্তনীয়) আত্ম-সত্তার কোন সম্বন্ধই নেই—এইরূপ দৃঢ় ধারণা করে নিতে হবে, কারণ প্রকৃতপক্ষে সেটাই ঠিক।

'অহং' এর খোঁজে

এখন প্রয়োজন এই আমিত্ব বা 'অহং'-এর স্থিতি কোথায়—সেইটিই অনুসন্ধান করা। যদি সৎ-স্বরূপে তা থাকে তবে তো অহং কখনোই দূর হবে না এবং মানুষও কখনো মমত্ব-রহিত ও নিরহংকার হতে পারবে না। অহং তো প্রকৃতির ব্যাপার আর সৎ-তত্ত্ব প্রকৃতির অতীত। প্রকৃতির মধ্যেই যা নেই তা প্রকৃতির অতীত তত্ত্বে কীকরে থাকবে ! সৎ-তত্ত্ব এমন পরিপূর্ণ যে তার মধ্যে লয়স্বভাব সম্পন্ন অহং-

এর সহাবস্থানের কল্পনাও করা যায় না। যদি অহং-কে অসৎ-এর মধ্যে আছে বলেও মনে করা হয়, তাহলেও বলার যে, অসৎ তো নিরন্তর পরিবর্তনশীল, তাতে কী করে অহং টিকে থাকবে ! যার নিজেরই কোন সত্তা নেই, তার মধ্যে অন্য বস্তুর অবস্থানের কল্পনাই বা করা যায় কেমন করে ? সুতরাং এই অহং সতেও নেই অসতেও নেই। সৎ ও অসৎ-এর সম্বন্ধের মধ্যেও 'অহং' থাকার প্রশ্ন নেই, কারণ আলো ও আঁধারের যেমন সংযোগ হতে পারে না, তেমনই সৎ ও অসতেরও সংযোগ (সম্বন্ধ) হতে পারে না। অন্তঃকরণেও 'অহং'কে মেনে নেওয়া যায় না, কারণ অন্তঃকরণ হলো একটি বৃত্তি যা কর্তার অধীনে নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং যে কর্তা, তার মধ্যেই 'অহং' বিদ্যমান।

এখন প্রশ্ন হলো, কর্তাটি কে ? শরীর কর্তা নয়, কারণ প্রতিক্ষণেই শরীরের আয়ুক্ষয়জনিত পরিবর্তন হচ্ছে। মন, বুদ্ধি, চিত্ত তথা অহংকার—এই চারটি হলো করণ, যা 'অন্তঃকরণ' নামে পরিচিত। এই অন্তঃকরণও কর্তা নয়, কারণ করণ কর্তার অধীনে থাকে। কিন্তু কর্তা তো স্বতন্ত্র হয়—'**স্বতন্ত্রঃ কর্তা**' (পাণি. অঃ ১।৪।৫৪)। যে কোন ক্রিয়ার সম্পাদনেই করণ হলো আবশ্যিক সহায়ক—'**সাধকতমং করণম্**' (পাণি, অঃ ১।৪।৪২) ; এই কারণে করণ বিনা কোন কার্য সিদ্ধি হতে পারে না। যেমন, কোন লেখনী স্বতন্ত্র ভাবে নিজে কিছু লিখতে পারে না, বস্তুত লেখার জন্য ওটি একটি মাধ্যম (করণ) মাত্র, যা লেখকের (কর্তার) অধীনেই আছে। অন্তঃকরণ কর্তা নয়, আবার কর্তাও করণ নয়। অন্তঃকরণ তো 'করণ', তা কর্তা হবে কী করে ? দ্বিতীয় কথা, যদি করণের মধ্যেই কর্তৃত্ববোধ থাকে তাহলে জীবের সুখ-দুঃখ হয় কেন ? যদি করণই সুখী-দুঃখী হয় তাতে জীবের ক্ষতিটা কোথায় ? সৎ-স্বরূপও কর্তা নয়, কারণ 'অহং' তো প্রকৃতির ব্যাপার, প্রকৃতির অতীত তত্ত্বে তার থাকা সম্ভব হবে কেমন করে ? যদি স্বরূপেই কর্তৃত্ববোধ থাকতো, তাহলে কখনোই তা দূর হতো না, কারণ স্বরূপ হলো অবিনশ্বর। এইজন্য গীতায় বলা হয়েছে—

তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।

পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥ (১৮।১৬)

'কর্ম সম্পাদনে শুদ্ধ আত্মাকে কর্তা বলে যে মনে করে, সেই দুর্মতি ঠিকমতো বোঝেনি, কারণ তার বুদ্ধি শুদ্ধ নয়।'

শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥ (গীতা ১৩।৩১)

'এই আত্মা শরীরে থেকেও কিছুই করেন না, তথা লিপ্তও হন না।'

প্রকৃতপক্ষে, যে ভোক্তা (সুখী-দুঃখী) হয়, সে-ই কর্তা হয়। এখন প্রশ্ন হলো, ভোক্তা কে ? ভোক্তা সৎও নয়, অসৎও নয়। সৎ ভোক্তা হতে পারে না, কারণ সৎ-এর কখনো অনস্তিত্ব হতে পারে না—'**না ভাবো বিদ্যতে সতঃ**', অথচ ভোক্তৃত্বের অনস্তিত্ব হতে পারে—'**ন লিপ্যতে**' (গীতা ১৩।৩১)। অসৎও ভোক্তা হতে পারে না, কারণ অসতের তো সত্তাই নেই—'**নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ**'। সুতরাং তাতে ভোক্তৃত্বের কল্পনাও করা যায় না। অর্থাৎ, কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব সতেও নেই, অসতেও নেই। এইজন্য, **সাধকের উচিত সৎ ও অসৎ উভয় থেকেই 'অহং' কে সরিয়ে দেওয়া। এই দুটি থেকে অহংভাব বিদূরিত হলেই আর অহং থাকবে না, কর্তা-ভোক্তা থাকবে না, থাকবে শুধু চিন্ময় স্বরূপ-সত্তা।**

যখন কোন কর্তা-ভোক্তা থাকে না, তখন থাকে শুধু 'যোগ'। যোগ হলে ভোগ থাকে না অর্থাৎ, 'যোগ' তো থাকেই কিন্তু যোগী আর থাকে না, 'জ্ঞান' থেকে যায়, কিন্তু জ্ঞানী থাকে না, 'প্রেম' থেকে যায়, কিন্তু থাকে না প্রেমিক। যতকাল যোগী থাকে ততকাল যোগের ভোগ হয়। যতকাল জ্ঞানী থাকে, জ্ঞানের ভোগ হয়। যতকাল প্রেমিক থাকে, ততকাল প্রেমের ভোগ হয়। সুতরাং যে যোগী সে যোগের ভোগী। যে জ্ঞানী সে জ্ঞানের ভোগী। যে প্রেমিক সে প্রেমের ভোগী। যে যোগের ভোগী, সে তো কখনো বিষয়ের ভোগীও হতে পারে। যে জ্ঞানের ভোগী, সেও তো পারে কখনোও-বা কাম (অনুরাগ)-এর ভোগী হতে। যে প্রেমের ভোগী, সেও তো হতে পারে কখনো কামের (আসক্তির) ভোগী।

যখন ভোগী থাকে না, তখন কেবল যোগ থাকে। যোগ থাকলে

মানুষ মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু মুক্ত হলেও, কোন মহাপুরুষ যে সাধনপথে মুক্তি লাভ করেন তার একটা সংস্কার তাঁর চেতনায় থেকে যায়, যার ফলে অন্য দার্শনিকের সঙ্গে তিনি সর্বতোভাবে অভিন্নমতের হতে পারেন না। এই কারণেই বিভিন্ন দার্শনিকের মধ্যে তথা তাঁদের দর্শনের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। নিজের মতাদর্শের সংস্কার অপর দার্শনিকের মতকে সমাদর করতে বাধা দেয়। কিন্তু প্রতিক্ষণে বর্ধনশীল 'প্রেমের' প্রাপ্তি হলে নিজের মতের সংস্কার আর থাকে না, এবং অন্য সবার সাথে ঐক্যবোধ এসে যায়। এই জন্য রামায়ণে বলা হয়েছে—

প্রেম ভগতি জল বিনু রঘুরাঈ। অভিঅন্তর মল কবহুঁ ন জাঈ॥

(শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৪৯।৩)

অতএব কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ হলো সাধন, কিন্তু ভক্তিযোগ হলো সাধ্য। প্রেমের মধ্যে নিজের মতের সংস্কারেরও বিলয় হয়ে যাওয়ায়, সমস্ত মতভেদ দূর হয়ে যায় এবং '**বাসুদেবঃ সর্বম্**' অর্থাৎ সবই পরমাত্মা—এই অনুভব জাগ্রত হয়। তখন প্রকৃতপক্ষে '**বাসুদেবঃ সর্বম্**'-এইটি অনুভব করা বা এটিকে জানা কিংবা এটিকে উত্থাপন করার জন্য আলাদা কেউ থাকেই না, বস্তুত তখন এক বাসুদেবই শুধু থাকেন **যিনি অনাদিকাল থেকেই সমভাবে বিদ্যমান**। সমস্ত কিছুতেই পরমাত্মাকে দেখতে পারলে তখন সকল মতাদর্শেই সমাদরভাব আসে, কারণ নিজের ইষ্ট পরমাত্মার সঙ্গে তো কোন বিরোধ সম্ভবই নয়— '**নিজ প্রভুময় দেখহিঁ জগত কেহি সন করহিঁ বিরোধ**' (শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ১১২ খ)। এইজন্য গীতায় উক্ত হয়েছে যে, '**বাসুদেবঃ সর্বম্**'—অনুভবকারী মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ (৭।১৯)

'বহু জন্মের শেষে অর্থাৎ মনুষ্যজন্মে, 'এই সমস্ত কিছু বাসুদেবই'— এমন জ্ঞানসহ যে আমার শরণ নেয়, তার মতো মহাত্মা অতীব দুর্লভ।'

~~o~~

ভগবৎ-প্রাপ্তির সুগম ও শীঘ্র সিদ্ধিদায়ক সাধন

মানুষের খুব সুগমতাসহ তথা অবিলম্বে ভগবৎ-প্রাপ্তি হতে পারে। কিন্তু জাগতিক আসক্তির কারণেই এটি খুব কঠিন তথা বিলম্বে ঘটে বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে ভগবৎ-প্রাপ্তি কঠিন নয়, কঠিন হলো সংসারের প্রতি আসক্তি ত্যাগ। এই প্রসঙ্গে যদি গভীরভাবে বিচার করা হয় তাহলে দেখা যাবে, আসক্তি ত্যাগও কঠিন নয়। কারণ কোন আসক্তিই চিরস্থায়ী নয়। প্রধানত দুটি বিষয়ে আসক্তি হয়—ভোগ ও সম্পদ। কিন্তু ওইগুলির আসক্তি ২৪ ঘন্টাও নিরন্তর টিকে থাকতে পারে না। এইগুলির মধ্যে চিরস্থায়ী হওয়ার ক্ষমতাই নেই।

উৎপত্তি-বিনাশশীল বস্তুতেই আসক্তি হয়। **উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুর দ্বারা মানুষের কখনোই তৃপ্তি হতে পারে না—এইটিই নিয়ম**। যা নশ্বর তার দ্বারা অবিনশ্বরের তৃপ্তি হবে কেমন করে ! বিনাশশীলের আসক্তি অবিনাশী হবে কী করে ? তা হতেই পারে না। আসক্তি হলো আগন্তুক দোষ। এটিকে দূর করার উপায় হলো—'ভগবানের প্রতিই আমার অনুরাগ হোক'—এই আগ্রহকে বর্ধিত করা। 'কী করে আমার প্রভুর প্রতি ভালবাসা আসে'—এই লক্ষ্যে দিবারাত্র দৃঢ়ভাবে চেষ্টিত থাকা চাই। ভগবদনুরাগ ছাড়া আর কোন ইচ্ছাই না রাখা, এমনকি ঈশ্বরের দর্শনের ইচ্ছাও না। ভগবৎ-প্রেমের এমন ইচ্ছায় নিহিত থাকে এক বিস্ময়কর শক্তি। এই ইচ্ছাকে বর্ধিত করতে পারলে খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধিলাভ হবে। এই ইচ্ছাকে এমন বাড়াতে হবে যে অন্য সমস্ত ইচ্ছা নষ্ট হয়ে যায়। **কেবল একটি কামনাই থাকবে যে, 'ভগবানের প্রতি আমার অনুরাগ হোক' তখন সিদ্ধিলাভের জন্য একদিনও সময় লাগবে না।**

ভগবানকে মাধুর্যবোধে অনুভব, তাঁর শ্রীচরণে প্রেমাশ্রিত থাকা—

বস্তুত এটিই আমাদের একমাত্র আবশ্যকতা। 'আবশ্যকতা' হলো একটি ব্যাপার, আর 'ইচ্ছা' (কামনা) হলো আরেকটি ব্যাপার। জাগতিক ইচ্ছাকে কামনা, বাসনা, তৃষ্ণা, আশা ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। আর পরমাত্মাপ্রাপ্তির ইচ্ছাকে বলা যায় আবশ্যকতা, প্রয়োজন, চাহিদা, ক্ষুধা ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারে। অর্থাৎ **অনিত্য বিনাশশীলের প্রতি আগ্রহ হলো 'ইচ্ছা' আর অবিনাশী নিত্য সত্তার প্রতি আগ্রহ হলো 'আবশ্যকতা' শব্দে বাচ্য**। 'ইচ্ছা' মানুষকে ভোগ ও ঐশ্বর্যের দিকে আকর্ষণ করে আর 'আবশ্যকতা' নিয়ে যায় সৎসঙ্গ, ভজন-ধ্যান ইত্যাদির দিকে। ইচ্ছাপূরণের কোন শেষ নেই, কিন্তু আবশ্যকতার পূর্তি অবশ্যই আছে—এইটিই নিয়ম। জড়তার সাথে যার যতটা সম্বন্ধ রয়েছে, ততটাই ন্যূনতা। এই ঘাটতি পূরণের জন্যই 'আবশ্যকতা' চাই। জড়ত্বের (বিনাশশীল)-এর সাথে সম্বন্ধ সম্পূর্ণ ছিন্ন হলেই ইচ্ছা শেষ হয়ে যাবে এবং আবশ্যকতার হবে পূর্তি।

আদি থেকে বর্তমান পর্যন্ত কখনো কারোর সমস্ত ইচ্ছার পূরণ সম্ভব হয়নি। কারোর যতই অর্থ প্রাপ্তি হোক, যতই সম্পদলাভ হোক ; সে যতই বৈভবসম্পন্ন হোক, কিংবা তার যতই ভোগপ্রাপ্তি হোক, এমন কী সে যদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেরও অধিকারী হয়ে যায়, তাতেও তার সকল কামনা বা ইচ্ছার পূরণ হতে পারে না, বাকী কিছু থাকবেই। অপরদিকে 'আবশ্যকতা' পূর্ণই হয়ে যায়, দূরীভূত হয় না। কোন বস্তুর জন্য ইচ্ছা বা তার প্রতি আসক্তি না থাকলে আবশ্যকতা নিঃসন্দেহে পূর্ণ হয়ে যাবে।

মানুষের হলো পরমাত্মাতত্ত্বের আবশ্যকতা। এই আবশ্যকতাকে কখনো ভুলতে নেই, সর্বদা জাগ্রত রাখতে হয়। যদি নিদ্রা আসে তো আসুক, কিন্তু নিজের দিক থেকে যেন আবশ্যকতার বিস্মরণ কখনো না হয়। যেন ভগবৎ-প্রাপ্তি হয়, তাঁর প্রতি অনুরাগ আসে—এইরকম আগ্রহ সারাদিন অষ্টপ্রহর যদি কেউ জাগ্রত রাখে তো তার উদ্দেশ্যসাধিত হয়ে যাবে। ওই সময়ের মাঝে যদি অন্য ইচ্ছাও হতে থাকে, তাহলে আরও বেশি সময় লাগবে। অন্য কোন ইচ্ছা জাগলেই

মুখ ঘুরিয়ে, মাথা ঘুরিয়ে মনে করতে হবে 'না-না আমার কোন ইচ্ছা নেই'। যদি সত্যিই অন্য কোন ইচ্ছা না থাকে তাহলে সাধনার পূর্তিতে অষ্টপ্রহরও (২৪ ঘন্টাও) লাগবে না।

পরমাত্মাপ্রাপ্তি কঠিন নয়। পরমাত্মা কোথায় নেই ? কোন কালে নেই ? কিসে নেই ? প্রকৃতপক্ষে এমন কোন বস্তুর তথা কোন সময়ের কথা বলাই যায় না, কিংবা কোন দেশ বা স্থানের কথাও বলা যায় না, কোন ব্যক্তি অথবা কোনরকম অবস্থা বা পরিস্থিতির কথা বলা যায় না, যার মধ্যে পরমাত্মা নেই। বস্তুত মানুষের আগ্রহতেই অভাব, অন্য কিছুতে নয়। 'কী করে পরমাত্মাপ্রাপ্তি হবে ?'—কেবল এই একটি ইচ্ছারই প্রয়োজন ; 'তিনি কেমন' এটি ভাবার দরকার নেই। কেবল এই প্রাপ্তির আবশ্যকতার বিস্মরণ যেন কখনো না হয়। তাঁর প্রতি একান্ত আগ্রহী, একনিষ্ঠ ব্যাকুল হতে তো সময় লাগবে, কিন্তু পরমাত্মাপ্রাপ্তিতে সময় লাগে না। এমন সাধককে লোকে উন্মাদ বলুক বা যাই বলুক, ওসব তার গ্রাহ্যই করা উচিত নয়। কেবল এই একটি ইচ্ছাই যদি তীব্রভাবে থাকে তো অন্য সব ইচ্ছাই দূর হয়ে যাবে। অন্য সব ইচ্ছা চলে গেলেই এই একক ইচ্ছার পূরণ ঘটবে।

গীতায় ভগবান বলেছেন—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

(৮।১৪)

'হে পৃথানন্দন ! অনন্য চিত্তে যে মানুষ নিত্য নিরন্তর আমার স্মরণ করে, আমার প্রতি নিত্য যুক্ত সেই যোগীর পক্ষে আমি সুলভ।'

'**অনন্যচেতাঃ**' অর্থাৎ এক পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কোন কিছুর জন্য আগ্রহ নেই ; বাঁচার ইচ্ছাও নেই, মৃত্যুরও নেই ; সুখের ইচ্ছা নেই, দুঃখেরও ইচ্ছা নেই। '**সততম্**' অর্থাৎ ভোরে নিদ্রাভঙ্গ থেকে রাত্রে নিদ্রারম্ভ পর্যন্ত প্রভুকে স্মরণ করে এবং '**নিত্যশঃ**' অর্থাৎ বর্তমান সময় থেকে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তাঁকে স্মরণ করে। এইরকম '**অনন্যচেতাঃ**',

'সততম্' ও **'নিত্যশঃ'**—এই তিনটি থাকলে ভগবান সুলভ হয়ে যান। অর্থাৎ **আবশ্যকতা যেন একটিই থাকে, একটিই ক্ষুধা থাকে, একটি ব্যাপারেই সদাজাগ্রত ভাব থাকে যে, ভগবানকে কী করে লাভ করা যায় !** যেখানে শুধু একটিই আগ্রহ বা বৃত্তি সেখানে তার প্রাপ্তিও অবিলম্বে ঘটে। কিন্তু দ্বিতীয় বৃত্তি থাকলেই অন্তরায় সৃষ্টি হবে। একটি বৃত্তিতেই থাকা কোন কঠিন ব্যাপারও নয়। কারণ এক পরমাত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু তো থাকতেই পারে না, তাহলে আর তাতে (অন্য বস্তুআদিতে) আসক্তিই বা থাকবে কী করে ? বৃত্তিটা যাবে কোন দিকে ? এমন কোন বস্তু নেই যার মধ্যে এমন শক্তি আছে যে সেটি সর্বত্র বা সর্বদা থাকতে পারে, কিংবা সর্ববস্তুতে ও সর্ব ব্যক্তিতে বা সকল অবস্থায়, সকল পরিস্থিতিতে থাকতে পারে। কিন্তু কোন স্থান, কাল, বস্তু, ব্যক্তি বা পরিস্থিতিতেই পরমাত্মা অবিদ্যমান নয়। পরমাত্মা বিনা কোন কিছু নেই-ই।

তিনি সর্বত্র বিদ্যমান, এমন কোন ক্ষেত্রই নেই যাতে তিনি নেই ; সেই তাঁকে প্রাপ্তিতে দেরির কারণটা হলো, প্রকৃতপক্ষে মানুষ তাঁকে পেতে চায় না। পাপের জন্য যে তাকে লাভ করা যাচ্ছে না, তা নয়। যদি পাপ কারণ হত, তাহলে তো পাপই বলবান প্রতিপন্ন হত, পরমাত্মা হতেন দুর্বল। কিন্তু তা সম্ভব হতেই পারে না। মানুষের যে নীচ বৃত্তি বা কার্য তারই নাম হলো পাপ। পাপ কখনোই স্থায়ী হতে পারে না। সৎ সঙ্গের প্রভাবে, নাম-জপে তথা গঙ্গাস্নানে পাপ বিদূরিত হয়ে যায়। যত বড় পাপই হোক না কেন, তার মধ্যে স্থায়িত্ব পাওয়ার কোন শক্তিই নেই। বস্তুত পাপের কোন অস্তিত্ব নেই। অস্তিত্ব আছে একমাত্র পরমাত্মারই। পরমাত্মা পাপেও আছেন, পুণ্যেও আছেন ; ভালোতেও আছেন, মন্দতেও আছেন ; পবিত্রেও আছেন, অপবিত্রেও আছেন। একজন আমাকে বলেছিল, 'তোমার ভগবান তো নরকে আছে।' আমি বলেছিলাম, 'আমার ভগবান তো সর্বত্র বিদ্যমান ; তিনি স্বর্গেও আছেন আবার নরকেও আছেন। তোমার পূর্বপুরুষ কেউ নিশ্চয় নরকে গেছিল,

তাই সেখানে তাঁকে দেখে তোমায় খবর দিয়েছে।' প্রকৃতপক্ষে ভগবান বিনা কোন স্থান হতেই পারে না। তিনি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। শুধুমাত্র তাঁকে পাওয়ার ইচ্ছা হলেই অর্থাৎ দ্বিতীয় কোন ইচ্ছা যদি না থাকে তাহলে দুই একদিন সময় লাগুক বা না লাগুক, অবশ্যই ভগবদ্প্রাপ্তি হবে। ভগবান ব্যতীত ধন-সম্পত্তি, নাম-যশ, সমাদর-সম্মান, প্রশংসা বা অন্য কোন কিছুই যদি না চাই তাহলে ভগবদ্প্রাপ্তি অবশ্যই হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। **কীকরে পরমাত্মাকে পাওয়া যায় ?—এই ভাবকে যদি সদাসর্বদা জাগ্রত রাখা যায়, তাহলে পরমাত্মা আর কী করে লুকিয়ে থাকবেন ?**

ক্ষুধার উদ্রেক হলে ভোজন করো, তৃষ্ণা হলে জল পান করো, নিদ্রা এলে শয়ন করো। কৃচ্ছ্রতা কোরো না। কিন্তু ভোজনে আস্বাদন সুখ গ্রহণ কোরো না, তৃষ্ণা মেটানোয় সুখ পেতে চেয়ো না, সুখ লাভের জন্য শয়ন কোরো না। রোগ হলে যেমন ওষুধ খেতে হয়, সেই ভাব নিয়ে ক্ষুধায় অন্নগ্রহণ করো। ওষুধ খেতে ভালো লাগবে বলে আমরা ওষুধ খাই না, কিংবা ইচ্ছা বা রুচির বশেও আমরা ওষুধ খাই না। ইচ্ছা থাকা চাই শুধু পরমাত্মাপ্রাপ্তির জন্যই। এর থেকে সুগম সাধন আর কী হতে পারে ? দ্বিতীয় ইচ্ছা সঙ্গে থাকাটাই হলো বাধা। মানুষ যেমনই হোক, পাপী বা মূর্খ যাই হোক, সে অবশ্যই পরমাত্মাপ্রাপ্তির অধিকারী। **পরমাত্মাপ্রাপ্তির জন্য কেউই অনধিকারী বা অপাত্র নয়।** শুধু তার জন্য চাই একান্ত আগ্রহ বা ইচ্ছা। দ্বিতীয় ইচ্ছা থাকলেই তা হবে বাধক। যদি ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও নিদ্রা বিরক্ত না করে তাহলে, ভোজন, জলপান ও শয়নেরও প্রয়োজন নেই। খাদ্য, জল পান কিংবা শয়নের দ্বারা কি কেউ চিরজীবি হয় ? অন্নভোজন, জল-পান, নিদ্রা-গ্রহণ করলেও মানুষকে মরতে হয়। বাঁচার শক্তি অন্নে বা জলে কিংবা নিদ্রায় নেই। কোন বস্তুতেই বাঁচিয়ে রাখার শক্তি নেই। খেতে না পেলে মানুষ মারা যায় বটে, কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণার পূরণ হলেও মানুষকে মরতে হয়। মৃত্যু তো একদিন হবেই, তাহলে আর অধিক ক্ষতি কী হবে ? যা হবার তাই হয়। কিন্তু আমি কাউকে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরতে বলছি না। কারণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায়

কাতর থাকলে মনের অবস্থা ঠিক থাকে না। তাই ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণে অন্ন-জল নিতে হবে, নিদ্রা এলে শয়ন করতে হবে, কিন্তু 'আবশ্যকতা'টা কখনো ভুললে চলবে না, সদাসর্বদা তা খেয়াল রাখতে হবে। পরমাত্মাপ্রাপ্তিতে কত সময় লাগবে ?—এটি আমাদেরই অধীনে, সে এক ঘন্টায় প্রাপ্ত হোক বা বহুদিন-মাস-বছর নিয়েই হোক। যতো তফাৎ আমাদের আকাঙ্ক্ষার তীব্রতাতেই, পরমাত্মার সঙ্গে মিলনে কোন তফাৎ বা তারতম্য নেই। ভগবান বলেছেন—

সনমুখ হোই জীব মোহি জবহিঁ। জন্ম কোটি অঘ নাসহিঁ তবহীঁ॥

(শ্রীরামচরিতমানস, সুন্দরকাণ্ড ৪৪।১)

ভগবদ্‌মুখী হলেই তো তৎক্ষণাৎ কোটি জন্মের পাপ নষ্ট হয়ে যায়। কোন পাপ, দুরাচার বা দোষের এমন ক্ষমতা নেই যে ভগবানকে দূরে রাখতে পারে ! **ভগবানকে সরিয়ে রাখার ক্ষমতা কারোরই নেই**। যদি কেউ ভগবানের দর্শনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে তাহলে এমন (দুর্বল) ভগবান আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কী ভালটা করবেন ! এমন ভগবান আমাদের কোন কাজে লাগবেন, যিনি অন্যের দ্বারা রুদ্ধ হয়ে যান ? তাই আবশ্যকতা হলো শুধু সেই একেরই জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষিত হওয়া। সাধকের পক্ষে সাবধান থাকা প্রয়োজন যে এই আকাঙ্ক্ষার যেন কখনো বিস্মরণ না ঘটে। তাহলে আর ভগবদ্-প্রাপ্তিতে কোন কাঠিন্য তথা বিলম্বই থাকবে না।

~~○~~

সাধকগণের উপযোগী কয়েকটি অমূল্য কথা

যে সাধক কর্মযোগের পথে এগোতে চান, প্রথমেই তাঁকে মনে করে নিতে হবে, 'আমি যোগী'। যিনি জ্ঞানযোগের পথে অগ্রসর হতে চান, তাঁকে প্রথমেই ধারণা করে নিতে হবে, 'আমি জিজ্ঞাসু'। ভক্তিযোগের পথে চলতে চান যিনি, প্রথম থেকেই তাঁকে ভেবে নিতে হবে, 'আমি ভক্ত'। অর্থাৎ সাধককে যোগী কিংবা জিজ্ঞাসু অথবা ভক্ত হয়েই সাধনা করতে হবে।

যে যোগী হয়ে সাধনা করে, তার যতকাল যোগ (সমতা) প্রাপ্তি না হয়, ততকাল তুষ্ট থাকা উচিত নয়। 'যোগ' হলো 'সমতা'র নামান্তর— **'সমত্বং যোগ উচ্যতে'** (গীতা ২।৪৮)। অনুরাগ-বিদ্বেষ, হর্ষ-শোক আদি দ্বন্দ্ব যোগী হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে। সুতরাং সাধকের উদ্দেশ্য হওয়া চাই অনুরাগ-বিদ্বেষ দূরীকরণ। যে কোন কর্মই দুটি উদ্দেশ্যে সাধিত হয়—হয় ফল লাভের জন্য, নয়তো ফলত্যাগের জন্য। ফলপ্রাপ্তির জন্য যে ব্যক্তি কর্ম করে, সে হলো 'কর্মী' আর ফল ত্যাগের জন্য যে কর্ম করে, সে হলো 'কর্মযোগী'। এই কারণে, কর্মযোগের সাধককে প্রথম থেকে ধারণা করে নিতে হয় যে, 'আমি যোগী, সুতরাং ফল প্রাপ্তির জন্য কর্ম করা আমার উদ্দেশ্য নয়।' এইভাবে ফলের আসক্তি ত্যাগপূর্বক তার কর্তব্য-কর্ম করে যাওয়া উচিত।[১] তার সামনে অনুকূল বা প্রতিকূল যেমন পরিস্থিতিই আসুক না কেন, সদুপযোগে চলা তার কর্তব্য, কিন্তু ভোগ করা নয়। সুখী-দুঃখী, সম্মত-অসম্মত হওয়া হলো পরিস্থিতিগত ভোগ। অনুকূল পরিস্থিতিতে অন্যের সেবা করা এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সুখের ইচ্ছাকে ত্যাগ করাই হলো তার 'সদুপযোগ'। সদুপযোগ করলে অনুকূল ও

---

[১]তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥ (গীতা ৩।১৯)

প্রতিকূল—উভয় পরিস্থিতিতেই 'অনুরাগ-বিদ্বেষ' দূরীকরণের সহায়ক হয়ে যায়।

কর্মমাত্রেরই সম্বন্ধ 'পর' (অন্য)-এর সাথে, 'স্ব' (আত্ম-স্বরূপ)-এর সাথে নয়। কারণ 'স্ব' অর্থাৎ স্বরূপের কখনো কোন অভাব হয় না। অভাব না থাকায় স্বরূপের কোন কিছুর জন্য চাহিদাও নেই। যখন কিছুই চাওয়ার নেই, তাহলে নিজের জন্য কোন কর্ম করার ব্যাপারই তো আসে না। দ্বিতীয় কথা, যে সকল করণ দ্বারা কর্ম করা হয়, সেইগুলি হলো প্রকৃতির। প্রকৃতির সাথে স্বরূপের কোন সম্বন্ধ না থাকায় স্বরূপের নিজের জন্য কোন কিছু করার প্রশ্নই উঠতে পারে না। এই কারণে যে মানুষ নিজের জন্য কর্ম করে, সে কর্মের দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হয়—**'যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ'** (গীতা ৩।৯)। কিন্তু যে নিজের জন্য কিছু না করে অপরের জন্যই সকল কর্ম করে সে কর্ম-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়—**'যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে'** (গীতা ৪।২৩)। নিষ্কামভাবসহ অপরের জন্য কর্ম করার নাম 'যজ্ঞার্থ কর্ম'। যজ্ঞার্থ কর্মকারী পরিণামে যজ্ঞের শেষরূপে 'যোগ' লাভ করে—

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ। (গীতা ৩।১৩)
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্। (গীতা ৪।৩১)

আমি যোগী, আমি জিজ্ঞাসু, আমি ভক্ত, আমি সাধক—এই পরিচয় সাধকের স্থূলশরীরের নয়, বস্তুত তা হলো ভাবশরীরের। স্থূলশরীর যোগী, জিজ্ঞাসু বা ভক্ত হয় না। যদি সাধকের মধ্যে প্রথমেই এই ভাব এসে যায় যে 'আমি সংসারী নই, আমি তো সাধক' তাহলে তার সাধন খুব গতিশীল হবে। যেমন, কোন মানুষ তার বিবাহের সময় 'বরের' সাজ নিলে তার চালচলনই পাল্টে যায় ; তার অহংবোধে 'আমি তো বর'—এই ভাবটি প্রোথিত হয়ে যায়, সেইরকমই সাধকের অহংবোধেও 'আমি সাধক'—এই ভাবটি আসা চাই। **যদি তার অহংবোধে 'আমি সংসারী' এই ভাবটিই থেকে যায় তো সংসারের কাজ**

খুব ভালোভাবে হবে বটে[১]**, কিন্তু সাধন ভালো হবে না।** অহংবোধে যে ভাব এসে যায়, তদনুযায়ী কর্ম করা খুব সুগম হয়ে যায়। এইজন্য সাধকের অহংভাবকে রূপান্তরিত করা খুবই আবশ্যক। যে সেবাকারী, জিজ্ঞাসু বা ভক্ত হয়ে সাধনা করে না, তার সাধনা নিরর্থক হয় না বটে কিন্তু তার সিদ্ধি লাভ অনতিবিলম্বে হয় না। অতএব 'আমি সাধক', 'আমি কর্মযোগী', 'আমি জ্ঞানযোগী' অথবা 'আমি ভক্তিযোগী'— এই রকম মনোভাব নিয়ে সাধনা করা প্রয়োজন।

কর্মযোগের অপর এক নাম হলো 'সেবা'। এইজন্য কর্মযোগের সাধকের অহংবোধে, 'আমি সেবক' এইরকম ভাব রাখা উচিত। 'আমি সেবক'— এই অহংভাবের দরুণ তার মনে জাগবে যে, 'আমার কাজ হলো সেবা করা, কোন কিছুর কামনা করা আমার কাজ নয়।' সাধক মাত্রেরই জন্য একটা বিশেষ কথা স্মরণে রাখা কর্তব্য যে, 'জগৎ থেকে আমার কিছু নেওয়ার নেই। আমার স্বার্থপর, ভোগী হওয়া চলবে না। জগতের সুখ পাওয়ায় জন্য আমার থাকা নয়।' **যে সুখ চায় সে সেবক নয়।**[২] কোন সাধক—যে মার্গেরই পথিক হোক না কেন, তাকে প্রথম থেকেই সুখকে জলাঞ্জলি দিতে হবে। সাধকের কাজ সাধনা করা, সুখ ভোগ করা নয়। **যে ভোগী হয়, সে সাধক হতে পারে না। ভোগী রোগী হয়, যোগী হয় না।** ভোগীকে অনিবার্যভাবে দুঃখ পেতে হয়। সে কখনো দুঃখ থেকে রেহাই পেতে পারে না।

সেই সেবক, যে সর্বদাই সেবা করে। সে ভোজন করলে সেটিও সেবা, তার স্নান করা, বস্ত্রধৌত করা, অর্থকরী কর্ম করা পর্যন্ত সেবা ; সে যে কাজই করুক না কেন সবই সেবাভাব সহ করে। কিন্তু এটি তখনই সম্ভব যখন তার মধ্যে দৃঢ়ভাবে এই কথাটি থাকবে যে, 'আমি সেবক'।

---

[১]জাগতিক কর্ম যতো ভালোই হোক না কেন, পরিণামে তা খারাপই হয়।

[২]সেবক সুখ চহ মান ভিখারী। ব্যসনী ধন সুখ গতি বিভিচারী॥
লোভী জসু চহ চার গুমানী। নভ দুহি দূধ চহত এ প্রানী॥
(শ্রীরামচরিতমানস, অরণ্যকাণ্ড ১৭।৮)

যদি তার মনে 'আমি মানুষ' বা 'আমি ব্রাহ্মণ', 'আমি গৃহস্থ', 'আমি সাধু' ইত্যাদি ভাবই মুখ্যভাবে থাকে আর 'আমি সাধক' এই ভাবটি গৌণভাবে থাকে, তাহলে তার কর্মযোগ ভালভাবে হবে না। কর্মযোগে 'আমি সেবক' এই ভাবটিই মনে মুখ্য থাকে আর 'আমি মানুষ' ইত্যাদি ভাব থাকে গৌণভাবে। এইরকমই **'আমি ভক্ত', 'আমি জিজ্ঞাসু' অথবা 'আমি সাধক'—এই ভাবকে মুখ্য রাখতে হবে**। যেমন ব্রাহ্মণের চেতনায়, 'আমি ব্রাহ্মণ' এই (ব্রাহ্মণ-পরিচায়ক) ভাব সর্বদা জাগ্রত থাকে, তেমনই সাধকের চেতনায় 'আমি সাধক' এই ভাব সর্বদা জাগ্রত রাখা কর্তব্য। এই রকম হলে তবেই মানুষ-ভাব, শরীর-ভাব দূর হয়ে যাবে। 'আমি মানুষ'—এটি হলো পাঞ্চভৌতিক মনুষ্যশরীরগত পরিচয় আর 'আমি সাধক' (সেবক, জিজ্ঞাসু বা ভক্ত)—এটি হলো ভাবশরীরগত পরিচয়। **ভাবশরীরের প্রাধান্যে সাধনা নিরন্তর হয়ে যায়।**

কর্মযোগী স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—তিনটি শরীরের সেবা করে। শরীরকে ভোগী, অলস, অকর্মণ্য হতে না দেওয়াই হলো 'স্থূলশরীরে'র সেবা। বৈষয়িক চিন্তা না করা, সকলের সুখ ও হিতের চিন্তা করা হলো 'সূক্ষ্মশরীরে'র সেবা। সমাধির প্রযত্ন, নিজের সিদ্ধান্তে দৃঢ় অচল থাকা, নিজের কল্যাণে নিশ্চয়পূর্বক অবিচলিত থাকা হলো 'কারণশরীরে'র সেবা। স্থূলশরীর দ্বারা সম্ভাব্য ক্রিয়া, সূক্ষ্মশরীর দ্বারা সম্ভাব্য মনন এবং কারণ শরীর দ্বারা সম্ভাব্য-স্থিরতা—এই তিনটিকেই 'নিজের' ও 'নিজের জন্য' বলে মনে না করাই হলো এগুলির সেবা। কারণ স্থূলশরীরের স্থূলজগতের সঙ্গে, সূক্ষ্মশরীরের সূক্ষ্ম জগতের সঙ্গে এবং কারণ শরীরের কারণ জগতের সঙ্গে ঐক্য আছে। সেইজন্য শরীরকে জগৎ থেকে পৃথক মনে করা খুবই বড় ভুল। **শরীর ও জগৎকে 'নিজের' ও 'নিজের জন্য' বলে মনে করা খুবই ক্ষতিকারক, ওই ভাবে মনে করলে কেউ সাধক হতে পারে না, সারাজীবন ধরে চেষ্টা করলেও পারে না।** এইজন্য কর্মযোগীর মনে রাখা আবশ্যক যে, সে জগতের মানুষ এবং জগতের সেবার জন্যই আছে। এই বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, 'টাকার কাছেই

টাকা আসে' কারণ যার কাছে টাকা থাকে, সে ওই টাকা দিয়ে কোন নতুন কাজ-কর্ম শুরু করে এবং আরও টাকা আয় করে। কোন এক ব্যক্তি 'টাকার কাছেই টাকা আসে' এই কথা শুনে হাতে টাকা নিয়ে আন্দোলিত করতে করতে বাজারে ঘুরছিল। একসময় তার হাতের মুদ্রাটা পথে একটি দোকানের মুদ্রাভাণ্ডের মধ্যে ছিটকে চলে যায়। তখন লোকটি দোকানদারকে বলে, 'এটা কী হলো ?' টাকার কাছেই তো টাকার আসার কথা ! তখন দোকানদার বলে 'ঠিকই তো ! টাকার কাছেই তো টাকা এসেছে। তোমার কাছে ছিল অল্প টাকা আর এই ভাণ্ডে আছে বেশি টাকা। বেশি টাকার কাছে কম টাকা আসবে, না কম টাকার কাছে বেশি টাকা যাবে ? ছোটরই তো বড়র কাছে যাবার কথা।' এই রকমই, জগৎ শরীরের জন্য নয় বস্তুত শরীরই জগতের জন্য। জগৎ আমাদের জন্য নয়, প্রকৃতপক্ষে আমরাই জগতের জন্য, এইজন্য সাধকের মধ্যে এইভাব থাকে যে 'আমি যেন জগতের কাজে লাগতে পারি।'

সাধকের প্রয়োজন হলো অহং ভাবকে শুদ্ধ করে নেওয়া , অহংভাবকে ত্যাগ করে দেওয়া কিংবা অহং ভাবকে রূপান্তরিত করে ফেলা। কর্মযোগী অহংভাবকে শুদ্ধ করে নেয়, জ্ঞানযোগী অহং-ভাবকে ত্যাগ করে আর ভক্তিযোগী অহংভাবকে রূপান্তরিত করে। এইজন্য কর্তৃত্বাভিমান সহকারে মানুষ কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের সাধনা করতে পারে কিন্তু কর্তৃত্বাভিমান থাকলে জ্ঞানযোগের সাধনা অসম্ভব। সে জ্ঞানের কথা যতোই শিখে নিক, সিদ্ধিলাভ হবে না। কর্মযোগ ও ভক্তিযোগে প্রথমে কামনা দূর হয় তারপর অহংকার দূর হয়। কিন্তু জ্ঞানযোগে আগে অহংকার দূর হয়, তারপর স্বাভাবিকভাবেই কামনাও দূর হয়ে যায়। অর্থাৎ কর্মযোগে ও ভক্তিযোগে সাধকের অহং থাকলেও সে এগোতে পারে, কিন্তু জ্ঞানযোগে অহংভাব নিয়ে এগোনোই যায় না। এইজন্য অহংকার-সহ জ্ঞানযোগে অগ্রসর হওয়া অতীব কষ্টকর, **'অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে'** (গীতা ১২।৫) এবং অহংকার দূর হলে অগ্রসর হওয়া সুখকর হয়ে যায়—**'সুখেন**

ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে' (গীতা ৬।২৮)। কিন্তু **যে ব্যক্তি ভোগে মত্ত থাকে, সুখ ভোগ, লোভ, অর্থসংগ্রহ এবং বিলাস ক্রিয়া করেই চলে তার পক্ষে কোন যোগই সম্ভব নয়**। সে তো সাধকই হতে পারে না, সিদ্ধ হওয়া তো বহু দূরের কথা।

ভক্ত আমিত্ব (অহংকার) কে ত্যাগ করে না, কিন্তু রূপান্তরিত করে। 'আমিত্ব'কে রূপান্তরিত করা খুব সহজ ব্যাপার। যেমন নারীর বিবাহ হলে তার 'আমি কুমারী' এই অহংভাব সহজেই রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই রকমই ভক্তের আমিত্বও রূপান্তরিত হয়ে যায় এইভাবে—'আমি জগতের নই, আমি তো ভগবানের।' আমিত্বকে রূপান্তরিত করা যেমন সহজ তেমনই শ্রেষ্ঠও বটে। আমিত্ব (অহংকারে)এর রূপান্তরে সাধনার তন্ময়তায় স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিকভাবেই সাধকের সিদ্ধিলাভ হয়ে যায়।

সর্বপ্রথমেই সাধকের এই কথাটি মনে রাখতে হবে যে, বিলাস করা, ভোগ করা, শরীরের পরিচর্যা করা তার কাজ নয়। শরীর-নির্বাহের জন্য ব্যবস্থা তো ভগবান আগে থেকেই করে রেখেছেন। ভগবানের দিক থেকে তো নির্বাহের ব্যবস্থা হয়ে রয়েছে, কিন্তু ভোগ্য আস্বাদন বা তা সংগ্রহ করানো কিংবা লাখোপতি, কোটিপতি করে দেওয়ার ব্যবস্থা তো নেই। তাঁর ব্যবস্থা এমন যে, সন্তানের আগমনের পূর্বেই তার জন্য মাতৃস্তনে দুগ্ধের উৎপত্তি হয়। ভগবান জীবন নির্বাহের ব্যবস্থা এইভাবেই করে রেখেছেন, তাহলে সাধনায় গাফিলতি কেন ? **যদিও মানুষমাত্রেরই সাধন ভজন করার দায়িত্ব আছে, তথাপি বিশেষভাবে সেই দায়িত্ব আছে বৃদ্ধ, ভর্তাহীনা ও সাধুগণের ওপর**। সুখভোগ করা, আরাম বিলাস করা, সুবিধাবাদী হওয়া—এইসবের জন্য তো আর মনুষ্যশরীর নয়।

এতি তন কর ফল বিষয় ন ভাঈ। স্বর্গউ স্বল্প অন্ত দুখদাঈ।
নর তনু পাই বিষয়ঁ মন দেহীঁ। পলটি সুধা তে সঠ বিষ লেহীঁ॥

(শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৪৪।১)

এই কারণে, যে সুখ-আরাম, যশ-মান চায় সে সাধক হতে পারে না। সে তো ভোগীই। মান-যশ চাওয়াও ভোগ, কারণ মান হয় শরীরের আর যশ হয় নামের,—কোনটাই স্বরূপের নয়। মানুষ চায় যে তার মৃত্যুর

পরও সে যশস্বী হয়ে থাকবে। তাই সে তার জীবন নিয়ে দু-চারটি গ্রন্থ প্রকাশ চায় কিংবা তার নামের স্মারক রূপে ভবন নির্মাণ চায়, যাতে লোকে তাকে মনে রাখে। এই ব্যাপারটাকে মাড়ওয়ারি ভাষায় **'গীতড়া আর ভীতড়া'** বলা হয়। কিন্তু সাধকের উচিত মান-যশ, নাম-কীর্তি ইত্যাদি থেকে দূরে সরে থাকা—**'বিচ্ছূ-সী বড়াঈ জাকে নাগিনী-সী নারী হৈ'**। তার তো পরমাত্মাকে পেতে হবে। স্বর্গ আদি উচ্চলোকে গমনও সাধকের কাজ নয়—**'স্বর্গউ স্বল্প অন্ত দুখদাঈ'**। ভগবান বলেছেন—

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা মষ্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্ বিনান্যৎ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৪।১৪)

'আমার প্রতি নিজেকে অর্পিতকারী ভক্ত আমাকে ছেড়ে ব্রহ্মার পদ, ইন্দ্রের পদ, সমগ্র পৃথিবীর রাজত্ব, পাতালাদি লোকের রাজত্ব, যোগের সমস্ত সিদ্ধি, এমনকি মোক্ষও চায় না।'

অনেক মানুষের স্বভাব এমন হয় যে তারা যেখানে সম্মান হবে, শুধু সেখানেই সেবা করে। নাম-যশ-প্রশংসা ব্যতীত তারা কাজই করতে পারে না। কোন ভালো কাজ করলে তারা কাজটা নিজেরা করেছে বলে বেড়ায়, কিন্তু কাজটায় যদি ক্রটি হয় তো তারা অন্যের ওপর দোষারোপ করে, এইরকম চিত্তবৃত্তির মানুষের কল্যাণ হবে কী করে ? **ভালো কাজগুলোই আমি করেছি, এই ব্যক্ত ভাবটিকে বলে 'কৈকেয়ীবৃত্তি' আর 'ভালো কাজগুলো অপরে করেছে'—এই ব্যক্ত ভাবটিকে 'রামবৃত্তি' বলে।** কৈকেয়ী বলেছিলেন—

তাত বাত মৈঁ সকল সঁবারী। ভৈ মন্থরা সহায় বিচারী॥
কছুক কাজ বিধি বীচ বিগারেউ। ভূপতি সুরপতি পুর পগু ধারেউ॥

(শ্রীরামচরিতমানস, অযোধ্যাকাণ্ড ১৬০।১)

আর শ্রীরাম বলেছিলেন—

গুর বসিষ্ট কুলপূজ্য হমারে। ইন্হ কী কৃপাঁ দনুজ রন মারে॥
এ সব সখা সুনহু মুনি মেরে। ভএ সমর সাগর কহঁ বেরে॥

মম হিত লাগি জন্ম ইন্‌হ হারে। ভরতহু তে মোহি অধিক পিআরে॥

(শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৮।৩-৪)

সুতরাং সম্মান-খ্যাতি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়ার আগ্রহ নিয়ে সাধকের কোন কাজ করা উচিত নয়।

যে পন্থাই সাধক গ্রহণ করুক না কেন তাতে তার দৃঢ় ভাবে লগ্ন থাকা কর্তব্য। সুখ বা দুঃখ যাই আসুক কিংবা প্রশংসা বা নিন্দা যেটাই হোক, তাতে সাধকের লক্ষই করা উচিত নয়। **যা কিছু কষ্ট আসে, বিপরীত পরিস্থিতি ঘটে, সে সবই কেবল আমাদের উন্নতির জন্যই হয়ে থাকে।** এ ব্যাপারে একটা রহস্যের দিক হলো এই যে, যখন কারোর সাধনা ঠিকমতো চলে এবং ওইভাবে চলার পথে কিছু সুখকর অভিজ্ঞতা হওয়ায় তার মনে একটা অভিমান এসে যায় যে, 'আমি উন্নত সাধক হয়ে গেছি' তখন ভগবান বিপরীত পরিস্থিতি ঘটিয়ে দেন। অনেক সময়ই অনুকূল-প্রতিকূল ঘটনার মাধ্যমে ভগবান আমাদের উদ্দীপিত করেন তথা রক্ষাও করেন।

আমার কিছু নেওয়ার নেই, বস্তুত শুধু দেওয়ারই আছে—এই রকম বিবেচনা করে চললে মানুষ সাধক হয়ে যায়। যদি সাধকটি 'সেবক' হয় তো সেবা করতে করতে তার সেবক-ভাবের অভিমান দূর হয়ে যাবে অর্থাৎ সেবক আর থাকবে না, থাকবে শুধু সেবা এবং সে সেবারূপে সেব্যের সাথে এক হয়ে যাবে। বস্তুত তার পরমাত্মা-প্রাপ্তি হয়ে যাবে। এইভাবেই, সাধকটি যদি 'জিজ্ঞাসু' হয় তাহলে তার জিজ্ঞাসুরূপ অভিমান দূর হয়ে গিয়ে থাকবে কেবল জিজ্ঞাসা। শুধুমাত্র জিজ্ঞাসা বর্তমান থাকলে জিজ্ঞাসার পূরণও হয়ে যাবে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান জাগ্রত হবে। একইভাবে, সাধকটি ভক্ত হলে তার মধ্যে ভক্তাভিমান থাকবে না এবং সে ভক্তিরূপ হয়ে যাবে অর্থাৎ তার দ্বারা প্রতিটি ক্রিয়াই (ভগবানের জন্য) ভক্তিময় হবে। ভক্তিরূপ হয়ে সেই সাধক ভগবানের সাযুজ্য লাভ করবে।

~~০~~

বিজ্ঞান-সহ জ্ঞান

যতগুলি দর্শনশাস্ত্র আছে, সেগুলির দুটি বিভাগ—ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও ঈশ্বর-অবিশ্বাসী। ঈশ্বরকে বরণকারী শাস্ত্রসমূহের মধ্যে গীতা হলো প্রধান। গীতার প্রকৃত সিদ্ধান্ত হলো—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'** অর্থাৎ, সমস্ত কিছু পরমাত্মাই। যে সকল দার্শনিক নিজেদের দর্শনে (অনুভবে), নিজেদের মতবাদে পূর্ণভাবে সন্তোষ লাভ করেছেন, তাঁরা তো সেখানেই থেমে গেছেন, কিন্তু যাঁরা নিজেদের শুধু দার্শনিক মতে সন্তুষ্ট হয়ে থাকতে পারেননি, তাঁরাই **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** বোধের অনুভব করেছেন। **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** অনুভব হলে, দার্শনিকগণ তথা তাঁদের দর্শনের পারস্পরিক মতভেদের মীমাংসা হয়ে যায় এবং সবই শেষে এক হয়ে যায়।

শাস্ত্রে জগৎ, জীব ও পরমাত্মা—এই তিনটি প্রসঙ্গেই বিচার-বিবেচনা হয়েছে, কারণ এই তিনটি ছাড়া চতুর্থ কোন বস্তুই নেই। এই তিনটি গীতায় বিভিন্ন নামে উল্লেখিত হয়েছে ; যেমন, 'জগৎ'কে অপরা, ক্ষেত্র, ক্ষর ইত্যাদি নামে ; 'জীব'কে পরা, ক্ষেত্রজ্ঞ, অক্ষর ইত্যাদি নামে এবং 'পরমাত্মা'কে ব্রহ্ম, পুরুষোত্তম ও অন্যান্য নামে। গীতায় অপরা (জগৎ) এবং পরা (জীব)—দুটিকেই ভগবান নিজের প্রকৃতি (স্বভাব বা শক্তি) রূপে পরিচয় দিয়েছেন।[১] যেমন শক্তিমান

---

[১]ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যযেদং ধার্যতে জগৎ॥ (গীতা ৭।৪-৫)

'পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ—এই পঞ্চমহাভূত এবং মন, বুদ্ধি ও অহংকার—এইরকম আমার আট প্রকারের ভেদসম্পন্ন অপরা প্রকৃতি আছে ; আর হে মহাবাহো ! এই অপরা প্রকৃতির থেকে ভিন্ন আমার পরা প্রকৃতিকে জানো, যা জীবরূপে প্রকাশিত তথা যার দ্বারা এই জগৎ ধৃত হয়ে আছে।'

বিনা শক্তির স্বতন্ত্র সত্তা নেই, তেমনই পরমাত্মা বিনা জগৎ এবং জীবেরও কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। **পরমাত্মারই একাংশে জীব আছে এবং জীবেরই একাংশে জগৎ বর্তমান—'যয়েদং ধার্যতে জগৎ'** (গীতা ৭।৫)। এইজন্য গীতায় জগৎ, জীব ও পরমাত্মার বর্ণনার তাৎপর্য ওইগুলির প্রসঙ্গে ভিন্নভাবে ব্যক্ত করার মধ্যে নেই, বস্তুত ওই সমস্তকে এক এবং অভিন্ন ভাবে ব্যক্ত করার মধ্যেই নিহিত।[১]

পরা ও অপরা—এই দুই প্রকৃতির সঙ্গে পরমাত্মার সম্বন্ধ সমান। পরা প্রকৃতির কিন্তু অপরা প্রকৃতির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই, কারণ পরা ও অপরা দুটিরই স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন। পরা নিত্য অপরিবর্তনীয় তথা অবিনশ্বর আর অপরা (শরীর-জগৎ) সর্বদা পরিবর্তনশীল তথা বিনাশশীল। পরা প্রকৃতি পরমাত্মার অংশ হওয়ায় পরমাত্মারই স্বভাব সম্পন্ন অর্থাৎ পরমাত্মা যেমন নিত্য অপরিবর্তনীয় ও অবিনশ্বর স্বভাবের, তেমনই তাঁর অংশ পরা প্রকৃতিও তাই। তাৎপর্য হলো, **জীব পরমাত্মার অবিভাজ্য অংশ এবং শরীর জগতের অবিভাজ্য অংশ**।

জীব তথা পরমাত্মা 'প্রাপ্ত' আছেন আর স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ শরীর তথা জগৎ 'প্রতীতি' মাত্র। 'প্রাপ্ত' হলো 'সৎ-রূপ' আর 'প্রতীতি' অসৎ-রূপ। অসতের তো অস্তিত্বরূপে বিদ্যমানতা নেই আবার সতেরও অনস্তিত্ব বিদ্যমান নয়—**'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'** (গীতা ২।১৬)। অর্থাৎ 'প্রাপ্ত' সত্তা দৃষ্ট হয় না কিন্তু অস্তিত্ব

---

[১]এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥
(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ১।১২)

'নিজেদেরই মধ্যে স্থিত এই ব্রহ্মকেই সর্বদা জানা প্রয়োজন, কারণ এর থেকে অধিক জানার যোগ্য দ্বিতীয় আর কিছুই নেই। ভোক্তা (জীবাত্মা), ভোগ্য (জগৎ) এবং এইগুলির প্রেরক পরমেশ্বরকে জানলে মানুষ সব কিছুই জানতে পারে। এরূপে এই তিনটি ভিন্ন ভাবে পরিচায়িত প্রকাশ ব্রহ্মাই অর্থাৎ জীব, জগৎ ও পরমাত্মা তিনটি অখণ্ড ব্রহ্মেরই রূপ।'

বিরাজমান, আর 'প্রতীতি' দৃষ্ট হয় কিন্তু তার অস্তিত্ব বস্তুত নেই-ই। 'আমি অমুক বর্ণ বা আশ্রমের ব্যক্তি'—এই ভাব হলো প্রতীতি নিয়ে আর 'আমি সাধক' (যোগী, মুমুক্ষু, ভক্ত ইত্যাদি)—এই ভাব হলো 'প্রাপ্ত' কে নিয়ে। যখন মানুষের ভাবে 'প্রতীতির' প্রাধান্য ঘটে, সে সংসারী হয়ে যায়, আর যখন তার মধ্যে 'প্রাপ্ত' প্রাধান্য পায় তখন সে 'সাধক' হয়। এই কারণে সাধকের মধ্যে 'প্রাপ্তে'র মুখ্যতা প্রয়োজন। 'প্রতীতি'তে মুখ্যতা থাকলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ খুব কঠিন ব্যাপার হয়ে যায়। মুক্তি অথবা ভক্তিলাভ 'প্রতীতি'র হয় না, বস্তুত তা হয় প্রাপ্তের (স্বয়ং)। এইজন্য ভগবান গীতায় সপ্তম অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে তাঁর ভক্তরা (অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী এই) চার প্রকারের হয় বলে উল্লেখ করে পরে নবম অধ্যায়ের ত্রিশ থেকে তেত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত বলেছেন যে, দুরাচারী, পাপযোনি, স্ত্রীলোক, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়—এরা সকলেই চার প্রকারের ভক্ত হতে পারে। এই কথাই অন্যভাবে বলা যায় যে, ভগবানের প্রাপ্তি, দুরাচারী, পাপযোনি, স্ত্রীলোক, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এদের কারোরই হয় না, বস্তুত 'ভক্ত' (স্বয়ং)-এরই হয়।[১] (গীতা ৯।৩৩)। এইজন্য **শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির প্রবণতা-সম্পন্ন যে কোন মানুষই ভোগী হতে পারে বটে, কিন্তু যোগী হতে পারে না।**

যা 'প্রাপ্ত' আছে, সেটি 'পরা প্রকৃতি' আর যা 'প্রতীতি' সেটি 'অপরা-প্রকৃতি', পরা ও অপরা দুটি প্রকৃতিই ভগবানের হওয়ায় তা

---

[১]নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ব শূদ্রো
নো বা বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥

'আমি ব্রাহ্মণও নই, ক্ষত্রিয়ও নই, বৈশ্যও নই, শূদ্রও নই ; ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই আবার সন্ন্যাসীও নই, কিন্তু অখণ্ড পরমানন্দময় অমৃতের আধার মহাসাগররূপ গোপীকান্ত শ্যামসুন্দরের পাদপদ্মের দাসের দাসানুদাস আমি।'

ভগবদ্-স্বরূপই—**'সদসচ্চাহমর্জুন'** (গীতা ৯।১৯)। কিন্তু জীব (পরা) ধারণ করে আছে জগৎ (অপরা) কে, অর্থাৎ জগৎকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ববৎ গুরুত্ব দিয়ে নিজের বলে মনে করেছে—**'মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি'**(গীতা ১৫।৭)। এই হলো জীবের মূল ত্রুটি, যার ফলে সে 'জগৎ' (জড়বৎ) হয়ে যায়[১] অর্থাৎ জগতের মতোই সে পরিবর্তনশীল, জন্ম-মরণশীল হয়ে যায়। এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য সাধকের উচিত 'পরা'কে অর্থাৎ নিজেই নিজেকে ভগবানের প্রতি অর্পিত করে দেওয়া এবং 'অপরা' কে অর্থাৎ শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিকে জগতে অর্পিত করে দেওয়া, জগৎ-সংসারের সেবায় নিয়োজিত করা। 'আমি ভগবানের তথা ভগবানের জন্য আছি'— এই ভাবকে স্বীকার করে নেওয়াই হলো নিজেকে ভগবানে অর্পিত করা এবং 'শরীর জগতের জন্য এবং জগৎ শরীরের জন্য'—এইরকম অনুভব করে চলাই হলো শরীরকে জগৎ-সংসারে অর্পিত করা। এইভাবে ভগবানের বস্তু ভগবানকে দিয়ে দিলে তা 'ভক্তিযোগ' হয়ে যায়, জগতের বস্তু জগৎ-সংসারে দিয়ে দিলে তা 'কর্মযোগ' হয়ে যায়, এবং ভগবান ও সংসার থেকে কোন কিছু কামনা না করলে সাধক অসঙ্গ হয়ে যাওয়ায় তা 'জ্ঞানযোগ' হয়ে যায়। এইরকম 'ভক্তিযোগ', 'কর্মযোগ' ও 'জ্ঞানযোগ'—তিনটিই সাধিত হওয়ায় পরা ও অপরার স্বাতন্ত্র্যবোধ দূর হয়ে যায় এবং **'বাসুদেবঃ সর্বম্'**-এর অনুভব হয়ে যায়।

যে নিজের কল্যাণ চায়, সে যদি অপরা (জগৎ)-এর অস্তিত্ব স্বীকার

---

[১]ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ (গীতা ৭।১৩)

এই তিন গুণরূপ ভাবের দ্বারা মোহিত সমগ্র জগৎ (প্রাণীমাত্র) এই গুণসমূহের অতীত অবিনাশী আমাকে জানতে পারে না।

—এই শ্লোকে জীবাত্মার ক্ষেত্রে 'জগৎ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

করে তাহলে তার জন্য 'কর্মযোগ' (ভৌতিক সাধনা) প্রয়োজন ; সে যদি পরা (জীব অর্থাৎ চিৎ)-এর অস্তিত্বকে ধরে চলে তবে তার পক্ষে 'জ্ঞানযোগ' (আধ্যাত্মিক সাধনা) ঠিক ; আবার সে যদি পরমাত্মার অস্তিত্ব মেনে অগ্রসর হয় তবে 'ভক্তিযোগ' (আস্তিক সাধনা) হবে তার যথার্থ পথ। কিন্তু সে যদি কোন অস্তিত্বকেই না মানে তাহলেও তার কল্যাণ হবে। কারণ কোন কিছুর সত্তাকেই না মানায় তার ওপর জগৎ-সংসারের প্রভাব পড়বে না, এবং সে স্বাভাবিকভাবেই নির্বিকল্প স্থিতি লাভ করবে। যে সত্তাকে মানুষ মেনে চলে, তার প্রভাবই মানুষের ওপর পড়ে।

মানুষ জগতের বস্তু জগৎকে দিয়ে দিলে তারপরে সে আর জগৎ থেকে কোন কিছুই কামনা করার অধিকারী থাকে না। এইভাবেই ভগবানের বস্তু ভগবানকে দিয়ে দিলে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই ভগবদ্প্রেম প্রাপ্তি হয়ে যাবে। **প্রেমের থেকে বড় এমন কোন কিছুই নেই, যা আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে পারি।** জগতের বস্তু জগৎকে দিয়ে দেওয়া হলো 'যোগ' এবং জগৎ থেকে কিছু কামনা করা হলো 'ভোগ'। এইরকম, ভগবানের বস্তু ভগবানকে দিয়ে দেওয়া হলো 'যোগ' আর তাঁর থেকে কিছু প্রার্থনা করা হলো 'ভোগ'।

প্রকৃতপক্ষে, মনুষ্যশরীর 'কর্মজন্য' বা 'ভোগজন্য' নয়, বস্তুত তা হলো 'সাধনযোনি' বা 'প্রেমযোনি', কারণ ভগবান মানুষকে প্রেমের জন্যই সৃষ্টি করেছেন—'**একাকী ন রমতে**'। এই কারণে প্রেমানুরাগ একমাত্র মনুষ্যজন্মেই সম্ভব। **সকল প্রজাতির (যোনি) মধ্যে একমাত্র মানুষই এমন, যে ভগবানকে নিজের বলে ধারণা করতে পারে,** ভগবানকে বলতে পারে যে, 'আমি তোমার, তুমি আমার' অথবা 'তুমিই একমাত্র আছো'। কারণ, ভগবান জগৎ সৃষ্টি করেছেন জীবের জন্য, আর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন নিজের জন্য। মানুষের মধ্যে জগৎকে নিজের বলে ধারণা না করার তথা ভগবানকে আপন বলে

ধারণা করার যে যোগ্যতা ও সামর্থ্য আছে, সেও বস্তুত ভগবানেরই প্রদত্ত। ভগবানের দেওয়া যোগ্যতা ও সামর্থ্য দিয়েই মানুষ ভগবানের প্রতি প্রেমানুরাগী হতে পারে।

জগৎ-সংসার নিয়ত পরিবর্তনশীল (অপ্রাপ্ত) তথা মানুষের নিজের নয়, তবুও জগৎকে মানুষের প্রিয় মনে হয় অথচ পরমাত্মা সমগ্র স্থান-কাল ইত্যাদিতে একভাবে বিদ্যমান (নিত্যপ্রাপ্ত) এবং আপন, তবুও তাঁকে মানুষ প্রিয়রূপে দেখে না। এর কারণ হলো, **আমরা জগতের নিন্দা করলেও জগতের যে অস্তিত্ব বা গুরুত্ব নেই তথা সেটি যে আপন নয়, তা অনুভব করি না। এই রকমই আমরা পরমাত্মার মহিমা কীর্তন করলেও তাঁকে অস্তিত্ব ও গুরুত্ব দিয়ে নিজের বলে স্বীকার করি না।** এইজন্য সাধকের প্রকৃত কর্তব্য হলো—বিবেকপূর্বক জগৎকে নিজের বলে না ধারণা করা এবং শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে ভগবানকে আপন বলে মেনে নেওয়া, বাস্তবিকই যা অভ্রান্ত।

মানুষ যখন জগৎকে নিজের তথা নিজের জন্য বলে মনে করে, তখন তার কাছে নিজের ও জগতের (পরা ও অপরার) প্রকাশ স্বতন্ত্র সত্তারূপে প্রতীত হয়। এর পরিণামে এই হয় যে, জীব জগতের অধীন (পরাধীন) হয়ে যায় আর জন্ম-মৃত্যু চক্রে পড়ে দুঃখ পায়। এই পরাধীনতা থেকে মুক্ত হওয়ায় জন্য সাধকের তিনটি বিশেষ কথা স্মরণে রাখা কর্তব্য—

(১) আমার কিছুই নেই।

(২) আমার কিছুই চাই না।

(৩) আমার নিজের জন্য কিছুই করার নেই।

(১) আমার স্বরূপ (আত্মা) অস্তিত্বমাত্র। এই স্বরূপের সঙ্গে আর কিছুই নেই। জগতের কোন বস্তু তথা ক্রিয়াই স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। অর্থাৎ **নিজের কাছে নিজের স্বরূপ ব্যতীত আর কিছুই নেই।** 'আমি' রূপে পরিচায়ক স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ শরীরও নিজের সঙ্গে নেই

এবং আমিও ওইগুলির সঙ্গে নেই। যদি শরীর আমার সঙ্গে থাকত, তাহলে আমার বহুবার জন্মগ্রহণ সম্ভব হত কীকরে ? আমি অন্যান্য শরীরগুলি ধারণ করতামই বা কীভাবে ? যদি আমি শরীরের সঙ্গে থাকতাম তাহলে কখনো মুক্তি সম্ভবই হত না। প্রতিটি স্থান, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ক্রিয়া, পরিস্থিতি, অবস্থা ইত্যাদির মধ্যে সর্বদাই পরিবর্তন হয়ে চলেছে, উৎপত্তি-বিনাশ হয়ে চলেছে, কিন্তু নিজের (আত্মস্বরূপের) সত্তায় কখনোই কিঞ্চিৎমাত্র পরিবর্তন বা উৎপত্তি-বিনাশ হয় না। এই স্থান-কাল আদির সবকিছুর অভাব বা পরিবর্তন আমাদের অনুভবে ধরা পড়ে, কিন্তু নিজের অস্তিত্বের অভাব কখনোই কারোর অনুভূত হতে পারে না। পরিবর্তনশীল ও বিনাশশীল বস্তু (শরীর-জগৎ), অপরিবর্তনীয় এবং অবিনাশী তত্ত্বের সাথে কেমন করে থাকতে পারে এবং তার প্রয়োজনই বা কী ? অমাবস্যার রাত সূর্যের সাক্ষাতে কেমন করে থাকতে পারে আর সূর্যের তাতে লাভই বা কী ? জাগতিক শরীর, বল, বুদ্ধি, বিদ্যা, যোগ্যতা, রূপ ইত্যাদি জাগতিক কাজেই লাগে, আত্মাস্বরূপের জন্য কোনভাবেই তার একটুও প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ অপরা প্রকৃতি তথা তার অন্তর্গত শরীর ও জগতের দ্বারা আমার (স্বরূপের) কিছুই প্রাপ্তি হয় না, কোনরকম পুষ্টি হয় না, হিত হয় না, হতেই পারে না। **একত্রিতভাবে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডও আমার পূর্তি বা সন্তুষ্টি করতে পারে না**। এইজন্য অনন্ত জগৎ তথা ব্রহ্মাণ্ডে এমন একটিও বস্তু নেই যা আমার (স্বরূপের) বা আমার জন্য।

জীব এবং পরমাত্মা দুই-ই 'অকিঞ্চন'। জীব অকিঞ্চন কেননা তার জন্য তো জগৎ-সংসারে 'আমার বলে কিছুই নেই' অর্থাৎ তার ভগবান ব্যতীত আর কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধ নেই। আবার, পরমাত্মা 'অকিঞ্চন' কারণ তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন সত্তাই নেই—**'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি'** (গীতা ৭।৭), **'সদসচ্চাহম্'** (গীতা ৯।১৯)। **যতকাল জীবের দৃষ্টিতে জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয়, ততকাল তার**

কাছে নিজের বলে কিছু নেই এবং যখন তার দৃষ্টিতে জগতের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না, তখন ভগবান ব্যতীত আর কিছুই থাকে না—'বাসুদেবঃ সর্বম্', তার তখন ভগবানের সঙ্গে একত্ব হয়ে যায়—**'জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্'** (গীতা ৭।১৮), **'ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্'** (গীতা ৯।২৯)। এইজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী দেবীকে বলেছিলেন যে, 'আমি চিরকাল অকিঞ্চন আছি আর অকিঞ্চন ভক্তদেরই আমি ভালোবাসি এবং তারাও আমাকে ভালোবাসে'—

নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বন্নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১৪।৬০।১৪)

ভগবান তাঁর অকিঞ্চন ভক্তদেরই দর্শন দিয়ে থাকেন—**'ত্বামকিঞ্চনগোচরম্'** (শ্রীমদ্ভাগবত ১।৮।২৬)। এইজন্যই কোন বস্তুই নিজের বা নিজের জন্য নয়—এইরকম সিদ্ধান্ত করে অনুভব করলেই মানুষ অকিঞ্চন হয়ে যায়, ভগবদানুরাগী প্রেমিক হয়ে যায়—**'প্রিয়ো হি জ্ঞানীনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ'** (গীতা ৭।১৭)।

(২) অভাববোধ থেকেই ইচ্ছার উৎপত্তি হয়, অস্তিত্বমাত্র আত্মস্বরূপে কখনো অভাব হয় না—**'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'** (গীতা ২।১৬)। এইজন্য আত্মস্বরূপে কোন ইচ্ছার উদ্রেক হয় না। যখন অনন্ত জগতে কোন বস্তুই আমার বা আমার জন্য নেই-ই এবং কোন বস্তু আত্ম-স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছতেই পারে না, আমি তা পেতেই পারি না, তাহলে আর কী ইচ্ছা করব, কেনই বা করব ? যে শরীরকে আমি 'আমি', 'আমার' ও 'আমার জন্য' বলে মনে করি, সেই শরীরও কখনো আমাকে 'প্রাপ্ত' হয়নি, প্রাপ্ত হয় না, প্রাপ্ত হবে না, প্রাপ্ত হতে পারে না। কারণ শরীরে সর্বক্ষণেই পরিবর্তন হচ্ছে আর আমি (স্বরূপত) সর্বদাই একভাবে আছি। অর্থাৎ, **স্বরূপের সঙ্গে শরীরের কখনোই সংযোগ হয়নি, কারণ এই দুটিই পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাবের**। এইজন্য, আমার জগৎ থেকেও কিছু চাওয়ার নেই, ভগবানের থেকেও কিছু

চাওয়ার নেই। **জগৎ থেকে কিছু চাওয়ার নেই কারণ তার মধ্যে এমন কোন বস্তুই নেই, যা সেটি আমাকে দিতে পারে।** ভগবানের কাছ থেকেও শান্তি, মুক্তি, সদ্গতি, দর্শন আদি কিছু চাই না, কারণ ভগবানের অধীন এইগুলিকে প্রদান করা তাঁর কর্তব্য এবং এগুলি তাঁর অধীন। ভগবানকে তাঁর কী কর্তব্য তা বলা আমার কার্য নয়, বরং নিজের কর্তব্যই আমাকে পালন করতে হবে। আমার কর্তব্য হলো, ভগবান ব্যতীত কোন কিছুকে নিজের বলে না মেনে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভগবানের কাছে অর্পণ করে দেওয়া এবং তাঁর কাছ থেকে কিছুই না চাওয়া, কারণ বস্তুত ভগবান ব্যতীত আপন আর কিছুই নেই।

একটি বিশেষ কথা হলো, ভগবান ব্যতীত দ্বিতীয় কিছুকে নিজের বলে মনে করলে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ অর্থাৎ বিমুখতা হয়ে যায়। এই রকমই, **ভগবানের কাছে কিছু প্রার্থনা করলে সেই বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ হয়ে যায় এবং দাতা (ভগবান)-এর সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ অর্থাৎ বিমুখতা হয়ে যায়।** মানুষের ভুলটা হয় এই যে, সে যা পেয়েছে তা তো নিজের বলে মনে করে কিন্তু যিনি দিয়েছেন তাঁকে আপন বলে মনে করে না। যা পাওয়া গেছে তা তো কালক্রমে হারাতেই হবে কিন্তু ভগবানকে কখনো হারাতে হবে না।

(৩) অস্তিত্বমাত্র আত্মস্বরূপে কোন ক্রিয়া নেই। শুধুমাত্র প্রকৃতির মধ্যেই ক্রিয়া হয়ে থাকে। আত্মস্বরূপ কোন রকম ক্রিয়াই করে না— **'নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি'** (গীতা ৫।৮), **'নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ'** (গীতা ৪।২০)। মানুষ যা কিছুই করে, কিছু না কিছু পাওয়ার আশা নিয়েই করে। যখন জগতে কোন বস্তুই আমার বা আমার জন্য নেই, তাহলে আর কী প্রাপ্তির জন্য কর্ম করার আছে ? এইজন্য আমার নিজের জন্য কিছু করারই নেই।

যদি আমি শরীর আদি কোন বস্তুকে নিজের বলে মনে করি তাহলে কখনোই সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাম হতে পারব না, কারণ শরীরের তো অন্ন,

বস্ত্র আদি সব জিনিসের প্রয়োজন আছে। সম্পূর্ণ নিষ্কাম না হয়ে কর্ম-ত্যাগও সম্ভব নয়, কারণ সেক্ষেত্রে কামনা পূরণের জন্য তো কর্ম করতেই হয়। এইজন্য 'আমার কিছুই নেই'—এই অনুভব হলে 'আমার কিছুই চাই না' এটি অনুভব করায় সামর্থ্য এসে যায় এবং আমার কিছুই চাই না— এটি অনুভব হলে 'আমার কিছুই করার নেই'—এই অনুভবের সামর্থ্য লাভ হয়।

'আমার কিছুই নেই'—এইটি বুঝে গেলে মানুষ মমত্বহীন হয়ে যায়, 'আমার কিছুই চাই না'—এইটি ধারণা হয়ে গেলে মানুষ কামনাহীন হয়ে যায় আর আমার (নিজের জন্য) কিছুই করার নেই—এইটি উপলব্ধি হয়ে গেলে মানুষ কর্তৃত্বহীন হয়ে যায়। মমত্বহীন, কামনাহীন ও কর্তৃত্বহীন বোধ জাগ্রত হলে মানুষ 'স্ব'-রূপে স্থিত হয় অর্থাৎ মুক্ত হয়ে যায়।[১] যদি সাধক নিজের অস্তিত্বকে পরমাত্মার অস্তিত্বে অর্পণ করে দেয় অর্থাৎ, 'আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার'—এইরকম আত্মীয়তা (অভিন্নতা) স্বীকার করে নেয়, তাহলে সে 'স্বকীয়'তায় স্থিত হয় অর্থাৎ 'ভক্ত' হয়ে যায়।

যদি কোন সাধক জ্ঞানমার্গ (নির্গুণোপাসনা)-এর আগ্রহ রেখে ভক্তিমার্গ (সগুণোপাসনা)কে উপেক্ষা, অনাদর, খণ্ডন, নিন্দা বা তিরস্কার করে তাহলে তার মুক্তির পরেও ভক্তিলাভ হবে না। যদি সাধক নিজের সাধনায় আগ্রহ না রেখে, ভক্তিকে উপেক্ষা বা তিরস্কার না করে, বরং সমাদর করে তাহলে তার মুক্ত হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই ভক্তিলাভ হয়ে যাবে। এইজন্য গীতায় ভগবান, '**যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি**' (৩।৩৫) বাক্যের দ্বারা বলেছেন যে, 'তত্ত্বজ্ঞান

---

[১]বিহায় কামান্যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ ....। (গীতা ২।৭১-৭২)

হয়ে গেলে সমস্ত প্রাণীকেই সম্পূর্ণভাবে প্রথমে নিজের মধ্যে দেখতে পাবে' (**দ্রক্ষ্যসি আত্মনি**)—এই হলো মুক্তি লাভ, এবং 'তারপর আমার মধ্যে দেখতে পাবে' (**অথো ময়ি**)—এই হলো ভক্তিলাভ। বস্তুত শরীরের সঙ্গে কখনোই আমার মিলন হতে পারে না এবং পরমাত্মা থেকে আমি কখনোই ভিন্ন হতে পারি না। সুতরাং মুক্ত হওয়া তথা ভক্ত হওয়া হলো বাস্তবিকতা।

মুক্তিতে তো সূক্ষ্মভাবে অহং-এর লেশ থেকে যায়, যার থেকে অদ্বৈত, বিশিষ্ঠাদ্বৈত, দ্বৈত ইত্যাদি মতভেদের উৎপত্তি হয়, কিন্তু প্রেম-ভক্তি লাভ হলে অহং সম্পূর্ণভাবেই[১] বিদূরিত হয়ে যায়, যার ফলে সমস্ত মতভেদের নিরসন হয়ে '**বাসুদেবঃ সর্বম্**'-এর অর্থাৎ পরা ও অপরা সহ ভগবানের অখণ্ডরূপের অনুভব হয়ে যায়। এই হলো 'বিজ্ঞান সহ জ্ঞান', যা জ্ঞাত হলে আর কোন কিছুই জানার মতো অবশিষ্ট থাকে না—'**যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে**' (গীতা ৭।২) এবং যা জেনে সাধক জন্ম-মৃত্যুময় জগৎ থেকে মুক্ত হয়ে যায়—'**যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষসেঽশুভাৎ**' (গীতা ৯।১)। এই বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের বর্ণনা, ভগবান গীতায় সপ্তম, নবম, দশম ও একাদশ অধ্যায়ে করেছেন, আবার দ্বাদশ অধ্যায়ে বলেছেন যে, কেবল জ্ঞানের অপেক্ষা বিজ্ঞানসহ জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। কারণ 'জ্ঞানে' আছে নির্গুণের উপাসনা আর 'বিজ্ঞানে' আছে সগুণ (সমগ্র)-এর উপাসনা। সগুণের উপাসনা হলো সমগ্রেরই উপাসনা। কিন্তু নির্গুণে উপাসনা হলো অখণ্ডের (সমগ্রের) একটি অঙ্গের উপাসনা ; কারণ নির্গুণে গুণের নিষেধহেতু তার মধ্যে সগুণ (সমগ্র) আসতে পারে না, অথচ সগুণ (সমগ্র)-এর মধ্যে কোন নিষেধ না থাকায় নির্গুণও তার অন্তর্গত। এই কারণে সগুণের উপাসক

---

[১]প্রেম ভগতি জল বিনু রঘুরাঈ। অভিঅন্তর মল কবহুঁ ন জাঈ॥

(শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৪৯।৩)

বিজ্ঞানসহ জ্ঞানকে অর্থাৎ সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকারের সঙ্গে ভগবানের অখণ্ডরূপকে (সমগ্ররূপকে) জেনে যায়।[১]

'জ্ঞানে'র দ্বারা মুক্তি প্রাপ্তি হয়, আর 'বিজ্ঞানের' দ্বারা হয় ভক্তির প্রাপ্তি। মুক্তির মাধ্যমে পরমাত্মার সঙ্গে ঘটে 'সাধর্ম্য'—'**মম সাধর্ম্যমাগতাঃ**' (গীতা ১৪।২) আর ভক্তির মাধ্যমে পরমাত্মার সঙ্গে হয় আত্মীয়তা (অভিন্নতা)—'**জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্**' (গীতা ৭।১৮)। চূড়ান্ত প্রাপ্তির তত্ত্ব হলো ভক্তিই, সুতরাং এই ভক্তির প্রাপ্তিতেই ঘটে মনুষ্য-জীবনের পূর্ণতা।

~~○~~

---

[১]জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্॥
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ॥

(গীতা ৭।২৯-৩০)

'বৃদ্ধাবস্থা ও মৃত্যু থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে মানুষ আমার আশ্রয় নিয়ে প্রযত্ন করে সে এই ব্রহ্মকে, সমগ্র অধ্যাত্মকে এবং কর্মকে সমগ্রভাবে জেনে যায়।'

'যে মানুষ অধিভূত, অধিদৈব তথা অধিযজ্ঞের সঙ্গে আমাকে জানে, আমাতে চিত্তযুক্ত সেই মানুষ মৃত্যুকালেও আমাকেই জানে অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়।'

আমি ভগবানের

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।

মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥ (১৫।৭)

'এই জগতে জীবরূপী আত্মা (স্বরূপ) আমারই সনাতন অংশ। কিন্তু সেটি প্রকৃতিতে স্থিত মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়কে আকর্ষিত করে অর্থাৎ নিজের বলে মনে করে।'

কোন পিতার কাছে তার সন্তান যেমন সম্বন্ধিত তার থেকেও অধিকভাবে আমরা সন্তানরূপে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধিত। অথচ আমরা ভগবানকে আপন না মনে করে প্রকৃতিতে স্থিত শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিকে আপন বলে মনে করি—এইটিই হলো আমাদের বন্ধন, এটি ছাড়া আর কোন বন্ধন নেই। সন্তানের **শরীরে তার মাতা-পিতা দুজনেরই অংশ থাকে, আমাদের মধ্যে কিন্তু ভগবান ও প্রকৃতি—দুই-এর অংশ নেই। আমরা শুধু ভগবানের অংশ—'মম এব অংশঃ।'** ভগবানের অংশ হওয়ায় আমরা ভগবানেই স্থিত আছি ; কিন্তু আমরা প্রকৃতিতে স্থিত শরীরকে নিজের বলে মনে করি। আমাদের ত্রুটিটা এইখানেই। প্রকৃতির অংশ তো প্রকৃতিতেই আছে, কিন্তু আমরা আমাদের অংশী ভগবানের থেকে বিমুখ হয়ে আছি। প্রকৃতির অংশ তো সুসন্তানই রয়েছে, আমরাই হয়ে গেছি কুসন্তান।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত বস্তু, কিন্তু কোন বস্তুই আমাদের নয়, আমাদের কল্যাণকারীও নয়। যদি **অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডও আমাদের অধিগত হয়, তো তার দ্বারাও আমাদের কোন লাভ হওয়ার নয়।** যে বস্তু আদৌ আমাদের নয়, তা আমাদের কল্যাণ সাধন করবে কী করে ? তা করতেই পারে না। আমরা যাঁর অংশ, যিনি প্রকৃতই আমাদের, সেই সত্তাই শুধু আমাদের কল্যাণ করতে পারেন।

আমরা হলাম পরামাত্মার অংশ এবং 'চিৎ', নির্মল তথা 'সহজ সুখরাশি'—

ঈশ্বর অংস জীব অবিনাসী। চেতন অমল সহজ সুখরাসী॥

(শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ১১৭।১)

কোন জীব যে প্রজাতিতেই (যোনি) জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সে সর্বদাই '**চেতন অমল সহজ সুখরাসী**'ই থাকবে। উচ্চ বা নিম্ন প্রজাতিতে জন্মগ্রহণের কারণ হলো গুণের সঙ্গ—'**কারণং গুণ-সঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু**' (গীতা ১৩।২১)। সত্ত্বগুণের সঙ্গলাভে ঊর্ধ্বগতি হয়, রজোগুণের সঙ্গ দ্বারা মধ্যগতি হয় এবং তমোগুণের সঙ্গের ফলে অধোগতি হয়[১]। এর তাৎপর্য হলো, গুণের সাথে সম্বন্ধ হওয়ায় অর্থাৎ শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির সঙ্গে সম্বন্ধ মেনে নেওয়ার ফলেই জন্ম-মৃত্যু হয়। এইজন্য সাধকের আজ এখনই স্বীকার করে নেওয়া উচিত যে, আমার সম্বন্ধ তো কেবল পরমাত্মার সাথেই আছে। আমি সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ এবং পরমাত্মার মধ্যেই অবস্থিত। তাই মুক্তি হওয়া নিয়ে আমার কোন সন্দেহই নেই, কারণ আমি খাঁটি কথাটা ধরে ফেলেছি। আমার কাছে যে বস্তু আছে, যে যোগ্যতা আছে, এই সবই সংসারের এবং সংসারের জন্যই। আমি শুধু পরমাত্মার এবং পরমাত্মার জন্যই আছি।

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহং—এই সবই হলো 'অপরা প্রকৃতি' এবং জীবরূপে গঠিত আমি হলাম 'পরা প্রকৃতি'। আমার সম্বন্ধ পরমাত্মার সাথেই, শরীরের সাথে নয়। শরীর অপরা প্রকৃতি। আমি (অহং) এবং আমার—এই দুইয়ের সম্বন্ধ হলো জগতের সাথে, এইভাবে মমত্বহীন ও নিরহংকার হতে পারলে তৎক্ষণাৎ শান্তি-প্রাপ্তি হবে—'**নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি**' (গীতা ২।৭১)। আমাদের কিছুই নেই। মমত্ব তথা

[১]ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥ (গীতা ১৪।১৮)

অহংকার, কোনটাই আমাদের নয়। কামনা এবং স্পৃহাও আমাদের নয়। একেই গীতায় ব্রাহ্মী স্থিতি বলা হয়েছে—**'এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ'** (গীতা ২।৭২)। এইজন্য শুধু এই কথাই স্বীকার করে নিতে হয় যে, **'আমি পরমাত্মার অংশ, শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই'—তাহলে সাধক এখনই মুক্ত হয়ে যাবেন**। এর মধ্যে পাপ-পুণ্যের কোন ব্যাপার নেই। 'আমি পাপী' এই ভাবনাটাকেই দূর করে দিতে হয়। আমাদের পাপ-তাপ কিছুই নেই। আমরা সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ। পাপ হলো আগন্তুক এবং কৃত্রিম, তা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু আমরা স্বাভাবিক **'চেতন অমল সহজ সুখরাসী'** এই পর্যন্তই আমাদের জানা প্রয়োজন। পাপ হলো উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তু কিন্তু আমরা উৎপত্তি ও বিনাশশীল নই।

আমরা সর্বদা পরমাত্মার সঙ্গে বর্তমান এবং পরমাত্মাও আমাদের নিত্য সাথী। আমরা পাপী হলেও পরমাত্মার সঙ্গে আছি, পুণ্যবান হলেও পরমাত্মার সঙ্গে আছি। আমরা ভালো হলেও তাঁর সাথে আছি, খারাপ হলেও তাঁর সাথে আছি। আমাদের পাপও নেই, পুণ্যও নেই ; ভালোও নেই, মন্দও নেই। আমাদের যদি এখন এই অনুভব না-ও হয়, তাহলেও আমরা পরমাত্মার সঙ্গে আছি। কেউ যতো বড় পাপীই হোক, প্রতিদিন প্রাণীকর্তনকারী কসাইও যদি সে হয়, তাহলেও সে পরমাত্মার অংশ, আমরা সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ, পাপ-পুণ্য আমাদের স্পর্শও করতে পারে না, আমাদের কাছে পৌঁছতে পর্যন্ত পারে না। এই কথাটি যদি আমরা সঠিক বুঝে নিতে পারি, তাহলে তাতেই আমাদের মুক্তি হয়ে যাবে।

শরীর তো জগতের বস্তু আর জন্ম-মরণশীল, কিন্তু আমরা তো স্বরূপত অপরিবর্তিত থাকি—**'ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে'** (গীতা ৮।১৭)। জগতের সাথে শরীরের ঐক্য আছে, কিন্তু আমাদের (আত্মার) তা নেই। সমস্ত পাপ-তাপই শরীরগত, আমাদের স্বরূপগত নয়। আমাদের স্বরূপ সকল পাপ-পুণ্য, শুভ-অশুভ কর্মের

অতীত ভিন্ন সত্তা। এই কথাটি মেনে নিলেই হবে। 'আমি' শুধুমাত্র পরমাত্মারই—এটি একেবারে খাঁটি কথা। এইটি ধারণা করে মেনে নিতে পারলেই মুক্তি হয়ে যাবে, কারণ মনের মান্যতাতেই বদ্ধতা আবার ওইভাবে মান্যতাতেই মুক্তি।

আমি ভগবানের—এই কথাটি যদি আমরা ভুলেও যাই তাহলেও এই কথাটি আমাদের মধ্যে থেকেই যাবে। কারণ ভুলে যাওয়া বা স্মরণে থাকা আমাদের মন-বুদ্ধির ব্যাপার, স্বরূপের নয়। আত্মস্বরূপের সম্বন্ধ ভুলে যাওয়ার সঙ্গেও নয়, স্মরণে রাখার সঙ্গেও নয়। আমরা তো সদা-সর্বদাই স্বরূপত **'চেতন অমল সহজ সুখরাসী'**, তাহলে আমাদের ভুলে যাওয়ারই বা কী, স্মরণে রাখারই বা কী ! আমরা চিৎ-স্বরূপ সত্তা, কিন্তু সত্ত্ব-রজো-তমো তিনগুণ হলো জড়। আমরা এই গুণগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করি, তার ফলেই গুণগুলি আমাদের বদ্ধ করে। আমরা যদি গুণগুলিকে না আশ্রয় করি, তাহলে ওইগুলি কিছুই করবে না। আমরা স্বরূপত চিৎ তথা অসঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও জড়কে আশ্রয় করি, সেইজন্যই তাতে জড়িয়ে পড়ি। আমরা যদি ওইগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ না করি, তাহলে ওই গুণ প্রকৃতিতেই থেকে যাবে—**'প্রকৃতিস্থানি'**, আমাদের স্পর্শ করবে না, এই ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহও নেই। যদি আমরা গুণসমূহের সঙ্গ না করি তবে ওইগুলি আমাদের কিছুই করতে পারে না। গুণের সেই ক্ষমতাই নেই। প্রভুকে মেনে নেওয়া মাত্রই আমাদের পূর্ব পূর্ব জন্মের যতো কর্মফল সব বিনষ্ট হয়ে যায়—

সনমুখ হোই জীব মোহি জবহীঁ। জন্ম কোটি অঘ নাসহিঁ তবহীঁ॥

(শ্রীরামচরিতমানস, সুন্দরকাণ্ড ৪৪।১)

পুরোনো পাপ নষ্ট হয়ে যাবে এবং নতুনভাবে পাপ আর হবেই না। কারণ পাপকর্ম হয় তখনই যখন আমরা জগৎকে নিজের মনে করে তার কাছে কিছু চাই। যদি জগৎকে নিজের না মনে করে, তার থেকে কিছু কামনা না করে শুধু ভগবানকেই আপন মনে করি তাহলে এই মুহূর্তেই অনন্ত জন্মের পাপ দূর হয়ে যাবে। ভগবান আমার আপন—এই কথা

বারংবার উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। যেমন, মাকে যে আমরা আপন মনে করি, তা নিয়ে তো আমাদের বারংবার বলতে হয় না। মায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ তো জীবের জন্মের সঙ্গেই গড়ে ওঠে, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ তো গড়ে ওঠা নয়। মাতৃগর্ভে জীবের আগমন হয়, সে মাতৃদুগ্ধ পান করে, এইভাবে তাঁর মায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। কিন্তু ভগবান আগে থেকেই (নিত্যই) আপন আছেন এবং চিরকালই তাই থাকবেন। জগতের কোন সম্বন্ধই স্থায়ী নয়। কারোর এখনই মৃত্যু হলে তার সব জাগতিক সম্বন্ধ শেষ হয়ে যাবে। **নষ্ট হয় তা-ই যা বস্তুত নেই, আর থেকে যায় সেইটিই, যা প্রকৃতই আছে**। নিত্যসত্তার কথাটি আমাদের ধরে রাখতে হবে, একাগ্র দৃষ্টি রাখতে হবে সেই দিকেই, এইটুকুই আমাদের করার আছে।

আমি ভগবানের, ভগবান আমার। শরীর জগতের, জগৎ শরীরের। আমার আর পরমাত্মার মধ্যে একত্ব আছে। আবার শরীরের আছে জগতের সঙ্গে ঐক্য। সাধু-সন্তগণ এটিকে 'সৎ সঙ্গ' বলে জানিয়েছেন। সৎ-এর সঙ্গ করা, সৎকে স্বীকার করাই হলো 'সৎ সঙ্গ'। সৎসঙ্গ হলে দেখা যায় কোন বন্ধনই প্রকৃতপক্ষে নেই। **'আমার শরীর ও জগতের সাথে কোন সম্বন্ধই নেই'—এই কথা মেনে নেওয়ার থেকে বড় কাজ আর কিছুই নেই**। লক্ষ লক্ষ লোককে খাদ্য বিতরণ করাও এর তুল্য কাজ হতে পারে না। আমরা সর্বদাই শরীর থেকে পৃথক। এর মধ্যে সংশয়ের কোন অবকাশই নেই। আমরা শরীর ও জগতের সাথে নিজেদের এক বলে মেনে রেখেছি—এই ভুল ধারণাটা বর্জন করতে হবে। এটি বর্জন করতে পারলে এখন এই মুহূর্তেই মুক্তি হবে।

আমাদের ভুলটা হলো এই যে, জাগতিক যে সম্বন্ধ আদৌ সহায়ক নয় তাকে আমরা মেনে নিই আর যে সম্বন্ধ সদা বিদ্যমান, সেটিকেই মানি না। যার দ্বারা বন্ধন ঘটে সেটিকেই মেনে নিয়ে, যার দ্বারা মুক্তি হয়, সেইটিরই অমান্য করা হয়। জাগতিক কোন সম্বন্ধই স্থায়ী নয়। যতোই বলপ্রয়োগ করা হোক না কেন, জাগতিক কোন সম্বন্ধই ধরে

রাখা যায় না। একইভাবে, যতো বলপ্রয়োগই করা হোক না কেন, **ভগবানের সঙ্গে যে সম্বন্ধ তা ভঙ্গ করা স্বয়ং ভগবানের পক্ষেও সম্ভব নয়। তিনি সর্বশক্তিমান হলেও, আমাদের ত্যাগ করতে সমর্থ নন।**

'আমি ভগবানের'—এই কথা চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই। এই কথা চিন্তার অধীন নয়, বস্তুত এটি মান্যতার বা ধারণার অধীন। যেমন সামনে যদি কোন স্তম্ভ থাকে, সেটা যে আছে তা নিয়ে কী চিন্তা করা যাবে ? দুই আর দুইয়ে যে চার হয়, সেটায় চিন্তার কী আছে ? আমরা যে ভগবানের—এটা তো সত্য কথা। সত্যকে মেনে নিলেই কার্য সিদ্ধি হয়ে যাবে। যদি শরীরের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ থাকত, তাহলে তো দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও পরিবর্তিত হয়ে যেতাম। কিন্তু শরীরে নিত্য পরিবর্তন হয়ে চললেও আমরা স্বরূপত অপরিবর্তিত থাকি। শরীর তো বালক, যুবক ও বৃদ্ধ হয়, কিন্তু আমরা তা হই না। **আমরা শরীরও নই, শরীরধারীও (শরীরী) নই।** আমরা শরীর থেকে পৃথক এবং শরীরও আমাদের থেকে পৃথক। শরীর থেকে পৃথক বলেই জীব একটি শরীর ত্যাগ করে আরেকটি শরীর ধারণ করতে পারে। জীব সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ—এটি একেবারে সত্য, খাঁটি তথা সিদ্ধান্তমূলক কথা। এইজন্য **আমাদের আজই শ্রবণ, পঠন, শিক্ষালাভ ইত্যাদি বন্ধ করে জানা এবং মান্য করা আরম্ভ করা উচিত। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে একটিও বস্তু জীবের নিজের নয় এমন কী শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি পর্যন্ত নিজের নয়—এইটি হলো জানার এবং কেবলমাত্র ভগবানই আপন এইটি হলো মান্য করার কথা।** শ্রবণ, পঠন, শিক্ষালাভ ইত্যাদির দ্বারা আমি বিদ্বান হতে পারি, বাগ্মী হতে পারি, লেখক হতে পারি, কিন্তু তাতেও আমার বন্ধন আগে যেমন ছিল তেমনই থেকে যাবে। কিন্তু 'আমার কেউ নেই'—এইটি জানতে পারলে আমি মুক্ত হয়ে যাব এবং 'শুধুমাত্র প্রভুই আমার'—এইটি মানতে পারলে আমি ভক্তে পরিণত হব।

~~0~~

‘মেরে তো গিরধর গোপাল’

জীব মানব-শরীর লাভ করে ভগবানের কৃপায় এবং শুধুমাত্র ভগবানকে প্রাপ্তির জন্যই সে সেটি পায়। এইজন্য সব কর্ম ছেড়ে জীবের উচিত ভগবদ্-পরায়ণ হওয়া। যাঁর অনেক বয়স হয়ে গেছে, তাঁর তো ভগবন্নিষ্ঠ হওয়া উচিতই, কিন্তু যারা অল্পবয়স্ক তাদেরও উচিত পবিত্র হৃদয়ে ভগবানের শরণ নেওয়া। জাগতিক সব কাজ করে দাও কিন্তু অন্তরে প্রকৃত ধ্যেয়, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য রাখতে হবে পরমাত্মাপ্রাপ্তিরই।

বস্তুত অস্তিত্ব আছে একমাত্র পরমাত্মারই। জাগতিক ব্যাপারে আমরা যা লক্ষ্য করি তা ক্ষয়িত হচ্ছে সর্বদাই। নিজেদের দিকে তাকালে দেখা যায় জীব যখন মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নেয়, সে সময় তার শরীরটি কীরূপ থাকে এবং পরবর্তীকালে তার চেহারাটি কেমন হয় ! জগৎ সর্বদাই পরিবর্তিত হচ্ছে আর পরমাত্মা হলেন চিরস্থায়ী। জগতের স্থায়িত্ব নেই আদৌ, কিন্তু পরমাত্মার নেই কোনরকম পরিবর্তন। এই পরমাত্মা আমার, আমি পরমাত্মার—এই বোধে দৃঢ়তা চাই। একটি শিশু যখন বলে, ‘এই আমার মা’ তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ‘মা তোমার কেন ?’ সে তার উত্তর দিতে পারবে না। বস্তুত তার মনে তো এই নিয়ে কোন প্রশ্নই ওঠেনি যে, মা কেন তার। ‘মা আমার’ এটি তো নিশ্চিত ব্যাপার, এ নিয়ে তার মনে তাই কোন সংশয়ই নেই। **এইরকমই, আমাদেরও উচিত কোন রূপ সংশয় না রাখা এবং এই কথা দৃঢ়ভাবে মেনে নেওয়া যে, ‘ভগবান আমার’**। ভগবান ব্যতীত কেউই আমার নয়, কারণ বাকি সবই নশ্বর। যেসব বিষয়ে মানুষ অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করে সেই অর্থ, জমি, গৃহ ইত্যাদি সব বিনাশশীল। ওইগুলির কথা স্মৃতিতে পর্যন্ত টিকে থাকে না। যদি সবই স্মৃতিতে থাকতো তাহলে তো জীবমাত্রেই তার পূর্বজন্মের কথা বলতে পারত ! সে বলতে পারত তার গত জন্মের মাতা-পিতার পরিচয়। বলতে পারত আত্মীয় স্বজনের

কথা, গৃহের কথা। কিন্তু পূর্বজন্মের কথা জীবের স্মরণে থাকে না, তেমনই এই জন্মের বিবরণও তার স্মরণে থাকবে না। **যা স্মরণে পর্যন্ত থাকবে না, সেই ব্যাপার নিয়ে জীব কেন অকারণে উদ্বেলিত হবে ?** এটি সকল জীবেরই অনুভবের কথা যে, প্রকৃতপক্ষে কেউই তার নয়। অন্যান্যদের সঙ্গে সংসারে মিলন যেমন হচ্ছে তেমনই বিচ্ছেদও অবশ্যম্ভাবী। এই কারণে **'মেরে তো গিরধর গোপাল, দূসরো ন কোঈ'** ('আমার তো গিরিধারী গোপালই আছেন, দ্বিতীয় আর কেউ নেই'—মীরাবাঈ) এই ভাব অবলম্বন করে মগ্ন হয়ে যেতে হয়। জাগতিক কাজে যদি তাতে গোলমাল হয়ে যায় তো হোক না, ওই সব কাজে তো গোলমাল আছেই। আপাতভাবে ওই কাজে সব ঠিকঠাক থাকলেও কোন না কোনভাবে গোলমাল এসেই পড়ে। সুতরাং তা নিয়ে চিন্তার প্রয়োজন নেই। প্রথম দিকে কিছু কিছু অসুবিধা হতে পারে বটে, কিন্তু পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। জগতের সব হারিয়ে গেলেও কিছু যাবে-আসবে না, আমি আর ভগবান—এই দুই ছাড়া তো আর কিছু নেই-ই। 'আমি শুধুমাত্র ভগবানের এবং শুধুমাত্র ভগবানই আমার'—এই ভাব ছাড়া আর কোন দিকে নজরের বা বিচার-বিবেচনার প্রয়োজনই নেই।

এক পরমাত্মাই সর্বত্র পরিপূর্ণভাবে অবস্থিত। উনি ছাড়া আর কিছু তো নেই-ই, কেউ হয়ওনি, হবেও না, হতেও পারে না। এই পরমাত্মাই আমার—এই বোধসহ জীবের মগ্ন তথা প্রসন্ন হয়ে যাওয়া উচিত। ভগবান ভালো বা মন্দ—এ বিচারেরও প্রয়োজন নেই। চিত্রকূট যাবার কালে ভরত যখন মা কৈকেয়ীর কথা ভাবছিলেন তখন চলার গতি কমে আসছিল আবার যখন নিজের দিকে দেখছিলেন তখন দাঁড়িয়ে পড়ছিলেন, কিন্তু যখন রঘুনাথের দিকে তাকান তখন তীব্র গতিতে ছুটছিলেন ।

জব সমুঝত রঘুনাথ সুভাউ। তব পথ পরত উতাহল পাউ॥

(শ্রীরামচরিতমানস, অযোধ্যাকাণ্ড ২৩৪।৩)

এইরকমই জীবের উচিত নিজের ক্রিয়ার দিকে না দেখা, নিজের

পাপের দিকে না দেখা, শুধুমাত্র ভগবানের দিকে দেখা। বিদুরের স্ত্রী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কলার খোসা খেতে দেওয়ায় তিনি সেটিই খেয়ে নিয়েছিলেন। ওই খাওয়ায় ভগবান যে তৃপ্তি পেয়েছিলেন অমন তৃপ্তি তিনি কলাটি খেলে পেতেন না। কারণ বিদুরানির অন্তরে ছিল ভগবানের প্রতি একান্ত আপন ভাব। শিশুসন্তানকে ক্ষুধার্ত দেখলে তার মা যে ভাব নিয়ে তাকে খাওয়ান, তার থেকেও গভীর ভাব ছিল বিদুরানির মধ্যে। এইরকম ভাবেই ভগবানকে আপন করে নিতে হয়। সেজন্য বাঁচা মরার তোয়াক্কাও করতে নেই। কাউকে ভয় করতে নেই। কাউকে খোশামোদ করারও দরকার নেই। শুধুমাত্র একটি ভাবই ধরে রাখা প্রয়োজন যে, **'মেরে তো গিরধর গোপাল, দুসরো ন কোঈ'**। যদি এইটি কারোর ধারণা হয়ে যায় তো সে কৃতার্থ হয়ে যাবে। কিন্তু অনেক অর্থ রোজগার করলে বা বিলাসী শৌখিনতায় থাকলে কিংবা খুব নাম-যশ হলেও সে সব কোন কাজেই লাগবে না—

সপনা-সা হো জাবসী, সুত কুটুম্ব ধন ধাম,
হো সচেত বলদেব নীঁদসে, জপ ঈশ্বরকা নাম।
মনুষ্য তন ফির ফির নহিঁ হোঈ,
কিয়া শুভ কর্ম নহিঁ কোঈ,
উম্র সব গফলতমেঁ খোঈ।

আজ এখনই ভগবানের হয়ে যেতে হবে। অন্য কে কোথায় কী করছে ভগবান জানেন, আমার কোন প্রয়োজন নেই। সমগ্র জগৎও যদি বিরুদ্ধে যায়, তাতেও পরোয়া করি না, কিন্তু ভগবান আমার—এই ভাবটি কিছুতেই ছাড়তে পারা যাবে না। মীরাবাঈ যখন দেখলেন যে তাঁর পক্ষে ভগবানের থেকে দূরে থাকা আর সম্ভব নয়—**'মিল বিছুড়ন মত কীজৈ'** তখন তাঁর পার্থিব শরীর পর্যন্ত আলাদা থাকেনি, ভগবানের সঙ্গে মিশে গেছিল। একমাত্র ভগবান ব্যতীত কোন কিছুর প্রতিই তাঁর লক্ষ্য ছিল না।

অন্তহুঁ তোহিঁ তজেঁগে পামর ! তূ ন তজৈ অবহী তে।

(বিনয় পত্রিকা ১৯৮)

'অন্তিমকালে সবই তোমাকে ত্যাগ করে যাবে। তোমার কোন কিছুই থাকবে না, তাহলে আগে থেকেই সেগুলিকে ত্যাগ করো।'

সাধু বিচারকর ভলী সমঝ্য়া, দিবী জগত কো পূঠ।
পীছে দেখী বিগড়তী, পহলে বৈঠা রূঠ॥

পরে তো সবই বেঁকে বসবে, তাহলে নিজের কাজও নষ্ট হলো আর হাতেও কিছু ঠেকলো না, এতে কী লাভ ? অতএব এখনই ভগবানের প্রতি শরণাগত হয়ে যাওয়া ভালো। তুমি তোমার, আমি আমার। আমার কেউ নেই। আমিও কারোর নয়, শুধুমাত্র ভগবানই আমার এবং আমি ভগবানের। এইভাব নিয়ে ভগবানের চরণে শরণ নিয়ে মত্ত হয়ে যেতে হয়। কে খুশি হলো, কে অখুশি হলো, কে আপন, কে পর, এসব ভাবারই দরকার নেই। কেউ নিন্দা করল, না প্রশংসা করল, তিরস্কার করল, না পুরস্কার দিল সে তাদের মর্জি। আমার নিন্দা-প্রশংসা, তিরস্কার-পুরস্কার এসবের কোন কিছু নিয়েই আগ্রহ নেই। সবাই খুশি হলেই বা আমার কী আবার বিরোধিতা করলেই বা আমার কী ?

শুধুমাত্র ভগবান আমার—এর থেকে বড় কথা আর কিছুই নেই, তা সে যজ্ঞ, তপস্যা, দান, তীর্থ, বিদ্যা ইত্যাদি যাই হোক না কেন ! এইজন্য ভগবানকেই একমাত্র আপন বলে মেনে নিয়ে সর্বদা প্রসন্ন থাকা উচিত। তখন আর না থাকবে জীবনধারণের ইচ্ছা, না মরণের ইচ্ছা, না জ্ঞান লাভের ইচ্ছা, না স্বাচ্ছন্দ্যের ইচ্ছা। তখন থাকবে শুধুমাত্র এইভাবের তন্ময়তা—'এক ভগবান ছাড়া আমার আর কেউ নেই-ই'। এই ব্রহ্মাণ্ডে সামান্যতম বস্তু পর্যন্ত আমার নিজের নয়। আমার কিছু নেই-ই, কিছু ছিলও না, হবেও না, আমার নিজের বলে কিছু হতেও পারে না। এইকারণে একমাত্র ভগবানকেই আপন বলে স্বীকার করে নিলেই উদ্ধার হয়ে যাবে। **ভগবান ব্যতীত অন্য কোন কিছুকে স্বপ্নে পর্যন্ত নিজের বলে ভাবতে নেই ! কারোর দাসত্বও করার প্রয়োজন নেই**। অন্য কোন কিছুর

সঙ্গে আমার কিসের লেন-দেন ? আমার যারা কুটুম্ব, তাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কতো দিনের ? **'সপনা-সা হো জাবসী, সুত কুটুম্ব ধন ধাম'**। স্বপ্ন তো তবু স্মরণে থাকে, এদের কথা তো স্মরণেও থাকবে না। অপছন্দের স্বপ্নকে যেমন আমরা ভুলে যাই, সেইরকমই সংসারকেও যদি আমরা অপছন্দ করি, তাকে ভুলে যাব। সংসারে এই ব্যক্তি ঠিক বা ওই ব্যক্তি বেঠিক, এইরকম হলে ভালো, বা ওই রকম হলে ভালো নয়—সবই হলো মোহের ভাব। সকল ব্যাধির মূল হলো এই মোহ—**'মোহ সকল ব্যাধিন্হ কর মূলা'** (শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ১২১।১৫)। ঠিক বা বেঠিক যাই হোক আমার কী যায়-আসে। অন্যেরাই আমাকে গরজ করবে, আমার কার কাছে কীসের গরজ ? সংসারের লোকজনের সঙ্গে আমার কীসের প্রয়োজন ? শুধুমাত্র একটি কথাই স্মরণে রাখা প্রয়োজন—**'মেঁরে তো গিরধর গোপাল, দুসরো ন কোঈ'**।

তৃষ্ণা হলে জলপান করো, ক্ষুধা হলে অন্নভোজন করো, ঠাণ্ডা লাগলে উষ্ণ বস্ত্র পরিধান করো, যদি এসব না পাওয়া যায় তো তাই সহ্য করো ; শরীর রইল কী গেল একই কথা, তা নিয়ে কোন ভাবনা নেই। না শরীর থাকা নিয়ে চিন্তা, না শরীর যাওয়া (মরা) নিয়ে চিন্তা। আমার চিন্তা শুধু ভগবানকে নিয়েই। শুধুমাত্র ভগবানই আমার, আমি ভগবানের—এইরকম ভাবনা করে নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে হয়, স্ফূর্তিতে থাকতে হয়। আহা ! এবার আপন-জনকে জানতে পারলাম ! আর চিন্তা নেই। আর আমি কারোর দাসত্ব করবো না—

ঊর্ধ্বে-নিম্নে, বাইরে-ভেতরে সর্বত্র পরমাত্মা বিরাজমান—

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। (গীতা ১৩।১৫)

যচ্চ কিঞ্চিজ্জগত্যস্মিন্দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্বং ব্যাপ্ত নারায়ণঃ স্থিত॥

(মহানারায়ণোপনিষদ্ ১১।৬)

এই পরমাত্মা নিকটের থেকেও নিকটে, দূরের থেকেও দূরে, বাইরের

থেকেও বাইরে এবং ভেতরের থেকেও ভেতরে বিদ্যমান। একমাত্র পরমাত্মাই আছেন এবং তিনিই নিজের—এইরকম ধারণা করে নিশ্চিন্ত, প্রসন্ন থাকতে হয়। যে আসে সেও পরমাত্মা, যে যায় সেও পরমাত্মা। যে ভালোবাসে সে পরমাত্মা, যে শত্রুতা করে সেও পরমাত্মা। যে যাই করুক সে পরমাত্মাই। সেই পরমাত্মাকে ব্যাকুল হয়ে ডাকতে হয়, ‘হে নাথ ! হে আমার প্রভু ! আমি যেন তোমাকে কখনো ভুলে না যাই।’ তাহলে জীবন সার্থক হয়ে যাবে। এটা কত বড় কথা। কতো দামী কথা ! কত খাঁটি কথা। কত নির্মল কথা ! কে কী করছে দেখতে নেই, ও সব দেখে লাভ কী ?

তেরে ভাবৈ কছু করৌ, ভলো বুরো সংসার।
‘নারায়ন’ তু বৈঠি কে, অপনৌ ভবন বুহার॥

আমার লক্ষ্য শুধু ভগবান। আমি ভালো হলেও তাঁর, মন্দ হলেও তাঁর—

জৌ হম ভলে বুরে তৌ তেরে।
তুম্হেঁ হমারী লাজ-বড়াঈ, বিনতী সুনি প্রভু মেরে॥

(সূরবিনয় পত্রিকা ২৩৬)

জগতে তো একটুকরো খড় পর্যন্ত আমার থাকবে না, থাকতে পারে না, থাকার নয়। আমার নিজেরই নয়, তাহলে আমার থাকবে কী করে ? জগৎ তো প্রতিক্ষণেই আমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। জন্মগ্রহণের পর যত বছর কেটে গেছে, তত বছর তো আমি মরেই গেছি অর্থাৎ আমার আয়ুর সেই জীবনকাল শেষ হয়ে গেছে। বাকি যা বেঁচে আছে তাও একদিন শেষ হয়ে যাবে। এক ভগবান ব্যতীত আমার কেউ নেই। এইজন্য ভগবানকে ব্যাকুল হয়ে ডাকতে হয়—‘হে প্রভু ! হে আমার ঠাকুর ! আমার কেউ নেই, শুধুমাত্র তুমিই আমার, আর কেউই আমার নয়।’ তারপর তন্ময় হয়ে মত্ত হয়ে যাও, পরম তৃপ্তিতে থাকতে পারবে। ‘আমার তো ভগবান আছেন’—এই কথাটিকে নিয়ে নিশ্চিন্তে নৃত্য করো, লাফাতে থাক, এইভাব নিয়ে যে, আর আমার কিছু করার

নেই, কাজ শেষ। ভগবানের চরণে সব অর্পণ করে দাও। স্বপ্নেও আর কারোর দাসত্ব কোরো না। অন্তর থেকেই দাসত্বের ভাব দূর করে দাও। আজ আমার আসল কাজ সম্পন্ন হলো এই বলে নৃত্য করো। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, 'আরে তুমি কী এমন পেয়েছ ?' তাহলে তাকে উত্তর দাও যে, 'যা পাওয়ার তাই পেয়েছি।' এই পরমাত্মা তো স্বাভাবিক ভাবেই সবারই প্রাপ্ত আছেন, সকলের অন্তরে তিনি বিরাজমান। তিনিই আমার আপন। আর কাউকে নিয়ে আমার কোন আগ্রহ নেই, প্রয়োজন নেই, কারোরই জন্য কোন গরজ নেই। কেউ খুশি হলে ভালো কথা, অসন্তুষ্ট হলেও ভালো কথা। আমি কাউকে দুঃখ দিই না, কারোর বিরুদ্ধে কিছু করি না, স্বপ্নেও কারোর অকল্যাণ চাই না, তবুও কেউ যদি খুশি বা অসন্তুষ্ট হয় তবে সেটি তার নিজের ব্যাপার। এতে আমার কিছু যায়-আসে না।

ভগবান আমার—এর সমান কথা আর হয়নি, হবে না, হতেও পারে না—এই কথাটি যদি কেউ ঠিক ঠিক বুঝতে পারে তো সে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে। এতকাল অন্যের দাসত্ব করে শুধু দুঃখই পেয়েছি। তাই আমি সবাইকে প্রণাম করি। সবাই ভালো, কিন্তু আমার তাদের কোন প্রয়োজন নেই। আমার শুধু ভগবানকেই প্রয়োজন। কিন্তু তাঁর কাছ থেকেও আমি কিছু চাই না, কোন আর্জি করি না।

ঢূঁড়া সব জহাঁ মেঁ, পায়া পতা তেরা নহীঁ।
জব পতা তেরা লগা, অব পতা মেরা নহীঁ॥

বস্তুত আমি তো নেই-ই, কেবল তুমিই আছো। ছোট বড়, ভালো-মন্দ সবই তুমি, শুধু তুমি। এখন আমার প্রকৃত বস্তুর প্রাপ্তি হয়েছে। আজ বুঝেছি যে শুধু তুমিই আছো, আমি নেই-ই। **না আছি আমি, না আমার কিছু আছে। তুমিই আছো, সবই তোমার।** এখন শুধু আনন্দ আর আনন্দ ! পূর্ণ আনন্দ, অপার আনন্দ, সম আনন্দ, শান্ত আনন্দ, ঘন আনন্দ, অচল আনন্দ, অন্তরে আনন্দ, বাইরে আনন্দ, সর্বত্র শুধু আনন্দ আর আনন্দ।'

~~~0~~~
~~~

তুমি কেবল তুমি-ই

(১)

উপনিষদে বলা হয়েছে যে শুরুতে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎ-ই বিদ্যমান ছিল —**'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্'** (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৬।২।১)। সেই এক সৎস্বরূপ পরমাত্মাতত্ত্ব-ই এক থেকে অনেক রূপ হয়েছেন—

(১) **সদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি।**

(ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৬।২।৩)

(২) **সোহকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি।**

(তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২।৬)

(৩) **একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা য়ঃ করোতি।**

(কঠোপনিষদ্ ২।২।১২)

এক থেকে অনেক হলেও তিনি সেই একই, তাঁর মধ্যে অনেকত্ব আসেনি—

(১) **'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'**

(বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৪।১৯, কঠোপনিষদ্ ২।১।১১)

(২) **'একোহপি সন্ বহুধা যো বিভাতি'**

(গোপালপূর্বতাপনীয়োপনিষদ্)

(৩) **'যৎসাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম'**

(বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৩।৪।১)

(৪) **'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'**

(ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৩।১৪।১)

(৫) **'ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদম্'**

(মুণ্ডকোপনিষদ্ ২।২।১১)

এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মাকে ভগবান বলেছেন—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥ (২।৯।৩২)

'সৃষ্টির প্রথমেও আমিই ছিলাম, আমা হতে ভিন্ন কিছুই ছিল না। সৃষ্টি হয়ে যাবার পর এই যা কিছু দৃশ্যমান সেসব আমিই। যা সৎ, অসৎ এবং তার অতীত, সেই সবই আমি। সৃষ্টির পরেও আমি এবং এই সব কিছুর বিনাশ হয়ে যাবার পরেও যা কিছু অবশিষ্ট থাকে সেই সবই আমি।'

গীতাতে ভগবান বলেছেন—

(১) **অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্ত এব চ॥** (১০।২০)

'সকল প্রাণীর আদিতেও আমি, মধ্যতেও আমি এবং অন্তিমেও আমি।'

(২) **সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জুন।** (১০।৩২)

'সকল সৃষ্টির আদিতেও আমি, মধ্যেও আমি এবং অন্তিমেও আমি।'

(৩) **'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি'** (৭ ।৭)

'আমি ছাড়া এই জগতের অন্য কিছু কিঞ্চিৎমাত্রও কারণ তথা কার্য নেই।'

(৪) **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (৭।১৯)

'সব কিছু পরমাত্মাই।'

(৫) **'সদসচ্চাহমর্জুন'** (৭।১৯)

'সৎ এবং অ-সৎ আমিই।'

(৬) **ন তদস্তি বিনা যৎস্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥** (১০।৩৯)

'আমি ছাড়া কোন চর-অচর প্রাণী নেই অর্থাৎ চর-অচর সব কিছু আমিই।'

সাধুরাও তাঁদের অনুভূতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—

(১) **তূ তূ করতা তূ ভয়া, মুঝমেঁ রহী ন হূঁ।**
বারী ফেরী বলি গঈ, জিত দেখূঁ তিত তূ॥

(২) **সব জগ ঈশ্বর-রূপ হৈ, ভলো বুরো নহিঁ কোয়।**
জৈসী জাকী ভাবনা, তৈসো হী ফল হোয়॥

(৩) **সো অনন্য জাকেঁ অসি মতি ন টরই হনুমন্ত।**
মৈঁ সেবক সচরাচর রূপ স্বামি ভগবন্ত॥

(শ্রীরামচরিতমানস, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৩)

(৪) **নিজ প্রভুময় দেখহিঁ জগত কেহি সন করহিঁ বিরোধ॥**

(শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ১১২ খ)

(৫) **জড় চেতন জগ জীব যত সকল রামময় জানি।**

(শ্রীরামচরিতমানস, বালকাণ্ড ৭ গ)

(২)

গীতাতে ভগবান বলেছেন যে তাঁর দুটি প্রকৃতি—অপরা এবং পরা। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার—এই আট প্রকারে বিভক্ত প্রকৃতি হলো ভগবানের অপরা প্রকৃতি এবং জীবরূপী আত্মা হলো 'পরা প্রকৃতি'[১]। পরা এবং অপরা—এই দুটি হলো ভগবানের প্রকৃতি অর্থাৎ শক্তি। **শক্তিমান ছাড়া শক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না।** এজন্য ভগবানের শক্তি হওয়ায় এই দুটি (অপরা এবং পরা) ভগবান থেকে অভিন্ন। যেমন মানুষ তার শক্তিকে (বল) নিজের থেকে আলাদা করে দেখাতে পারে না, তেমনই অপরা এবং পরাকে ভগবান থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। তাৎপর্য হলো এই যে, **অপরা এবং পরা—দুটি প্রকৃতি ভগবান থেকে অভিন্ন হওয়ার কারণে তারা ভগবানেরই স্বরূপ।**

---

[১]ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥

(গীতা ৭।৪-৫)

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তিনটি লোক, চোদ্দটি ভুবন, জড়-চেতন, স্থাবর-জঙ্গম, স্থলচর-জলচর-নভশ্চর, জরায়ুজ-অণ্ডজ-স্বেদজ-উদ্ভিজ্জ, সাত্ত্বিক-রাজসিক-তামসিক, মনুষ্য, দেবতা, পূর্বপুরুষ, গন্ধর্ব, পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, ভূত-প্রেত-পিশাচ, ব্রহ্মরাক্ষস প্রভৃতি যা কিছু দেখতে, শুনতে, পড়তে, চিন্তা করতে তথা কল্পনা করতে পারা যায় সেগুলিতে 'অপরা' এবং 'পরা'—এই দুটি প্রকৃতি ছাড়া অন্য কিছু নেই। যা দেখা, শোনা, পড়া, মনন তথা কল্পনা করা যায় এবং যে শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি-অহং-এর দ্বারা দেখা, শোনা, পড়া, চিন্তা করা তথা কল্পনা করা যায় সেই সবই হলো 'অপরা'। কিন্তু যে দেখে, শোনে, পড়ে, চিন্তা করে এবং কল্পনা করে সে হলো 'পরা'। যত রকম শরীর সেই সবই 'অপরা'-র অন্তর্গত এবং যত রকম জীব আছে সেগুলি সবই 'পরা'র অন্তর্গত। অতএব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভেতরে এবং বাইরে তথা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের রূপে আটটি অপরা, একটি পরা এবং এক ভগবান—এই দশটি ছাড়া আর কিছু নেই অর্থাৎ এক ভগবান ছাড়া কোথাও কিছু নেই।

অপরা প্রকৃতিকে আমি, আমার এবং আমার জন্য মেনে নেওয়াতেই জীবের দৃষ্টিতে অপরা (জগৎ), পরা (জীব) এবং পরমাত্মা—এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র পরমাত্মা রয়েছেন, 'প্রকৃতি' বলে কিছুই নেই। প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি দিলে তবেই প্রকৃতি থাকে। দৃষ্টি না দিলে প্রকৃতি থাকেই না। দ্রষ্টাও দৃশ্যের সম্বন্ধে থাকে, সাক্ষীও সাক্ষ্যের সম্বন্ধে বিদ্যমান। **যখন আমরা নিজেদেরকে শরীর বলে মনে করি তখন ভগবান আমাদের কাছে সংসার বলে প্রতীয়মান হন**। অর্থাৎ ভগবান আমাদের কাছে সংসার রূপে পরিদৃশ্যমান হন। যখন অপরা এবং পরা—দুটি প্রকৃতিই ভগবানের তাহলে তার মধ্যে আমি-তুমির ভেদ কীকরে হতে পারে ?

যদি আমরা নিজেদের দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে আমরা অপরা এবং পরা ছাড়া আর কিছু নই। আমাদের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং

অহং— এই সবই অপরা এবং আমরা স্বয়ং জীবরূপে পরা। পরা-অপরা দুটিই ভগবানের প্রকৃতি। তাহলে কেবল ভগবানই থাকলেন ! আমাদের স্বতন্ত্র সত্তা থাকল না। 'আমি'—এই বলে কিছুই থাকল না।

প্রকৃতি এবং প্রকৃতিবিশিষ্ট (শক্তি এবং শক্তিমান) এক হয়েও দুটি এবং দুটি হয়েও এক। একই অনেক রূপে দৃষ্ট হয় এবং অনেকরূপে দৃষ্ট হলেও তিনি এক। ভগবান বলেছেন—

মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতেঽন্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ।
অহমেব ন মত্তোঽন্যদিতি বুধ্যধ্বমঞ্জসা॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৩।২৪)

'মন, বাণী, দৃষ্টি তথা অন্য সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা কিছু (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি) গ্রহণ করা যায় সেই সবই আমি। অতএব আমি ছাড়া আর কিছু নেই—এই সিদ্ধান্ত আপনারা চিন্তাপূর্বক বুঝে নিন অর্থাৎ স্বীকার করে নিন।'

আত্মৈব তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ।
ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বর॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৮।৬)

'যা কিছু প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ বস্তু আছে তা সর্বশক্তিমান পরমাত্মাই। সেই পরমাত্মাই বিশ্ব সৃষ্টি করেন এবং তিনিই বিশ্ব। তিনিই বিশ্বের রক্ষক এবং তিনিই রক্ষিত। সেই সর্বাত্মা ভগবানই বিশ্বকে সংহার করেন আর যার সংহার হয় সেই বিশ্বও তিনি।'

তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে—

অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদোঽহমন্নাদোঽহমন্নাদঃ। (৩।১০।৬)

'অন্নও আমিই এবং অন্নকে ভক্ষণকারীও আমিই।'

সংসারকে স্বীকৃতি দিয়ে তাকে নিজের বলে মেনে নেওয়ায় এবং তার প্রয়োজন অনুভব করায় মানুষ পরমাত্মাকে দূরস্থ, ভেদসম্পন্ন এবং ভিন্ন দেখে। তাই **সাধকের উচিত ভগবানকে নিজের মনে করা এবং তাঁর প্রয়োজন অনুভব করা**। এই দুটি কথা পালন করলেই সাধকের

সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে এবং পরমাত্মার সঙ্গে তাঁর সামীপ্য, অভেদ এবং অভিন্নতা অনুভূত হবে। তাৎপর্য হলো এই যে, **সাধক যতক্ষণ পরমাত্মা ছাড়া অন্য কিছুর সত্তা মেনে নেন ততক্ষণ তাঁর পরমাত্মা থেকে দূরত্ব, বিভেদ এবং ভিন্নতা বজায় থাকে।** এক পরমাত্মা ছাড়া আর কিছুই নেই—এই বাস্তবতা অনুভূত হয়ে গেলে দূরত্বের, বিভেদের এবং ভিন্নতার অবসান হয়ে যায় এবং সাধক সাধ্যে লীন হয়ে যান।

(৩)

সব কিছু ভগবানই—এইটি হলো গীতার সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত এবং যিনি এটি উপলব্ধি করেন ভগবান তাঁকে অত্যন্ত দুর্লভ মহাত্মা বলেছেন—

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ (গীতা ৭।১৯)

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান বলেছেন—

অয়ং হি সর্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম।
মদ্ভাবঃ সর্বভূতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ॥ (১১।২৯।১৯)

'আমাকে পাওয়ার যত সাধন আছে সেগুলির মধ্যে সকল প্রাণী ও পদার্থে মন, বাণী তথা শরীরের দ্বারা আচরণে আমারই ভাব পোষণ করা—এটিকে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন বলে মান্য করি।'

এই কথাটিকে বোঝার জন্য উপনিষদে তিনটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে— সোনার, লোহার এবং মাটির। যথা, সোনার অনেক অলংকার হয়। সেই অলংকারগুলির আকৃতি, নাম, রূপ, ওজন, ব্যবহার, মূল্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন হলেও তাতে একই সোনা থাকে। লোহার অনেক অস্ত্র হয়ে থাকে, কিন্তু তাতে একই লোহা থাকে। মাটির অনেক বাসন হয়ে থাকে কিন্তু সেগুলিতে সেই একই মাটি থাকে। সেইরকম ভগবান থেকে উৎপন্ন অনেক প্রাণী, পদার্থ প্রভৃতি থাকলেও সেগুলিতে সেই এক ভগবানই থাকেন।

সোনা দিয়ে প্রস্তুত অলংকারে সোনাকে প্রত্যক্ষ দেখা যায়, লোহা

দিয়ে প্রস্তুত অস্ত্রে লোহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়, মাটি দিয়ে তৈরি বাসনে মাটি প্রত্যক্ষ দেখা যায়। কিন্তু পরমাত্মার সৃষ্ট এই সংসারে পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ দেখা যায় না। এজন্য সব কিছু পরমাত্মাই—এই কথা বোঝাতে গমের ক্ষেতের দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে।

কৃষকেরা গমের গাছে পরিপূর্ণ সবুজ চাষকে গমই বলে। গোরু গমের গাছ খেয়ে ফেললে তারা বলে যে তোমার গোরু আমার গম খেয়ে গেছে, যদিও গোরু গমের একটি দানাও খায়নি। জমিতে গমের একটিও দানা উদ্গম না হলেও সেটি যে গম তাতে কৃষকদের কোন সংশয় থাকে না। শহরে বসবাসকারী কোন ব্যবসায়ী তাকে গমের চাষ বলে মানবে না। সে বলবে 'এতো ঘাস, গম কী করে হলো ? আমি বস্তা বস্তা গম কিনেছি এবং বিক্রি করেছি, আমি জানি গম কী রকম !' কিন্তু কৃষকেরা বলবে যে এতো সেই ঘাস নয় যা পশুরা খায়, এতো গম। কেননা আরম্ভে এটি বীজ রূপে গমই ছিল এবং শেষকালে এতে গমেরই উদ্গম হবে। অতএব মধ্যবর্তী সময়ে এটি গমই। যেটি প্রারম্ভে এবং শেষকালে থাকে মধ্যবর্তী সময়েও সেইটিই থাকে—এইটি হলো সিদ্ধান্ত—'**যস্তু যস্যাদিরন্তশ্চ স বৈ মধ্যং চ তস্য সন্** ।' (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৪।১৭)

ভগবান হলেন সমগ্র সৃষ্টির আদি বীজ—

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎস্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥ (গীতা ১০।৩৯)

'হে অর্জুন ! সকল প্রাণীর যা বীজ (মূল কারণ) সেই বীজ হলাম আমি ; কেননা আমি ছাড়া চর-অচর কোন প্রাণী নেই অর্থাৎ চর-অচর সবই আমি।'

সাংসারিক বীজ তো গাছ থেকে জন্মায় আবার গাছকে জন্ম দিয়ে সেটি নিজে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ভগবান সৃষ্ট হন না এবং অনন্ত সৃষ্টিকে জন্ম দিয়েও যেমনকার তেমন থাকেন। এজন্য ভগবান নিজেকে 'সনাতন' এবং 'অব্যয়' বীজ বলে জানিয়েছেন—

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্। (গীতা ৭।১০)

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ (গীতা ৯।১৮)

আমের বাগানে যদি একটাও ফল না থাকে তাহলেও তাকে আম বাগানই বলা হয়। তার কারণ আগে আমের বীজ ছিল, পরে তা থেকে গাছ জন্মেছে এবং শেষে তাতে আমই বার হবে। তাই মাঝখানের সময়ে সেটিকে আমের বাগানই বলা হয়। লৌকিক বীজ থেকে তো এক রকম চাষই হয়ে থাকে—যেমন গমের বীজ থেকে গমই উৎপন্ন হয়। ধানের বীজ থেকে ধান, ভুট্টা থেকে ভুট্টাই উৎপন্ন হয়, আম থেকে আমই উৎপন্ন হয় প্রভৃতি। সবগুলির বীজ আলাদা আলাদা, কিন্তু ভগবানরূপী বীজের বৈশিষ্ট্য এই যে, সেই একই বীজ থেকে অনন্ত ভেদবিশিষ্ট সৃষ্টি উৎপন্ন হয়—

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি য়াঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥

(গীতা ১৪।৪)

'হে কুন্তীনন্দন ! সমস্ত যোনিতে প্রাণীদের যত শরীরের জন্ম হয় সেই সবগুলির মূল প্রকৃতি হলো মা আর আমি হলাম বীজ স্থাপনকারী পিতা।'

সৃষ্টির প্রারম্ভেও পরমাত্মা ছিলেন—'**সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্**' (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৬।২।১) এবং শেষেও পরমাত্মাই থাকবেন—'**শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ**' (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩।২৫), তাহলে মধ্যকালে অন্য কিছু কেমন করে আসবে ? সোনার গহনায় সোনা দেখা যায় আর গমের চাষে গম দেখতে পাওয়া যায় না—এর তাৎপর্য দেখা বা না দেখায় নেই, তা আছে তত্ত্বকে জানার মধ্যে। সবগুলি দৃষ্টান্তের তাৎপর্য হলো এই যে তত্ত্ব একই—তা দৃষ্ট হোক বা নাই হোক। ভগবান বলেছেন—

অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন॥ (গীতা ৯।১৯)

অমৃত ভগবানের স্বরূপ, মৃত্যুও ভগবানের স্বরূপ। সৎও ভগবানের স্বরূপ, অসৎ-ও ভগবানের স্বরূপ। সুন্দর ফুল প্রস্ফুটিত হয়েছে, সুগন্ধ

আসছে, তাও ভগবানের স্বরূপ এবং মাংস, হাড়, ময়লা পড়ে আছে, দুর্গন্ধ আসছে তাও ভগবানের স্বরূপ। ভগবান রাম, কৃষ্ণ আদি রূপও ধারণ করেছেন আবার মৎস্য, কচ্ছপ, বরাহ আদি রূপও ধারণ করেছেন। তিনি যে রূপই ধারণ করুন না কেন—তিনি তো ভগবানই। তিনি যে-কোন রূপেই আসতে পারেন, সে তাঁর ইচ্ছা। তিনি কেমন রূপ ধারণ করবেন, সেটি তাঁরই ইচ্ছা। তিনি যেমন রূপ ধারণ করেন তেমনই লীলা করেন। বরাহ (শূকর)-এর রূপ ধারণ করে তিনি বরাহের মতো লীলা করেছেন, মানুষের রূপ ধারণ করে তিনি মানুষের মতো লীলা করেছেন। নরসিংহ রূপ ধারণ করে তিনি প্রহ্লাদকে লেহন করেন।

উতঙ্ক ঋষিকে ভগবান বলেছেন—

ধর্মসংরক্ষণার্থায় ধর্মসংস্থাপনায় চ।
তৈস্তৈর্বেষৈশ্চ রূপৈশ্চ ত্রিষু লোকেষু ভার্গব॥

(মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব, ৫৪।১৩-১৪)

'আমি ধর্মকে রক্ষা এবং স্থাপনার জন্য তিনটি লোকে বহু প্রজাতিতে (যোনিতে) অবতার রূপ ধারণ করে সেইসব রূপ ও বেশ অনুসারে আচরণ করি।'

ভগবান সত্যযুগে সত্যযুগের লীলা করেন, কলিযুগে কলিযুগের লীলা করেন। কাউকে যদি পাপ, অন্যায় করতে দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে যে, ভগবান কলিযুগের লীলা করছেন। তিনি যে কোন রূপ ধারণ করুন, যা কিছু লীলা করুন আমাদের দৃষ্টি তাঁকে ছেড়ে অন্যত্র যাওয়া উচিত নয়। ভগবান বলেছেন—

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ (গীতা ৬।৩০)

'যিনি সব কিছুর মধ্যে আমাকে দেখেন এবং আমার মধ্যে সকলকে দেখেন, তাঁর কাছে আমি অদৃশ্য থাকি না এবং তিনিও আমার কাছে অদৃশ্য হন না।'

যেমন, সব জায়গায় যদি বরফই পড়ে থাকে তাহলে বরফ কেমন

করে অদৃশ্য থাকবে ? বরফের পিছনে বরফ রাখলে বরফই দেখা যাবে ! তেমনই যখন সকল রূপে ভগবানই বিদ্যমান তখন ভগবান কেমন করে গোপন থাকবেন ? কোথায় লুকিয়ে থাকবেন ? কার পিছনে লুকোবেন ? তাৎপর্য হলো এক ভগবানই সর্বত্র বিদ্যমান। সেই পরমাত্মায় না আমি আছি, না আছ তুমি। না এটি আছে, না সে আছে। ভূতও নেই, ভবিষ্যৎও নেই, বর্তমানও নেই। সর্গ-মহাসর্গ নেই, প্রলয়-মহাপ্রলয় নেই। দেবতা, মানুষ, রাক্ষস নেই। পশু-পক্ষী নেই। প্রেত-পিশাচ নেই, জড়ও নেই, চেতনও নেই। স্থাবর-জঙ্গম নেই। এক পরমাত্মা ছাড়া আর কিছুই নেই। সেই একই অনেক রূপে পরিণত হয়েছেন। সেই একই অনেক রূপে প্রভাসিত হচ্ছেন।

(৪)

সব কিছু ভগবান—এটি দৃষ্ট হোক বা না হোক, বুঝতে পারি কিংবা না পারি, আমাদের অনুভবে আসুক বা নাই আসুক, আমরা যেন দৃঢ়তার সঙ্গে এই কথা স্বীকার করে নিই যে এই কথাটিই সত্য। যদি **কিছু ন্যূনতা থাকে তো তা আমাদের মান্যতা অর্থাৎ ধারণাতে আছে, বাস্তবিকতায় কোন ঘাটতি নেই**। সব কিছুই ভগবান—এটি উপলব্ধি করার জন্য কোন ক্রিয়া বা কোন বস্তুর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন কেবল ভাবের। আমাদের কেবল ভাবনাকে বদলাতে হবে। **সাধকের দৃষ্টি যখন অন্তর্মুখী হবে তখন তাঁর কাছে এক ভগবান ছাড়া আর কিছুই নেই আর যখন তাঁর দৃষ্টি বহির্মুখী হবে তখন যা দৃশ্যজগৎ তা সবই ভগবানের লীলা !**

ভগবানের অপরা প্রকৃতির সম্মুখ হওয়াতেই আমরা ভগবান থেকে বিমুখ হয়ে গিয়েছি। আমরা যদি অপরার প্রতি বিমুখ হয়ে যাই আর অপরা প্রকৃতির যিনি প্রভু সেই ভগবানের সম্মুখ হয়ে যাই তাহলে বাস্তবিকতার অনুভূতি হয়ে যাবে—**'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।'** (গীতা ৭।১৪)।

ভগবান বলেছেন—

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ (গীতা ৭।১২)

'যত সাত্ত্বিক ভাব আছে, রাজসিক এবং তামসিক ভাব আছে সেগুলি সবই আমার মধ্যে থাকে—এমনটি বুঝে নাও। কিন্তু আমি সেগুলির মধ্যে নেই এবং সেগুলি আমার মধ্যে নেই।'

'ন ত্বহং তেষু তে ময়ি' বলার তাৎপর্য হলো যে তুমি গুণের মধ্যে জড়াবে না। ভগবান তো সব কিছুর মধ্যেই আছেন। তিনি গুণের মধ্যেও আছেন। কিন্তু গুণের মধ্যে আসক্ত হলে আমরা তাঁর থেকে দূরে সরে যাই। আমরা যদি ভগবানকে সত্তা এবং গুরুত্ব না দিয়ে গুণকে সত্তা এবং গুরুত্ব প্রদান করি তাহলে আমরা জন্মাতে-মরতে থাকব—**'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু'** (গীতা ১৩।২১)। যেমন, গমের চাষে গমই প্রধান, পাতা-ডাল নয়। গমের গাছের শিকড় হলো তামসিক, ডাল হলো রাজসিক, মাটি হলো সাত্ত্বিক এবং গম (দানা) হলো গুণাতীত। কেবল গম পাওয়াই হলো কৃষকের উদ্দেশ্য। গম পাবার জন্যই সে সব রকম পরিশ্রম করে, জমিতে জল-সার ইত্যাদি দেয়, গম পেয়ে যাওয়ার পর তার ডাল-পাতা নিয়ে কোন ভাবনা থাকে না। কেননা তার দৃষ্টিতে ডাল-পাতার কোন গুরুত্ব নেই। তেমনই সাধকের উদ্দেশ্য হলো কেবল ভগবানকে লাভ করা ; সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক এই গুণগুলিকে পাওয়া নয়। যেমন গম উদ্গত হওয়ার পর ডাল-পালার কোন প্রয়োজন কৃষকের থাকে না তেমনই ভগবানের দ্বারা সৃষ্ট হলেও সাধকের সাত্ত্বিক-রাজসিক-তামসিক গুণাদির কোন প্রয়োজন থাকে না।

যেমন, শিশু মাটির খেলনা চাইলে বাবা পয়সা খরচ করে তার জন্য মাটির খেলনা কিনে দেন তেমনই **আমরা সংসারকে চাইলে ভগবান সংসাররূপে আমাদের সামনে এসে যান**। আমরা শরীর হয়ে গেলে ভগবান বিশ্ব হয়ে যান। নিজেকে শরীর মনে করলে শুধু জগৎ নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়। জগতের পরেও কিছু আছে, সেদিকে লক্ষ্য থাকে

না—এইটিই হলো নিয়ম।

সব কিছুই ভগবান—তা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না, বরং নিজের দ্বারা তাকে স্বীকার করে নিতে হবে। স্বীকার করলেই আমাদের দৃষ্টি বদলে যাবে। সৃষ্টি আছে দৃষ্টির মধ্যে। আমাদের দৃষ্টি যদি পরিবর্তিত হয় তাহলে সমগ্র সৃষ্টিই পরিবর্তিত হয়ে যাবে। সেজন্য নিজেদের দৃষ্টি এমন পরিবর্তন করে নাও যাতে সবকিছুতে ভগবানই দৃষ্ট হন। **এটিই প্রকৃত আস্তিকতা**।

ভক্তবর ধ্রুব বলেছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
ভূতাদিরাদিপ্রকৃতির্যস্য রূপং নতোঽস্মি তম্॥

(বিষ্ণুপুরাণ ১।১২।৫১)

'পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহংকার এবং মূল প্রকৃতি—এইসব যাঁর রূপ সেই ভগবানকে আমি নমস্কার করি।'

যদি আমাদের মধ্যে রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে 'সব কিছুই ভগবান' এটি আমরা শুধু বুদ্ধির দ্বারা শিখেছি, আত্মবোধে স্বীকার করিনি। **বুদ্ধির দ্বারা শিখলে কল্যাণ হয় না, বোধের দ্বারা স্বীকার করলেই কল্যাণ হয়**। যখন সব কিছুই ভগবান তাহলে রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ কে করবে আর কার উপরেই বা করবে ?

নিজ প্রভুময় দেখহিঁ জগত কেহি সন করহিঁ বিরোধ॥

(শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড, ১১২ খ)

(৫)

শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির দ্বারা যা কিছু সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব, ক্রিয়া, পদার্থ প্রভৃতি গ্রহণ করা হয় সেগুলি সবই ভগবান। মনের স্ফুরণও হলো ভগবান। সংসারে ভাল-খারাপ, শুদ্ধ-অশুদ্ধ, শত্রু-মিত্র, দুষ্ট-সজ্জন, পাপাত্মা-পুণ্যাত্মা প্রভৃতি যা কিছু দেখতে, শুনতে, বলতে, চিন্তা করতে, বুঝতে পারা যায় সেই সবকিছু

কেবল ভগবানই। শরীর-শরীরী, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ, অপরা-পরা, ক্ষর-অক্ষর প্রভৃতি সবই ভগবান। যখন সব কিছুই ভগবান তাহলে তাতে 'আমি' কোথা থেকে আসবে ? 'আমি' নই কেবল 'তুমি'ই আছেন—

তূ তূ করতা তূ ভয়া, মুঝমেঁ রহী ন হূঁ।
বারী ফেরী বলি গঙ্গ, জিত দেখূঁ তিত তূ॥

তাহলে ভগবানকে পেতে কীসের দেরী ? ভগবৎপ্রাপ্তি সঙ্গে সঙ্গে হওয়ার বিষয়। ধরুন আমরা একটি নদীকে দেখছি। কোন বিজ্ঞ লোক আমাদের বললেন যে, এই নদী হলো গঙ্গা। এটি শোনা মাত্র আমাদের ভাবনা, আমাদের দৃষ্টি বদলে গেল। এতে কি কোন সময় লাগল ? কোন পরিশ্রম (চেষ্টা) করতে হলো ? কোন ক্রিয়া এবং বস্তুর প্রয়োজন হলো ? **সব কিছুই ভগবান—এই প্রকৃত কথাকে স্বীকার করবার জন্য কোন বই পড়তে হবে না, ধ্যান করতে হবে না, কোন চিন্তন, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন করতে হবে না ; চোখ, কান, নাক বন্ধ করতে হবে না। জঙ্গল, গুহা, হিমালয়েও যেতে হবে না।** কেবল নিজের সত্তাকে ভিন্ন না ভেবে ভগবানের মধ্যে বিলীন করে দিতে হবে। 'আমি' এবং 'আমার'-কে ত্যাগ করে 'তুমি' এবং 'তোমার'-কে স্বীকার করে নিতে হবে। তারপর 'তোমার'-ও থাকবে না, 'তুমি' কেবল 'তুমি-ই' থাকবে। 'আমি'-র স্থানেও থাকবেন কেবল ভগবান !

সিদ্ধান্তের কথা হলো যে, যে জিনিস সব সময় মজুত থাকে তাকে পাওয়ার জন্য ভবিষ্যতের অপেক্ষা করতে হয় না, আর যে বস্তু সর্বত্র মজুত থাকে তার প্রাপ্তি কোন ক্রিয়া বা পদার্থের দ্বারা হয় না। **কোথাও গেলে যে-পরমাত্মাকে পাওয়া যায়, সেই পরমাত্মাই যেখানে আমরা আছি, সেখানেও পরিপূর্ণরূপে আছেন।** কোথাও যাবার, কোন কিছু বদল করবার প্রয়োজন নেই, শুধু মনের ভাবনা বদল করতে হবে। তাঁকে প্রাপ্তির জন্য প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই, কেবল ইচ্ছাতেই তাঁকে পাওয়া যায়। যিনি কেবল পরমাত্মাকেই পেতে চান, তিনি তাঁকে তখনই

পেয়ে যান। পেতে দেরী তারই হয় যার ইচ্ছার ন্যূনতার জন্য দেরী সহনীয় হয়।

যে জিনিস দূরস্থিত তাকে পাওয়ার জন্য পথ থাকে, যে জিনিস সর্বব্যাপী, সর্বত্র পরিপূর্ণ তাকে পাওয়ার জন্য পথ দরকার হয় না। তার প্রাপ্তি কেবল আকাঙ্ক্ষাতেই হয়। চাওয়া মাত্র কেবল ভগবানকেই পাওয়া যায়, অন্য কোন জিনিস পাওয়া যায় না। পরমাত্মা অদ্বিতীয়, তাই তাঁর জন্য আকাঙ্ক্ষাও অনন্য হতে হবে। চাওয়া মাত্রই সংসারকে পাওয়া যায় না। সংসারকে পাওয়া যায় 'করার' ফলে। পরমাত্মাকে পাওয়া যায় 'না-করায়'।

মূলত সাধকের ভিতর পরমাত্মার প্রতি অনুরাগ থাকা চাই। যদি অন্তরে সংসারকে ভাল লাগে, সংসারের প্রতি আসক্তি থাকে তাহলে পরমাত্মাপ্রাপ্তি হতে পারে না। যেমন, যার মধ্যে জলের পিপাসা থাকে সেই জল চায়, তেমনই যার মধ্যে সংসারের পিপাসা (আসক্তি) থাকে সেই সংসারকে চায়, আর যার মধ্যে পরমাত্মার জন্য পিপাসা সেই পরমাত্মাকে পেয়ে থাকে। পিপাসা যদি না থাকে তাহলে জিনিস সামনে থাকলেও দৃষ্টি তার দিকে যায় না। **পরমাত্মার জন্য যদি পিপাসা থাকে তাহলে জগৎ লুপ্ত হয়ে যায় আর জগতের জন্য যদি পিপাসা থাকে তাহলে পরমাত্মা লুপ্ত হয়ে যান**। যার অন্তরে জগতের জন্য পিপাসা থাকে সে জগতকে নির্মাণ করে নেয়—**'যয়েদং ধার্যতে জগৎ'** (গীতা ৭।৫) আর যাঁর অন্তরে পরমাত্মার জন্য পিপাসা থাকে তিনি পরমাত্মাকে খুঁজে নেন—**'ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যম্'** (গীতা ১৫।৪)। জগতের জন্য পিপাসা থাকলে জগৎ না থাকলেও তা মৃগতৃষ্ণিকার মতো দৃষ্ট হতে থাকে। আর পরমাত্মার জন্য যদি পিপাসা থাকে তাহলে পরমাত্মাকে দেখা না গেলেও তিনি দৃষ্ট হতে থাকেন।পরমাত্মার প্রতি পিপাসা জাগ্রত হলে সাধকের অতীত-কালের কোন চিন্তা থাকে না, ভবিষ্যতের কোন আশা থাকে না এবং বর্তমানে তাঁকে না পাওয়া পর্যন্ত শান্তি থাকে না।

(৬)

অপরা, পরা এবং পরমাত্মা—এই তিনটির মধ্যে অপরা এবং পরা তো জানার বিষয়, কিন্তু পরমাত্মা জানার বিষয় নয়। তা হলো মানার বিষয়। তাঁকে মানা যায়, জানা যায় না। রচনা তার রচয়িতাকে কীকরে জানবে ? কার্য তার কারণকে কীকরে জানতে পারবে ? এইজন্যই ভগবান বলেছেন—

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন॥ (গীতা ৭।২৬)

'হে অর্জুন ! যে সকল প্রাণী অতীত কালে ছিল এবং যে সকল প্রাণী বর্তমানে বিদ্যমান আর যারা ভবিষ্যতে হবে তাদের সবাইকে আমি জানি কিন্তু আমাকে কেউ জানে না।'

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ॥ (গীতা ১০।২)

'আমার প্রকট হওয়া দেবতারাও জানেন না, মহর্ষিরাও জানেন না, কেননা আমি সর্বপ্রকারে দেবতা ও মহর্ষিদের আদি।'

যেমন আমরা মা-বাবাকে জানতে পারি না, কেবল মানতেই পারি ; কেননা জন্ম নেওয়ার সময় আমরা তাঁদের দেখিনি, দেখা সম্ভবই নয়। তেমনই **পরমাত্মাকে আমরা জানতে পারি না, কেবল মানতেই পারি।** মায়ের চেয়েও বাবাকে জানা আরও বেশি অসম্ভব। কেননা মায়ের থেকে জন্ম নেওয়ার সময় আমাদের দেহ তো তৈরি হয়ে যায়, কিন্তু বাবার থেকে সৃষ্ট হওয়ার সময় আমাদের (শরীরের) সত্তা থাকে না। ভগবান সমগ্র সংসারের পিতা—**'অহং বীজপ্রদঃ পিতা'** (গীতা ১৪।৪), **'পিতাহমস্য জগতঃ'** (গীতা ৯।১৭), **'পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য'** (গীতা ১১।৪৩), **'মমৈবাংশো জীবলোকে'** (গীতা ১৫।৭)। এজন্য পরমাত্মাকে কেবল মানা যেতে পারে। তাঁকে জানা একেবারেই অসম্ভব। মা-বাবাকে না মানলে আমাদের সৃষ্টি কী করে সম্ভব ? যদি আমরা আমাদের (শরীরের) সত্তাকে মানি তাহলে মা-

বাবার সত্তাকে মানতেই হবে। তেমনই পরমাত্মার সত্তাকে না মানলে আমাদের সত্তাও সিদ্ধ হয় না। **যদি আমরা আমাদের সত্তাকে (স্থিতিকে) মানি তাহলে পরমাত্মার সত্তাকেও আমাদের মানতে হবে**। কারণ ছাড়া কার্য হবে কীকরে ? পরমাত্মা ছাড়া আমরা এলাম কী করে ? যেমন 'আমি নেই'—এইভাবে কেউ তার নিজের অস্তিত্বকে অস্বীকার বা খণ্ডন করতে পারে না তেমনই 'পরমাত্মা নেই'—এইভাবে পরমাত্মার অস্তিত্বকে কেউ অস্বীকার বা খণ্ডন করতে পারে না।

সব কিছু ভগবানই—এটি কেবল মানাই সম্ভব, জানা যায় না। কেননা এটি বোঝবার বিষয় নয়, বস্তুত বোঝাটাই (বুদ্ধি) হলো এর অন্তর্গত।

(৭)

সব কিছুই ভগবান—এটি উপলব্ধি করার তিনটি ক্রম আছে। সেগুলি যথাক্রমে এই প্রকার—

১. সব কিছু ভগবানেরই।

২. ভগবানই সব কিছু।

৩. ভগবান ছাড়া আর কোন কিছু কখনো হয়নি।

যা কিছু দেখা এবং শোনা যায় সেই সব কিছুই হলো প্রাপ্ত হওয়ার এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিষয়। যেটিকে পাওয়া গিয়েছে সেটি ছেড়ে চলে যাবেই—এতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তিল পরিমাণ কোন জিনিসই আমাদের নয়। যা কিছু দেখা এবং শোনা যায় সেগুলি সবই অপরা প্রকৃতি, সেগুলি ভগবানেরই। ভগবান অপরা প্রকৃতিকেও 'আমার প্রকৃতি' বলেছেন—**'অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা'** (গীতা ৭।৪) এবং পরা প্রকৃতিকেও 'আমার প্রকৃতি' বলেছেন—**'প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্'** (গীতা ৭।৫)। তাহলে কোন্ বস্তুটি আমাদের হলো ? সব কিছুই হলো ভগবানের। অতএব যা কিছু দৃষ্ট হয় সেগুলি আমাদের নয়, ভগবানেরই। এটিকে দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নিলে আমাদের সাধনা শুরু হয়ে যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা প্রাপ্ত বস্তুকে নিজেদের বলে মনে করতে থাকব ততক্ষণ আমাদের সাধনা শুরু হবে না। প্রাপ্ত

বস্তুকে নিজের বলে মানতে থাকলে না বিবেক দৃঢ় হয়, না বিশ্বাস দৃঢ় হয়। এজন্য সাধু, ভক্তেরা কখনো সংসারকে নিজেদের বলে মানেননি, নিজের বলে মেনেছেন কেবল ভগবানকে—**'মেরে তো গিরধর গোপাল, দূসরো ন কোঈ।'** 'আমি'-ও নিজের নয়, তা হলো ভগবানের। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ প্রভৃতি সব ভগবানেরই।

কিছুই আমার নয়, সব কিছু ভগবানের—এই সত্যের স্বীকৃতি হলেই 'সব কিছু ভগবানই' এই সত্য প্রকট হয়ে যায়। তার কারণ এই জগৎ হলো জীবের কল্পনা। জগৎ না মহাত্মার দৃষ্টিতে আছে, না পরমাত্মার দৃষ্টিতে আছে, তা আছে জীবাত্মার দৃষ্টিতে। মহাত্মার দৃষ্টিতে সব কিছু ভগবানই—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (গীতা ৭।১৯)। ভগবানের দৃষ্টিতে সৎ-অসৎ সব কিছু তিনিই—**'সদসচ্চাহমর্জুন'** (গীতা ৯।১৯)। কিন্তু জীব নিজেদের রাগ (আসক্তি)-দ্বেষের কারণে জগৎকে নিজেদের বুদ্ধিতে ধারণ করে রেখেছে—**'যয়েদং ধার্যতে জগৎ'** (গীতা ৭।৫)। বাস্তবে জগতের নাম-গন্ধ নেই। সকল দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, অবস্থা, ঘটনা, পরিস্থিতি প্রভৃতিতে কেবল ভগবানই পরিপূর্ণ হয়ে আছেন। এই কথা যদি আমাদের উপলব্ধিতে না আসে, তাহলে তা হলো আমাদের উপলব্ধির ঘাটতি, তত্ত্বতে কোন ন্যূনতা নেই। আমাদের উপলব্ধিতে না এলেও যা সত্য তা তো সত্য থাকবেই, তা মিথ্যা হবে কী করে ? সাধক যাই করুন না কেন শেষ পর্যন্ত তাঁকে এই ধ্রুব সত্যকে মেনে নিতে হবেই।

'বাসুদেবঃ সর্বম্'-এর উপলব্ধি হয়ে যাওয়ার পর **'সর্বম্'**-ও থাকে না, তখন কেবল **'বাসুদেবঃ'** থাকেন। একেই শ্রীমদ্ভাগবতে 'আত্যন্তিক প্রলয়' বলা হয়েছে (১২।৪।২৩-২৪), আর একেই গোস্বামী তুলসীদাস 'পরম বিশ্রাম' বলেছেন—**'পায়ো পরম বিশ্রামু'** (শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড, ১৩০।৩)। যেমন, যতক্ষণ পর্যন্ত গমের গাছ থাকে ততক্ষণ পাতা-ডাঁটা দেখা যায়। শেষে আর পাতা-ডাঁটা থাকে না, কেবল গমই থেকে যায়। তাৎপর্য হলো এই যে

কেবলমাত্র বাসুদেবই বিদ্যমান। অন্য কিছু নেই, কখনো ছিল না, কখনো হবে না, কখনো হতে পারে না। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে **একমাত্র পরমাত্মাই বস্তুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন**। এই অবস্থার বর্ণনা হতে পারে না। কেননা বর্ণনাকারী কেউ (ব্যক্তি) থাকেই না !

ভগবান বলেছেন—

সর্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াঽঽত্মমনীষয়া।
পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্বতো মুক্তসংশয়ঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৯।১৮)

'যখন সব কিছুতে পরমাত্মবুদ্ধি করা হয়ে থাকে, তখন সব কিছু পরমাত্মাই—এমনই দেখা যায়। তারপর এই পরমাত্মাদৃষ্টি থেকেও নিবৃত্ত হয়ে গেলে সকল সংশয় স্বত দূর হয়ে যায়।'

'উপরমেৎ' শব্দের তাৎপর্য হলো সাধক 'সব কিছু ভগবান' এই বৃত্তি থেকেও নিবৃত্ত হয়ে যান। এই বৃত্তিকেও ত্যাগ করেন, কেননা তাঁর দৃষ্টিতে 'সব কিছু' আর থাকে না। এই বৃত্তি চলে গেলে এক ভগবানই থেকে যান। তাৎপর্য হলো ভক্ত সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ভগবানের শরণাগত হয়ে নিজেই নিজেকে ভগবানের মধ্যে লীন করে দেন, তখন শরণাগত থাকে না কেবল শরণ্যই থাকেন। **'আমি' থাকে না, কেবল ভগবানই থাকেন। এই হলো আসল শরণাগতি**। এই শরণাগতির পর পরমপ্রেমের প্রাপ্তি ঘটে—**'মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্'** (গীতা ১৮।৫৪), ভগবান নিজের ইচ্ছায় প্রেমলীলার জন্য এক থেকে দুই হয়ে যান—

দ্বৈতং মোহায় বোধাৎ প্রাগ্‌জাতে বোধে মনীষয়া।
ভক্ত্যর্থং কল্পিতং (স্বীকৃতং) দ্বৈতমদ্বৈতাদপি সুন্দরম্॥

(বোধসার, ভক্তি. ৪২)

'তত্ত্ববোধের পূর্বেকার দ্বৈত তো মোহগ্রস্থ করে, কিন্তু বোধ হয়ে যাওয়ার পর ভক্তির ফলে স্বীকৃত দ্বৈত অদ্বৈতের চেয়েও বেশি সুন্দর হয়ে থাকে ।'

ভগবানের ইচ্ছায় প্রাপ্ত এই প্রেম প্রতিক্ষণ বর্ধনশীল হয়ে থাকে।

এজন্য কখনো ভক্ত এবং ভগবান এক হয়ে যান আবার কখনো দুই হয়ে যান। প্রেমে এই মিলে যাওয়া এবং ভিন্ন হয়ে যাওয়া (মিলন এবং বিরহ) ভগবানের ইচ্ছায় হয়ে থাকে, ভক্তের ইচ্ছায় হয় না। **মুক্ত মহাপুরুষদের মধ্যেও এই প্রেমের আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়।** কেননা যোগ এবং বোধ প্রাপ্ত হলে সূক্ষ্ম অহং থেকে যায়।[১] কিন্তু প্রেম প্রাপ্ত হলে এই সূক্ষ্ম অহং-ও সম্পূর্ণ অবিদ্যমান হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে—

প্রেম ভগতি জল বিনু রঘুরাঈ। অভিঅন্তর মল কবহুঁ ন জাঈ॥

(শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৪৯।৩)

উপসংহার

এই জগৎ হলো ভগবানের আদি অবতার—**'আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য'** (শ্রীমদ্ভাগবত ২।৬।৪১)। এক পরমাত্মাই অনেক রূপ হয়ে যান, আবার অনেক রূপ ত্যাগ করে এক রূপ হয়ে যান। অনেক রূপে হয়ে গেলেও তিনি একই থাকেন। তিনি এক থাকবেন, নাকি অনেক হয়ে যাবেন সে তাঁর ইচ্ছা, তাঁর লীলা। একটিই সোনা থেকে শত শত অলংকার তৈরি হলো আবার সেই অলংকারগুলি সোনা হয়ে গেল অথবা একটি ভুয়ো চিনি থেকে অনেক খেলনা তৈরি হলো আবার সেই খেলনাগুলি ভুয়ো চিনি হয়ে গেল। তাতে তফাৎ কী হলো ? তেমনই ভগবান যা কিছু হয়ে যান তাতে তফাত কী হলো ? তত্ত্ব একটিই আছে এবং একটিই থাকবে। সেই এক তত্ত্ব ছাড়া কখনো কিছু হয়নি, হবে না, হতে পারে না। **একমাত্র ভগবানই ছিলেন, ভগবানই আছেন এবং ভগবানই থাকবেন।** সেই এক ভগবানই প্রেমী এবং প্রেমাস্পদের রূপ ধারণ করে প্রেমের লীলা করেন। সেই প্রতিমুহূর্তে বর্ধনশীল পরমপ্রেমের প্রাপ্তিতেই রয়েছে মানবজীবনের পূর্ণতা।

~~ ○ ~~

[১]এই সূক্ষ্ম অহং জন্ম-মৃত্যুদায়ক হয় না, কিন্তু মতভেদ সৃষ্টিকারী হয়। এই সূক্ষ্ম অহং-এর জন্যই আচার্যগণের তথা তাঁদের দর্শনে মতভেদ থাকে।

॥ শ্রীহরি ॥

গোরক্ষপুরের গীতাপ্রেস দ্বারা এযাবৎ প্রকাশিত বাংলা বই-এর সূচীপত্র

কোড নং

(১) **1118** **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (তত্ত্ব-বিবেচনী) বৃহৎ আকারে**

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

গীতা-বিষয়ক ২৫১৫টি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সমগ্র গীতা-গ্রন্থের বিষদ্ ব্যাখ্যা

(২) **763** **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (সাধক-সঞ্জীবনী)**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

প্রতিটি শ্লোকের পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ ব্যাখ্যাসহ সুবৃহৎ টীকা। সাধকগণের আধ্যাত্মিক পথ-নির্দেশের এক অনুপম গ্রন্থ।

(৩) **1577** **শ্রীমদ্ভাগবত (প্রথম খণ্ড)**

(৪) **1744** **শ্রীমদ্ভাগবত (দ্বিতীয় খণ্ড)**

(৫) **1574** **সংক্ষিপ্ত মহাভারত (প্রথম খণ্ড)**

(৬) **1660** **সংক্ষিপ্ত মহাভারত (দ্বিতীয় খণ্ড)**

(৭) **1662** **শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত**

(৮) **556** **গীতা-দর্পণ**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লিখিত ১০৮টি বিষয়ের সামগ্রিক দর্শন-ভিত্তিক অভিনব আলোচনা। গীতার গভীরে প্রবেশে ইচ্ছুক জিজ্ঞাসুদের পক্ষে বইটি খুবই উপযোগী।

(৯) **13** **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা**

অন্বয়, পদচ্ছেদসহ প্রতিটি শ্লোকের ভাবার্থসহ সরল অনুবাদ।

(১০) **496** **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা**

মূল শ্লোকসহ সরল অনুবাদ

(১১) **1736** **গীতা প্রবোধনি** (লেখক—স্বামী রামসুখদাস)

(১২) **1393** **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা** (বোর্ড বাইন্ডিং)

(১৩) **1444** **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা**

অতি ক্ষুদ্র আকারে সমগ্র মূল শ্লোকের অভিনব সংস্করণ।

কোড নং

(১৪) 395 **গীতা-মাধুর্য**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

প্রতিটি শ্লোকের পৃষ্ঠভূমিতে প্রশ্নোত্তররূপে উপস্থাপিত এই বইটি নবীন এবং প্রবীণ সকলকেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম।

(১৫) 1851 **গীতা রসামৃত**

(১৬) 1901 **সাধন-সমর বা দেবী মাহাত্ম্য**

(১৭) 1937 **শিবপুরাণ**

(১৮) 1455 **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা** (লঘু আকারে)

(১৯) 1883 **শ্রীরামচরিতমানস (তুলসীদাসী রামায়ণ)**

গোস্বামী তুলসীদাস বিরচিত, অখণ্ড সংস্করণ, সম্পূর্ণ নূতনরূপে অনুদিত।

(২০) 275 **মানুষ কর্ম করায় স্বাধীন, নাকি পরাধীন ?**

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

সাধন পথের গূঢ় তত্ত্বের সহজ আলোচনা।

(২১) 1456 **ভগবৎপ্রাপ্তির পথ ও পাথেয়**

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

ঈশ্বরলাভের সাধনায় রত সাধকদের পক্ষে একটি অপরিহার্য পুস্তক।

(২২) 1469 **সর্বসাধনার সারকথা**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

(২৩) 1119 **ঈশ্বর এবং ধর্ম কেন ?**

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বইটি খুবই উপযোগী।

(২৪) 1305 **প্রশ্নোত্তর মণিমালা**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক ৫০০টি প্রশ্নের মূল্যবান সমাধান সূত্র।

(২৫) 1102 **অমৃত-বিন্দু**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

সূত্ররূপে উপস্থাপিত এক সহস্র অমৃত বাণীর অভূতপূর্ব সংকলন।

(২৬) 1115 **তত্ত্বজ্ঞান কী করে হবে ?**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

তত্ত্বজ্ঞান লাভের একটি সরল মার্গ-দর্শিকা।

(২৭) 1925 **ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও মহত্ত্ব**

(২৮) 1936 **ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস**

কোড নং

(২৯) 1358 **কর্ম রহস্য**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

ভগবান গীতায় বলেছেন **'গহনা কর্মণো গতিঃ'**—সেই কর্ম-তত্ত্বের অনুপম বর্ণনা।

(৩০) 1122 **মুক্তিলাভের জন্য গুরুকরণ কি অপরিহার্য ?**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

গুরু বিষয়ক বিভিন্ন শঙ্কা-সমাধানের উদ্দেশ্যে লিখিত এই পুস্তিকাটি বর্তমানে প্রতিটি লোকেরই একবার অবশ্যই পড়া কর্তব্য।

(৩১) 276 **পরমার্থ পত্রাবলী**

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

সাধকগণের উদ্দেশ্যে লিখিত ৫১টি আধ্যাত্মিক পত্রের দুর্লভ সংকলন।

(৩২) 816 **কল্যাণকারী প্রবচন**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

সাধকগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ১৯টি অমূল্য প্রবচনের সংস্করণ।

(৩৩) 1460 **বিবেক চূড়ামণি** (মূলসহ সরল টীকা)

শ্রীমৎ শংকরাচার্য বিরচিত জ্ঞানমার্গের সুপরিচিত গ্রন্থ।

(৩৪) 1454 **স্তোত্ররত্নাবলী**

প্রাচীন বিভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ স্তোত্রের মূলসহ সরল অনুবাদ।

(৩৫) 1603 **উপনিষদ্**

(৩৬) 1604 **পাতঞ্জলযোগ**

(৩৭) 903 **সহজ সাধনা**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

সাধন পথের সহজতম দিক্-দর্শন।

(৩৮) 312 **আদর্শ নারী সুশীলা**

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে বর্ণিত ২৬টি দৈবীগুণকে কেন্দ্র করে একটি মহিলার জীবন-চরিত্র।

(৩৯) 1415 **অমৃত-বাণী**

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

(৪০) 1541 **সাধনার দুটি প্রধান সূত্র**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

(৪১) 1478 **মানব কল্যাণের শাশ্বত পথ**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

বিভিন্ন সাধন-মার্গের নির্বাচিত ২০টি প্রবচনের এক অমূল্য সংগ্রহ।

কোড নং

(৪২) 1651 **হে মহাজীবন ! হে মহামরণ !!**
স্বামী রামসুখদাস মহারাজের স্বপ্রসঙ্গের নির্দেশাবলী।

(৪৩) 1306 **কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি**
লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

(৪৪) 955 **তাত্ত্বিক-প্রবচন**
লেখক—স্বামী রামসুখদাস

(৪৫) 428 **আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন**
লেখক— স্বামী রামসুখদাস

(৪৬) 296 **সৎসঙ্গের কয়েকটি সার কথা**

(৪৭) 1359 পরমাত্মার স্বরূপ এবং প্রাপ্তি

(৪৮) 1884 ঈশ্বর লাভের বিবিধ উপায়

(৪৯) 1303 সাধকদের প্রতি

(৫০) 1579 সাধনার মনোভূমি

(৫১) 1580 অধ্যাত্ম সাধনায় কর্মহীনতা নয়

(৫২) 1581 গীতার সারাৎসার

(৫৩) 1452 আদর্শ গল্প সংকলন

(৫৪) 1453 শিক্ষামূলক কাহিনী

(৫৫) 1513 মূল্যবান কাহিনী

(৫৬) 625 দেশের বর্তমান অবস্থা এবং তার পরিণাম

(৫৭) 956 সাধন এবং সাধ্য

(৫৮) 1996 স্তুতি

(৫৯) 1293 আত্মোন্নতি এবং সনাতন (হিন্দু) ধর্ম রক্ষার্থে কয়েকটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য

(৬০) 450 ঈশ্বরকে মানব কেন ? নামজপের মহিমা এবং আহার শুদ্ধি

(৬১) 449 দুর্গতি থেকে রক্ষা পাওয়া এবং গুরুতত্ত্ব

(৬২) 451 মহাপাপ থেকে রক্ষা পাওয়া

(৬৩) 443 সন্তানের কর্তব্য

(৬৪) 469 মূর্তিপূজা

(৬৫) 849 মাতৃশক্তির চরম অপমান

(৬৬) 1319 কল্যাণের তিনটি সহজ পন্থা

(৬৭) 1742 শরণাগতি

(৬৮) 762 গর্ভপাতের পরিণাম ? একবার ভেবে দেখুন

(৬৯) 1075 ওঁ নমঃ শিবায়

(৭০) 1043 নবদুর্গা

(৭১) 1096 কানাই

	কোড নং	
(৭২)	1097	গোপাল
(৭৩)	1098	মোহন
(৭৪)	1123	শ্রীকৃষ্ণ
(৭৫)	1292	দশাবতার
(৭৬)	1439	দশমহাবিদ্যা
(৭৭)	1652	নবগ্রহ
(৭৮)	1787	মহাবীর হনুমান
(৭৯)	1495	ছবিতে চৈতন্যলীলা
(৮০)	1888	জয় শিব শংকর
(৮১)	1889	স্বনামধন্য ঋষি-মুনি
(৮২)	1891	রামলালা
(৮৩)	1892	সীতাপতি রাম
(৮৪)	1893	রাজা রাম
(৮৫)	1977	ভগবান সূর্য
(৮৬)	330	ভক্তিসূত্র (নারদ ও শাণ্ডিল্য)
(৮৭)	1496	পরলোক ও পুনর্জন্মের সত্য ঘটনা
(৮৮)	1659	শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম
(৮৯)	1881	হনুমানচালীসা (মূলপাঠ, অর্থসহ)
(৯০)	1880	হনুমানচালীসা (মূলপাঠ)
(৯১)	1852	রামরক্ষাস্তোত্র
(৯২)	1356	সুন্দরকাণ্ড
(৯৩)	1322	শ্রীশ্রীচণ্ডী
(৯৪)	1743	শ্রীশিবচালীসা
(৯৫)	1785	ভাগবতের মণিমুক্তা
(৯৬)	1786	মূল শ্রীমদ্‌বাল্মীকীয়রামায়ণম্‌
(৯৭)	1795	মনকে বশ করার কয়েকটি উপায় ও আনন্দের তরঙ্গ
(৯৮)	1784	প্রেমভক্তিপ্রকাশ, ধ্যানাবস্থায় প্রভুর সঙ্গে বার্তালাপ
(৯৯)	1797	স্তবমালা
(১০০)	1835	সত্যনিষ্ঠ সাহসী বালক-বালিকাদের কথা
(১০১)	1834	শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (মূল) ও শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম
(১০২)	1839	কৃত্তিবাসী রামায়ণ
(১০৩)	1838	জীবন যাপনের শৈলী
(১০৪)	1853	আমাদের লক্ষ্য ও কর্তব্য
(১০৬)	1854	ভাগবত রত্নাবলী
(১০৬)	1920	আহার নিরামিষ না আমিষ ? সিদ্ধান্ত নিজেই নিন
(১০৭)	1946	রামায়ণ মহাভারতের কতিপয় আদর্শ চরিত্র
(১০৮)	1948	এর নাম কি উন্নতি, না ধ্বংস ?—একটু ভেবে দেখুন
(১০৯)	1978	ভগবানের পাঁচটি নিবাসস্থল